JADAVPUR UNIVERSITY

378.197(541.23)
JU
(OP)

EXTENSION LECTURES
BY
TEACHERS OF THE UNIVERSITY

(*UNDER U. G. C. SCHEME OF EXTENSION WORK*)

24(III)

PART II

1958-59

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY
Class No. 378:147(541·23)
Book No. J11
(OR)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যাতিরিক্ত বক্তৃতামালা

OLD & RARE
Central Library
Jadavpur University, Kol-32

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা - ৩২

JADAVPUR UNIVERSITY
G T 2891
18/12/17
LIBRARY

Published by P. C. V. Mallik, Registrar Jadavpur University, Calcutta - 32 and Printed by U. M. Biswas at I. N. A. Press, 173, Ramesh Dutta Street, Calcutta - 6.

সূচীপত্র

বিষয় লেখক			পৃষ্ঠা
বিদ্যাসুন্দর যাত্রা—ডাঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী	...	...	১
লঘু বাংলা প্রবন্ধ—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	...	১১
স্বদেশী গান—ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত	...	...	১৮
সমালোচনা সাহিত্য—ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত	...	...	৩২
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিতকুমার দত্ত	...	...	৪১
চন্দ্রে অভিযান (প্রথম পর্যায়)—শ্রীদেবপ্রসাদ স্থরাল	...	...	৫৪
,, ,, (দ্বিতীয় পর্যায়)—শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত	...	...	৬৭
,, ,, (তৃতীয় পর্যায়)—ডাঃ সমরেন্দ্রনারায়ণ সেন	...	...	৭৪
,, ,, (চতুর্থ পর্যায়)—শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	...	৮৩
পরমাণবিক শক্তি—			
পরমাণুর সাধারণ জ্ঞান— (প্রথম পর্যায়)—ডাঃ তপেন রায়	...	...	৮৯
পরমাণবিক শক্তি—যুদ্ধে ও শান্তিতে— (দ্বিতীয় পর্যায়)—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য	...	...	৯২
পরমাণু-শক্তি ও তার ব্যবহার— (তৃতীয় পর্যায়)—শ্রীদিলীপ ভদ্র	...	...	১০০
তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার— (চতুর্থ পর্যায়)—দেবীচরণ খাঁ	...	...	১০৩

	Page
The Theatre in Bengal—Dr. S. K. De	1
The Security Council—Chaya Bhattacharyya	5
Regional Arrangements—Basanti Mitra	12
Role of the General Assembly—Basanti Mitra	21
The United Nations & Dependent Peoples—Chaya Bhattacharyya ...	30
Sino-Indian Relations—Dr. P. C. Chakravarti	38

———

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

[ভারত সরকারের (য়ুনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশন) পরিকল্পনানুসারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-ভবনে ২০শে মে ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত পাঠ্যাতিরিক্ত বক্তৃতা।]

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সুধীমণ্ডলী—

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশে বন্ধ হয়ে গেছে। আজকের আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘরে বসে হলেও, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ী মাস্টারী মেজাজটা যদি ছুটি নিয়ে থাকে, তবে অন্ততঃ ঘরোয়া আবহাওয়ায় বর্তমান বক্তা কিছুটা স্বস্তি পাবে। মনে উঠ্‌বে রবীন্দ্রনাথের কথা—

"আজ কোন কাজ নয়। * * *
* * * আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
* * * শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের স্বর্ণ মদিরা—।
* * * * এই শান্তি
এই মধুরতা দিক্ সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর॥"[১]

আজ আর কোনও কাজ নয়। থাক্ অধ্যাপনা তার ব্যস্ততা, প্রমাণ, গাম্ভীর্য, নিয়মনিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে। তাকে আজ মুক্তি দিয়েছি। আজ এই স্বল্প অবকাশে একটু পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনা করা যাক্। বর্তমান কালের বিচিত্র সমস্যা থেকে একটু সরে যদি আজ আসি, তাতে—'এ জগতে ক্ষতি কার'! আজ যদি লঘু-তরল জীবনের ধারা ক্ষণিকের জন্যও অঞ্জলি ভরে নিতে পারি, তবে বর্তমান জগতের সম্ভবতঃ কারও কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু লাভ হবে আমাদের—একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।

ফিরে যাই এক শতক আগে। বাঙালীর জীবনে তখনও সমস্যার কমতি ছিল না। তার প্রমাণ দেবে ইতিহাস। কিন্তু আনন্দ ছিল, মজা ছিল। জীবনটা মজা নদীর মত ছিল না। প্রাণস্পন্দন ছিল তার। আনন্দের আয়োজনও ছিল প্রচুর। 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ' তবু 'রঙ্গে ভরা' ছিল। এই রঙ্গের অন্যতম মাধ্যম ছিল নাট-গীতি বা যাত্রা-গান।

আজ যাত্রা-গান সহর-অঞ্চলে প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। ছেলেবেলায় সারা রাত পেরিয়ে প্রায় বেলা দশটা-এগারটা পর্যন্ত একমনে যাত্রা শুনেছি কিন্তু এখন আর তা নেই। উত্তর কলকাতায় কয়েকটা পেশাদার যাত্রার দল আছে বটে, তাদেরও যুগের প্রয়োজনে ভোল্ বদলে গেছে। নাট-গীতি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে থিয়েট্রিক্যাল্ যাত্রা।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতাতে যাত্রার ব্যাপারে একটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। এর আগে যাত্রা বলতে কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলাই বোঝাত। তার বদলে এখন পালা হল দু'রকমের—পৌরাণিক পালা, যেমন দক্ষযজ্ঞ, নলদময়ন্তী, কমলে কামিনী প্রভৃতি; আর অপৌরাণিক পালা, যেমন বিদ্যাসুন্দর। আরও খুঁটিয়ে দেখলে বলা যায় আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাত্রা-পালার তিনটে পৃথক্ ধারা ছিল। প্রথম ধারা—ভক্তিরসাত্মক, যেমন কৃষ্ণযাত্রা। দ্বিতীয় ধারা—কৌতুকরসাত্মক, যেমন ভিস্তী-মেথরাণীর সঙ্। তৃতীয় ধারা—আদিরসাত্মক, যেমন বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। আধুনিক রঙ্গালয়ে এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কথায় আসা যাক্। বিদ্যাসুন্দর নামটা মনে করিয়ে দেয় কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে।

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'মানস সুন্দরী' [সোনার তরী]।

বাঙলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য অনেকেই লিখেছিলেন। পিছু হট্‌তে হট্‌তে একেবারে গিয়ে ষোল শতকে ঠেকা যায়। আবার ভারতচন্দ্রকে ছুঁয়ে আরও খানিকটা এগিয়েও যে যাওয়া যায় না, এমন নয়। তবে বিদ্যাসুন্দর বলতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যকেই বোঝায়। আর বোঝানো উচিতও তাই। এই বিদ্যাসুন্দর লিখেই ভারতচন্দ্র কালজয়ী হয়েছিলেন।

ছোট করে গল্পটা বলছি। গোড়াতেই বলে রাখি, এটি একটি নিছক প্রেমের গল্প তবে গল্পের মধ্যে আজকালকার মত *Loves Eternal Triangle* অর্থাৎ প্রেমের চিরন্তন ত্রিভুজ নেই। নেই কোন উৎকট প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা কোন *Villian* বা খল-চরিত্র। তবে বাধা আছে বিস্তর। প্রাণ বা প্রাণাধিকা, 'করে ফেলে কারে রাখি', এ সমস্যা তো ছিলই। বর্ধমান-রাজ বীরসিংহের মেয়ে বিদ্যার বিয়ের বয়স হয়েছে। রাজার মেয়ে, যে-সে পাত্রে দিয়ে দিলেই তো চলবে না, দেখে-শুনে দিতে হবে তো। তাই রাজার ভাট পাত্রের খোঁজে বেরুল। কত দেশে ভাট গেল কিন্তু মনের মত পাত্র মেলে কই? শেষে বহুদূরে কর্ণাটের কঞ্জীভেরম্ (*Conjeeveram*) অর্থাৎ কাঞ্চীপুরে পৌঁছে পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। চমৎকার পাত্র, নাম সুন্দর। পাত্রের বাপ গুণসিন্ধুর বিরাট রাজ্য আছে, নাম-ডাকও আছে। ভাটের মুখে গোপনে 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' পাত্রী বিদ্যার কথা শুনে সুন্দর একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পড়ুয়ার বেশে বর্ধমানের দিকে রওয়ানা হল। সহায় মহাশক্তি কালী, পথের সঙ্গী এক শুক পাখী। বর্ধমান পৌঁছে সুন্দরের তাক্ লেগে গেল। কী অপরূপ এই দেশ! যাই হক্, একটা আস্তানা তো গাড়তে হবে। কোথায় বাসা বাঁধা যায়, সুন্দর ভাবতে থাকে। বিকাল বেলা। ভাগ্যের ফেরে সেই পথে এল হীরা মালিনী—'কথায় হীরার ধার হীরা নাম তার'। চৌকস মহিলা, রাজবাড়ীতে ফুল যোগায়, অন্দরের খবর নখদর্পণে। খুসী হয়ে সুন্দর মালিনী মাসীর বাড়ীতেই আশ্রয় নেয় *Paying Guest* বা খরচদার অতিথি হিসেবে। সোনায় সোহাগা হল। মালিনী মাসীর কাছে সুন্দর রাজ্যের হালচাল, রাজবাড়ীর খবর শোনে। আর শোনে বিদ্যার প্রতিজ্ঞার কথা—বিচারে পরাস্ত করবে যে, সেই বরমাল্য পাবে। বিদ্যা এ পর্যন্ত অপরাজিতা। প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সুন্দর চাতুরালি আরম্ভ করলে। দেখতে হবে কত বিদ্যা জানে ঐ বিদ্যাবতী; যেন-তেন প্রকারেণ সুন্দরকে বিদ্যাপতি হতেই হবে। কী করে সুরু করা যায়! একদিন মালিনী-মাসীর বদলে সুন্দর মালা গেঁথে তার মধ্যে কৌশলে নিজের নাম লিখে বিদ্যার কাছে পাঠাল। রসিকা বিদ্যার কাছ থেকেও জবাব এল তেমনি কৌশলে। মালিনী দূর থেকে পরস্পরের দেখা করিয়ে দিলে। এবারে কী করা যায়! মিলন হবে কেমন করে? কালীর দৌলতে এক সিঁদ কাটি পেয়ে সুন্দর গোপনে এক সুড়ঙ্গ কাটলে বিদ্যা আর মালিনীর ঘরকে যুক্ত করে। তারপর একদিন অকস্মাৎ 'সিঁধেল চোর' সুন্দরের আবির্ভাব হল বিদ্যার ঘরে। কিন্তু বিদ্যা কি অত সহজে মেলে! নিজের প্রতিজ্ঞার নড়চড় করবে না রাজকুমারী। ব্যাপার বুঝে সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে বিচারে বসে। বিদ্যার হার হল। এই হারার জন্যই তো বিদ্যা প্রস্তুত হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হল। গোপনে গান্ধর্বমতে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন হল। এ সংবাদ কিন্তু বিদ্যার কয়েকটি নিত্য-সহচরী ছাড়া আর কেউ জানে না। সিঁধেল চোরের অভিনব 'চৌরী সুরত'। এদিকে এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে চতুর সুন্দর প্রত্যহ রাজসভায় এসে আর্জি পেশ করে—বিচার করতে চাই বিদ্যার সঙ্গে, মহারাজ! যদি হারি মাথা মুড়বো, আর যদি জিতি বিদ্যাকে সন্ন্যাসিনী করে তীর্থযাত্রায় যাব। রাজা ভাবেন—'গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়'। কী ভাবে এই সন্ন্যাসীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! আজ নয় কাল করে রাজা বীরসিংহ টালাবাহানা করেন। সন্ন্যাসীও নাছোড়বান্দা। সুন্দরই আবার এই

খবরটি বিদ্যার কানে তোলে। বিদ্যা পড়ে সমস্যায়—এও কি কখন হয়! সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিচার করবার কী দায় তার। কিন্তু আসল সমস্যা একদিন সত্যই দেখা দিল। বিদ্যা ও সুন্দরের যুক্ত জীবনে নতুন অতিথি আসার সময় হল। খবর শুনে রাজা-রাণী স্তম্ভিত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। কোটালের ডাক পড়ে—যেমন করে হ'ক্ চোর ধরে হাজির কর, নইলে গর্দান যাবে। কোটাল ফন্দী আঁটে, বিদ্যার মন্দিরে ফাঁদ পেতে পাহারা দেয়। পূর্ব সংবাদ না জেনে সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে দেখা করতে এসে নারীবেশধারী কোটালদের হাতে ধরা পড়ে। সুড়ঙ্গ বেয়ে গিয়ে কোটাল মালিনী মাসীকেও ধরে। মালিনী অবাক্, দেদার গাল পাড়তে থাকে। এদিকে 'সুন্দর পড়িল ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি করি'। সুন্দরকে বেঁধে নিয়ে কোটাল রাজার কাছে হাজির করলে। চেহারা দেখে মহারাজ বীরসিংহের মনে বুঝি একটু আক্ষেপ হয়—আহা, এ যদি সত্যিই আমার জামাই হত! তবু এ ক্ষণিকের দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চান না। তিনি রাজা, তিনি বিচারক। ন্যায়ের মর্যাদা তাঁকে রাখতেই হবে, দুষ্কর্মের উপযুক্ত শাস্তি তাঁকে দিতেই হবে। সুন্দরের পরিচয় তিনি জানতে চাইলেন। 'বড় মানুষের রীতি' অনুসারে সুন্দর নিজের পরিচয় নিজে দেয় না, বরং রঙ্গ করে বলে—

> "শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
> আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥
> বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম।
> বিদ্যাধর জাতি, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥"

উপরন্তু,—

> "চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
> পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥,'

আর তাই,—

> "শুনে কহে মহীপাল, শুনে কহে মহীপাল।
> পরিচয় নাহি দিল কাট রে কোটাল ॥"

—রাজার নিকট চোরের পরিচয়

কোটাল সুন্দরকে মশানে নিয়ে যায়। শিরচ্ছেদ হবে। মশানে সুন্দর উপাস্যা দেবতা কালীকে স্তুতি করাতে মহামায়ার আকাশ-বাণী হয়— 'মা ভৈষী, মা ভৈষী বেটা, তোরে বা কাটিবে কেটা'! সুতরাং 'ভয় কিরে বিদ্যাবিনোদিয়া'! সুন্দর অকুতোভয় হয়। এদিকে রাজার রায় দিয়েও মনে স্বস্তি নেই! কোথায় যেন কী একটা গোলমাল রয়ে গেছে তাই ঠিক হিসেব মিলছে না। সুন্দরের শুকপাখীকেও সভায় হাজির করা হয়েছিল। সেই পাখীই মহারাজ বীরসিংহকে চোরের আসল পরিচয়টি দিলে। রাজার তখন স্মরণ হল—তাই তো বটে! গঙ্গাভাট তো কাঞ্চীপুরে গিয়েছিল। ডাকা হল গঙ্গাকে। ভাট আসতে বীরসিংহ প্রশ্ন করলেন—

> "গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু-মহীপতি-নন্দন সুন্দর
> কোঁ নহী আয়া?"[২]

—ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

গঙ্গা সব কথা খুলে বললে মহারাজকে—

> "য়াদ্ নহী হৈঁ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে।
> পুছহুঁ দীবানজীসোঁ বখ্‌সিকে মঙ্গায়কে ॥"[৩]

তখন,—

> "বুঝকে কহা মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
> চোর কৌন্ হৈ তু চিহ্ন দেখ্ দেখ্ জায়কে ॥"[৪]

—ভাটের উত্তর

২-৪ শ্লোকগুলির মৎকৃত বঙ্গানুবাদ—

গঙ্গারে ডাকিয়া কহে নৃপতি তখন। 'সিন্ধু-সুত সুন্দর না এল কি কারণ ॥

* * *

মনে নাহি মহীপতি, করিয়াছি অবগতি, দেওয়ান্ বকসীরে ডাকি জিজ্ঞাস আপন।

* * *

নৃপ মনে মনে বাসি, ভট্টরাজে পরিতোষি, কহে—দেখা গিয়ে চোরে চিন কি না চিন ॥

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র [১৯৫৫ । পৃঃ ৫১৪, ৫১৬]

মশানে গিয়ে ভাটের সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। খবর পেয়ে বীরসিংহ নিজে সেখানে গিয়ে সুন্দরের বন্ধনমোচন করে নিয়ে এলেন। লৌকিক রীতি অনুসারে সুন্দরকে তিনি কন্যাদান করলেন। যথাসময়ে সংসারে সন্তান এল। কিছুকাল শ্বশুর-বাড়ী থেকে, সুন্দর ছেলে-বৌ নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

এই হল বিদ্যাসুন্দরের গল্প। গল্পটা আগাগোড়া কাল্পনিক, পরিবেশ কিংবা পাত্রপাত্রীর পরিচয়ে কোথাও কোন সত্য ব্যাপারের নামগন্ধ নেই। তবে এই গল্পের জড় রয়েছে সংস্কৃতে। কাশ্মীরী কবি বিহ্লনের নামে প্রচলিত একটা কাব্য আছে। নাম হল—'চৌরপঞ্চাশিকা'। এই বইটার নানা সংস্করণ নানা জনে নানা জায়গা থেকে করেছেন। পঞ্চাশিকা বলে মোট শ্লোকসংখ্যা যে পঞ্চাশটি তাও নয়; কম-বেশী রয়েছে। সুন্দর যখন পঞ্চাশ-শ্লোকে পূর্ব স্মৃতিমন্থন করে বিদ্যা ও মহাবিদ্যা—এক ঢিলে দুই পাখী মারছিল, তখন এই শ্লোকগুলি বাঙালী কবিদের কাজে লেগেছে। বাঙলা দেশেও সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া গেছে আর ছাপা হয়নি এমন একটা গোটা পুঁথিও মিলেছে। যাঁরা এ বিষয়ে জানতে চান, তাঁরা আমার সম্পাদিত **'সংস্কৃত ভাষায় (প্রচলিত) বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ কাব্য'** ['কায়স্থ সমাজ' পত্রিকা। ১৩৬২-৬৩ সাল।] দেখে নিতে পারেন। বাঙালী কবিদের যেমন একদিকে এই সংস্কৃত কাব্যগুলি উপাদান যুগিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে হিন্দী ফারসী রোমাণ্টিক কাব্যগুলিও (যেমন, কুতবনের 'মৃগাবতী', মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ', সৈয়দ্ আলাওলের 'লোরচন্দ্রালী পাঞ্চালী') কম কাজ করেনি।

একটা কথা বলি। এমন একটা প্রেমধর্মী কাব্যকে ধর্মের প্রলেপ রয়েছে বলে যাঁরা রূপক বলে চালাতে চান, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। যতই এঁরা জোর গলায় বলুন—

"The union of the hero and the heroine represents the union of Beauty and Wisdom." [৫]

অর্থাৎ, নায়ক-নায়িকার মিলন হল সৌন্দর্য ও জ্ঞানের মিলন।

কিংবা—

"পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সৌন্দর্য—এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি। বিদ্যাসুন্দরের সুন্দর রূপে সংস্কৃত কিন্তু অর্থে প্রাক্-বৈদিক।" [৬]

অথবা—

"সৌন্দর্য ও বিদ্যাবত্তার মিলনের দূতী মালিনী-রূপিণী প্রকৃতি; এই মিলন অন্তরের সুগভীর স্তরে, মনের সুড়ঙ্গ-পথে।" [৭]

তবুও কেমন যেন আমার মন সায় দিতে চায় না। কী দরকার এই প্রেমকাহিনীটাকে *Allegorical* অর্থাৎ রূপকাঢ্য করবার! নরনারীর প্রাকৃত-লীলাকে অপ্রাকৃত করে ব্যাখ্যা করলে এমন কী বেশী তার মূল্য বৃদ্ধি হবে! বর্তমান শতকের কথাসাহিত্যে তো এই লীলারই জয়জয়কার। এরই বীজ যদি মালিনীর মালঞ্চে পেয়ে থাকি দরকার কী তাকে রূপকের পাথর চাপা দেবার! বেশ তো আছে, থাক্ না। আর যেখান থেকে যাই এসে থাকুক্ না কেন, বিদ্যাসুন্দর বাঙলা দেশেরই হয়ে গেছে। সুন্দর বাঙালী না হয়েও বাঙালী বনে গেছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মাঝের অংশটা হল এই বিদ্যাসুন্দর। নেহাৎ দায়ে না পড়লে মঙ্গলকাব্য (যেমন, 'মনসামঙ্গল,' 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল') কেউ পড়তে চায় না। 'অন্নদামঙ্গল'ও পড়ে বটে, তবে যতটা তার প্রথম (অন্নদামাহাত্ম্য) ও তৃতীয় অংশ (মানসিংহ) পড়ে তার চেয়ে ঢের বেশী মন দিয়ে পড়ে

৫ গৌরদাস বৈরাগী কৃত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের [*An English Translation of Vidyasundar of Bharat Chandra Roy* (১৮৯০ সাল)] ভূমিকা (পৃঃ ৩)।

৬ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮২৪]। বিদ্যাসুন্দর তত্ত্ব [জনসেবক। শারদীয় সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১১৭]।

৭ কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য [৩/৪ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৫৪]।

দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর কাব্যটা। কারণ ওটা রস-বস্তু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের শুধু প্রথমাংশই পাঠ্য করেছেন। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু কোন অংশই বাদ দেন নি। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস কলকাতার ছেলে-মেয়েরা যাদবপুর কিংবা বিশ্বভারতীর ছেলে-মেয়েদের চেয়ে বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্বন্ধে কম ওয়াকিফ্ হাল নয় (অবশ্য যারা সত্যিই বই ছোঁয়)। আর আপনারা হয়তো এও জানেন যে বাঙালী *Publishing Business* অর্থাৎ প্রকাশনী ব্যবসা আরম্ভ করেছিল ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে। সেটা ১৮১৬ সালের কথা। তখন বিদ্যাসুন্দর ছাপা হত অগুণ্তি আর বিক্রীও হত অপরিমিত। দাম ছিল চার পয়সা, ছ' পয়সা। এত জনপ্রিয় ছিল এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য। উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিদ্যাসুন্দরের নাম শোনে নি এমন বড়দের কথা ছেড়ে দিন, বালকও বুঝি ছিল না। আজ অবশ্য বই পড়ে নামটাকেও জান্তে হয়! মনে পড়ছে, তখন বয়সে ছিলেম কিশোর। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক পড়ছিলুম বলে স্বর্গত পিতৃদেব বিনা বাক্যব্যয়ে বইটি কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। কিশোরদের নাকি ঐ বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল আর সেই জন্যই বোধ হয় 'নিষিদ্ধ ফল'-এর উপর কিশোর আমি-র এত লোভ ছিল। কৈশোরের অনেক কথাই আবছা হয়ে এসেছে কিন্তু ঐ কথাটি 'বিস্মৃতির মর্মে বসি' চিত্তে আমার আজও দোলা দেয়।

সাহিত্য জগতে ভারতচন্দ্রের অনুসরণ তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে হয়েছিল। শুধু কাব্য-সাহিত্যের কথা বল্‌ছি না। শ্রব্য কাব্যের দিক ছাড়া দৃশ্য কাব্য বা নাটকের ক্ষেত্রেও কবির প্রভাব কিছুমাত্র কম ছিল না। প্রাসঙ্গিক বলে নাটকের দিকটারই আলোচনা বর্তমানে করা যাক্।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের গল্প শোনার সময় বোধ করি লক্ষ্য করে থাকবেন—কাহিনীটার মধ্যে বেশ *Action* অর্থাৎ গতি রয়েছে। বেশ *Romantic* অর্থাৎ রমন্যাসযুক্ত গল্প। রাজা-রাণী, রাজকন্যা-রাজপুত্র রয়েছে, কোটাল আছে আর আছে মালিনী মাসী নিজে। ব্যস্, আর কী চাই! দিব্যি নাটক বানিয়ে নেওয়া যায়। বেড়ে জমবে। এমনি করে একদিন রাজকবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজসভা থেকে একেবারে কলকাতার জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জনতা চিন্‌ল ভারতচন্দ্রকে। সানন্দে সুস্বাগত জানালে তাঁকে।

রুশ দেশের এক ভদ্রলোক বাঙলায় এসেছিলেন। নাম তাঁর গেরাসিম্ স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ্। তাঁরই চেষ্টায় বাঙলা দেশে কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি নাটক অনেক অর্থব্যয়ে অভিনীত হয়েছিল। ইংরেজী নাটক, নাম হল—*The Disguise* অর্থাৎ ছদ্মবেশ। নাট্যকার *M. Joddrell* এম্. জোড্‌রেল্ নামে এক সাহেব। নাটকটা অবশ্য বাঙলায় তর্জমা করে অভিনয় করা হয়েছিল। সেটা ১৭৯৫ সালের ব্যাপার। তর্জমা করেছিলেন বাঙলা ভাষায় ও রুশ ভাষায়, স্বয়ং লেবেডেফ। ভারতচন্দ্রের লেখা কয়েকটি গানও এই নাটকে যুক্ত হয়েছিল। নাম-ধাম অবশ্য তর্জমায় লেবেডেফ্ পালটে দিয়েছিলেন। নমুনা হিসাবে (সংক্ষেপিত) নাটকটির প্রথম পাতাটি শোনাচ্ছি—

Act 1st.

Scene, A Street

A variety of musicians/in masks, and Fancy dresses./Clara/ [*Disguised as don Pedro*]/*serenading under/a Window.*/

Clara (*to the musicians*)—Gentlemen, enough.—/the Lady is sensible/of our attention and/beckons us to Depart/Adieu/. (*Exeunt—musicians*)/.

প্রথম ক্রীয়া

ব্যক্ততা প্রথম

নানান বাজিয়্যারা/ভিন্ন ২ পোসাখেতে/আর মুখসের/কাব্য করেন জানালার সম্মুখে/**সুখময়** পুরুষের সাজে/

সুখময় (বাজিয়্যাদিগকে কয়)—মহাসএরা এই ভাল/ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া/আর উনি বলেন আমারদিগকে/জাইতে—সুভ হউক/(বাজিয়্যারা গেল)/

নাটকটির রূপ ও রূপান্তর দুই-ই শুনলেন। গোটা নাটকটার মাইক্রোফিল্ম নকল আমি সম্প্রতি রুশ দেশ থেকে আনিয়েছি। ইচ্ছে আছে, কিছু কালের মধ্যেই মুদ্রিত আকারে নাটকটি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব।

এবার বিদ্যাসুন্দরের কথায় ফিরে আসা যাক্। বিদ্যাসুন্দর নাটকের যখন চল হল, তখন সবল দুর্বল নানা রকমের বিদ্যাসুন্দর পালা লেখা হতে লাগল। যেমন ধরুন—'অন্নদামঙ্গল গীতিনাট্য', 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা', 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়', বিদ্যাসুন্দর নব নাটক' ইত্যাদি। সবগুলোই উনিশ শতকের শেষের দিকের লেখা ও বটতলা থেকে ছাপা। পালাগুলোতে ভারতচন্দ্রের অনুসরণ তো আছেই, উপরন্তু কোন-কোন ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের ভাষাকে একটু এদিক-ওদিক করে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রসঙ্গে দু'জনের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। একজন পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অপর জন গোপাল উড়িয়া। এঁদের দুজনেরই বিদ্যাসুন্দর পালা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে যে বইটা চলে তার নাম হল—'বিদ্যাসুন্দর নাটক'। নামে চল্‌লেও আসল নাট্যকার হল কালিদাস সান্যাল। 'বিদ্যাসুন্দর নাটক'-এর প্রথম সংস্করণ বেরোয় ১৮৫৮ সালে। কালিদাস সান্যালের 'বিদ্যাসুন্দর অভিনয়' (১৮৮১ সাল) এই নাটকেরই যাত্রা পালা। নাটকটি ভারতচন্দ্রের অনুসরণে লেখা, ভাব ও ভাষা সুরুচিসম্মত। পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চ ছাড়া নাটকটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বহুবার অভিনীত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"কথিত আছে, কোন ধনবানের নিকটে একজন ভাঁড় নিযুক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ অভিনব কৌতুক প্রস্তুত করিতে আদিষ্ট হওয়াতে একদিন কিছুই নূতন স্থির করিতে না পারিয়া একজন মুটের ঝাঁকাতে বসিয়া প্রফুল্ল বদনে প্রভুর নিকট উপনীত হইল। ধনী এই অদ্ভুত ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি! ভাঁড় করজোড় করিয়া উত্তর করিল—মহাশয়, আজকের এই নূতন! আমার এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে; অর্থাৎ সকলের আবাল্যপরিজ্ঞাত ভারতচন্দ্র রচিত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান, ইতস্ততঃ ঈষৎ পরিবর্তন পূর্বক নাটকের পরিচ্ছদে 'আজকের এই নূতন' বলিয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করিতেছি।"

তবু্ও বলব 'আজকের এই নূতন' হলেও 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' নতুনই হয়েছিল। কারণ ঠিক কী আকারে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে, তা একদিন সত্যিই চিন্তার বিষয় ছিল। সাধারণের মনের মধ্যে কাব্য-সাহিত্য তেমন করে অনুভূতির সঞ্চার করতে পারে না, যেমন পারে নাটক। তাই বিদ্যাসুন্দর নাটক যথার্থই অভিনব।

নাটক থেকে দুটো উদ্ধৃতি শোনাই নমুনা হিসাবে। ফুল আনতে দেরী হয়েছে বলে বিদ্যা মালিনীকে বেশ করে শুনিয়ে দিলে। পরে ফুলের মধ্যে সুন্দরের কথা জেনে বিদ্যা ভাব বদলে মালিনীকে আদর ক'রে যখন রাগের কথা ভোলাতে চাইলে তখন মালিনী বল্‌ছে—

"না ভাই, আর তোমার সোহাগে কাজ নেই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্লে কি হবে বল? তোমাদের ভাব বুঝে ওঠা ভার। এই যে বলে—'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'।" —[১।৪]

রাজসভায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের আসা-যাওয়ার খবর যখন মালিনী মাসীর কানে পৌছেচে, তখন একদিন চিন্তিত বিদ্যাকে ভর্ৎসনা করে সে বললে—

"এমন সোনার চাঁদ বর এনে দিলুম, কি বুঝে যে রাণীকে জানালে না বোল্‌তে পারি না; তার সঙ্গে ঘটনা হল না, এখন তেম্নি এক দিব্যি সন্ন্যাসী বর মিলে গেছে। দাড়ি তার তোমার বেণী হতেও নাকি বড়, সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, মাথায় কটা জটা ভার—নাগর মনের মত মিলিল ভাল।" —[২।২]

এই নাটকেরই ছায়া অবলম্বনে হিন্দী ভাষাতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক লেখেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ১৮৬৮ সালে। নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন—

"মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরনে উসী কাব্যকা (=ভারতচন্দ্র-বিরচিত বিদ্যাসুন্দর) অবলম্বন করকে জো বিদ্যাসুন্দর নাটক বনায়া থা, উসী কো ছায়া লে কর বহ্ হিন্দী ভাষামেঁ নির্মিত হুবা হৈ।"

অর্থাৎ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঐ কাব্য অবলম্বন করে যে বিদ্যাসুন্দর নাটক করেছিলেন, তারই ছায়ায় এটা হিন্দীতে লেখা হল। কিন্তু মজার কথা হল কোন কোন হিন্দীওয়ালা এই ঋণস্বীকৃতিটাকে উড়িয়ে দিতে চান। বলেন—'বিদ্যাসুন্দর' আসলে নাকি, তাঁদেরই! চমৎকার জাতীয় সম্প্রীতি! এইমাত্র বাঙলা নাটকটা থেকে যে দুটি উদ্ধৃতি শুনলেন, তারই সমান্তরাল উদ্ধৃতি দুটো এইবার শুনুন—

নহীঁ ভাঈ নহীঁ, মৈঁ কুছ ন কহুংগী। জড় কাটকে পল্লব সীঁচনেসে ক্যা হোগা. বৈঠে বৈঠায়ে দুঃখ কোন মোল লে ক্যোঁকি প্রীতি করনী তো সহজ হৈ পর নিবাহনা কঠিন হৈ, ইসী হেতু ইস্‌সে দূর হী রহনা উচিত হৈ।" [১।৪]

'মৈঁনে তো চন্দ্রমা কা টুক্‌ড়া বর খোজ দিয়া থা পর তূ কহতী হৈ কি রাণীসে উসকা সমাচার হী মত্ কহো, তো অব মৈঁ কৌন উপায় করূঁ—অঁচ্ছা হৈ জৈসী তুমহারী চোটী হৈ কুছ উস্‌সে ভী লম্বী উসকী ডাঢ়ী হৈ, সির পর বড়া ভারী জটা হৈ ওর সব অঙ্গমেঁ ভভূত লগাবে হৈঁ। ঐসে যোগী নিত্য নিত্য নহীঁ আতে—অহাহা কৈসা অদ্ভুত রূপ হৈ!" [২।২]

আশা করি, এর পর আর কিছু বলার নেই। মনে হয়, নাট্যকার বাঙলা দেশে ছিলেন এবং বাঙলা ভাষাও জানতেন। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, হিন্দী ভাষাতে এইরূপ প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে।

বিদ্যাসুন্দর নাটকের পর্যায়ে এইবার আর একজন শ্রুতকীর্তি ব্যক্তির নাম করছি। ব্যক্তিটির নাম গোপাল। উড়িয়া বিচিত্র জীবন এই লোকটির; ফেরীওয়ালা থেকে যাত্রাওয়ালা হয়েছিল। গোপাল কটক (জাজপুর) জেলার লোক। কিশোর বয়সে কলকাতায় এসে পাড়ায় পাড়ায় ফল বিক্রী করত। তখন ১৮৪৪ সাল। বউবাজারে রাধামোহন সরকার সখের যাত্রার দল খুলেছেন। পালা বিদ্যাসুন্দর। সকাল বেলা। মজলিস চল্‌ছে পুরোদমে। দূর থেকে কণ্ঠ ভেসে এল—'চাই চাঁপা কলা'। আওয়াজ শুনে চকিত রাধামোহন হাঁকলেন—'ওরে কে আছিস্‌রে। ওর গলাটা গান্ধারে বল্‌ছে, ওকে ডেকে আন্।' কলাওয়ালা এল। ভেবেছিল, সকালের বউনীটা বাবুদের কাছে মন্দ হবে না। কিন্তু কলা বেচা তার আর হল না কোন দিন। কলাবিদ্‌দের পাল্লায় পড়ে কলাওয়ালাকে হতে হল কলাকার। মাস মাইনে ঠিক হল দশ টাকা। পরে অবশ্য এই মাইনে পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছিল। সুন্দর চেহারা ছিল বলে গোপাল সাজত হীরা মালিনী। যাঁরা গোপাল উড়িয়ার যাত্রা দেখেছেন, তাঁদের বল্‌তে শুনেছি—হীরা মালিনী গোপাল যখন হাতিতালি দিয়ে আসরে গাইতে গাইতে ঢুকত 'ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চারিদিকে মালঞ্চ বেড়া,' —সে দৃশ্য নাকি ভোলবার নয়! সমস্ত পালাটাই যেন *One man's show* অর্থাৎ একটি মানুষের অভিনয় আর সেই মানুষটি হল হীরা মালিনী। অথচ এই হীরা মালিনীর চরিত্রটিকে অনেক সমালোচক বলে থাকেন *Type character* অর্থাৎ মামুলি চরিত্র, রক্ত মাংসের কোন সম্পর্কই নাই। এঁরা কবিকঙ্কণের দুর্বলার ভক্ত। আমি বলব—কবিকঙ্কণের প্রশস্তিতে এই দুর্বলতার কি প্রয়োজন! হীরা মালিনীর মত এমন একটা প্রাণবন্ত চরিত্র মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য জগতে বড় বেশী পাওয়া যায় না। যাক্ সে কথা। যে কথা হচ্ছিল তাই বলি। রাধামোহনের লোকান্তরের পর গোপাল নিজেই দলের অধিকারী হল। পালা ঐ বিদ্যাসুন্দর। বহুদিন ধরে গোপাল নিজের দল সুনামের সঙ্গে চালিয়েছিল।

গোপাল উড়িয়ার এই নাট-গীতিটি পুরোপুরি গানে বাঁধা কিংবা গদ্য-পদ্য-গান মেশানো তা আজ বলা শক্ত। কারণ হাতে-লেখা কোন পুরো পালা পাওয়া যায় না। 'বিদ্যাসুন্দর সঙ্গীত সংগ্রহ' নামে এই যাত্রাপালাটার কিয়দংশ আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে [হোমশিখা পত্রিকা। কৃষ্ণনগর। চৈত্র ১৩৬০ সাল—।], কৌতূহলীরা দেখে নিতে পারেন।

আর একটা কথা। গানগুলো গোপালের নিজের লেখা বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। ভারতচন্দ্র ভাল করে পড়া না থাক্‌লে আর কলম জোরালো না হলে,

এই হ্রস্বায়তন পদগুলো লেখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। বিবিধ রাগরাগিণীযুক্ত এই গানগুলির ভাবমাধুর্য ও রচনাচাতুর্য লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়, অবাঙালী অল্পশিক্ষিত একজন অভিনেতা নৈসর্গিক কবিত্বশক্তি থাকলেও তার দ্বারা এই জাতীয় পদরচনা কোনক্রমেই হতে পারে না।

গোপাল উড়িয়ার মূল পালাটার তিনটে 'সাট' ছিল। একটা ভদ্রগৃহস্থ-বাড়ীতে গাইবার জন্য; আরেকটা ভদ্রপাড়াতে ও শেষেরটা বারোয়ারি তলাতে গাইবার জন্য। বুঝতেই পারছেন তিনটে সাটের মধ্যে লোকরঞ্জনের নৈতিক তারতম্য। সোমরস ও তাড়ির পরিবেষনের স্থানকালপাত্র ভেদ আছে বৈকি!

ভারতচন্দ্রের অনুসরণে যাত্রাপালাটি রচিত হলেও, নিজস্ব সম্পদও এর কিছু আছে। পালাটার মধ্যে পাওয়া যাবে বাঙালীর বুকের ও মুখের স্বাভাবিক ভাষা, হিল্লোলময় ছন্দ, হাসি-তামাসা, রঙ্গ-রস আর অনুপ্রাস-যমকের চমক। গোড়ার দিকে ভিস্তী-মেথরাণীর সঙ থাকত। লঘু-রস বিতরণ করা হত হিন্দী ও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় রচিত পদের দ্বারা। গানের মধ্যে মুসলমানী, ব্রজবুলি ছাড়া দু'-একটা ইংরেজী শব্দও যে পাওয়া যায় না, এমন নয়। বাঙালীর ঘরের কথা, সাংসারিক সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার কথা কত সহজ ও সুন্দরভাবে ভাষায় ফুটে উঠতে পারে তা এক পদ্যাংশগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন—

"আহা কি তোর বিবেচনা—সোনার দাঁড়ে কাক বসালে।

*　　*　　*

জলের লিখন নিশির স্বপন সে কতক্ষণ মোল্লার যেমন মুরগী পোষা।

*　　*　　*

শালগেরামের শোওয়া বসা বুঝতে পারিনি।

*　　*　　*

শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা।

*　　*　　*

জানতেম যদি পরের সোনা পরিতেম না কর্ণমূলে।

*　　*　　*

গা তোল গা তোল নিশি অবসান।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপি শাক
গাধার পিঠে বোঝাই দিয়ে রজক যায় বাগান॥"

এমন বহু সুভাষিতের সন্ধান গোটা পালাটায় মিলবে। জনান্তিকে বলে রাখি, গোপালের কুঞ্জভঙ্গের গান বৃন্দাবন রাধাকুঞ্জের নয়, খাস বর্ধমান সহরের।

বটতলা থেকে গোপাল উড়িয়ার যাত্রাপালার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, কোন সংস্করণই সুসম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্ভরযোগ্য নয়। কয়েকটি সংস্করণের উল্লেখ করছি, নামগুলো লক্ষ্য করুন—'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় টপ্পা', 'গোপাল উড়ের যাত্রাপালা', 'গোপাল উড়ের টপ্পা', 'আসল বিদ্যাসুন্দর টপ্পা', 'ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা', 'নূতন ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা' প্রভৃতি। সব কটাই ছাপা হয়েছিল ১৮৭৫ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে। একাধিক সঙ্কলন গ্রন্থেও (যেমন, 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ', 'সঙ্গীতমুক্তাবলী', 'বাঙালীর গান') গোপাল উড়িয়ার পদ সংগৃহীত হয়েছে।

গোপালের জনপ্রিয়তা তখনকার দিনে এত বেশী ছিল যে, সাধারণ লোকে সহরাঞ্চলে গোপাল উড়িয়ার যাত্রাকে রহস্যচ্ছলে আক্ষরিক ইংরেজী অনুবাদ করে বলত—*Gopal's Flying Visit* গোপালস ফ্লাইং ভিজিট। ভারতচন্দ্রের খ্যাতি-নিন্দার উত্তরাধিকার গোপাল উড়িয়া পেয়েছিল। খ্যাতির দৃষ্টান্ত শুনুন—

"আজকাল সভ্য সমাজে গোপাল উড়ের গানের কোন আদর নাই। কিন্তু এককালে তাহার গানের আদর কেবল পল্লীসমাজে নয়, নগরের সভ্যসমাজেও ছিল। এই বাঙালীদের একটা লঘুতরল রসিক জীবনও ছিল। আমরা সে পরিচয় পাই বাঙলার পোষ্যপুত্র এই অবাঙালী বাঙালী কবির গানে। গোপাল উড়ের গীতিকাব্যের শ্রোতা ও উপভোক্তা বাঙলার জাতিধর্মবয়োলিঙ্গনির্বিশেষে জনসাধারণ।"[৮]

৮ কালিদাস রায়—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ['গোপাল উড়ে'। পৃঃ ১৩৪-৪৭]।

নিন্দার নমুনাও একটু শুনুন—

"বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রাদলে গীত হওয়ার জন্য কতকগুলি ললিত শব্দবহুল কদর্যভাবপূর্ণ গান রচিত হইয়াছিল। এই সকল গানের ওস্তাদ কবি গোপাল উড়ে। ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘন রস তরল করিয়া একশিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই গানগুলির রচনাভঙ্গী এতাদৃশ যে ইহা গাওয়ার সময় নাচাও চলিতে পারে। এককালে এই গানে বঙ্গদেশের হাটবাট ছাইয়া পড়িয়াছিল।"[৯]

এত স্তুতি-নিন্দা যার ভাগ্যে জুটেছিল, তার নামে প্রচলিত তিনটে পদ আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। আস্বাদন করে দেখুন অম্ল কি মধুর!

হীরা মালিনীর সঙ্গে সুন্দরের প্রথম দেখা হয়েছে। সুন্দরের বাসা-বাঁধার ইচ্ছা শুনে মালিনী নিজের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বল্‌ছে—

"ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চারিদিকে মালঞ্চ বেড়া।
ভ্রমরাতে গুণগুণ করে কোকিলে তায় দিচ্ছে সাড়া॥
ময়ূর-ময়ূরী সনে, আনন্দিত কুসুম-বনে
আমার এই ফুলবাগানে তিলেক নয় বসন্ত ছাড়া॥"

মালিনীর বাড়া সুন্দর বাসা করে। সুন্দর পয়সা কড়ি দেয়, হীরা হাটবাজার করে। হীরা 'পরধনহরা', সুন্দরকে ঠকায়, দোকানী-পসারীকেও বাদ দেয় না। অথচ বাজার করে নিজের সাধুতা প্রমাণ করবার জন্য সুন্দরের কাছে সে হিসেব দিতে বসে—

"হাটবাজারের হিসাব করে নাও রে এসে সোনার যাদু।
আমি যেই তেঁই এনেছি রে করে কত ভেলকি জাদু॥
টাকা দিয়েছিলে মেকী, মাসীর সঙ্গে কর ফাঁকি,
ফাঁকে ফাঁকে করে ফাঁকি, ফাঁকে ফেললাম কত সাধু॥
যা চাবে চাঁদ তাই এনেছি, কিছু কি বাকী রেখেছি,
হাটের দফা শেষ করেছি, এনেছি চাক-ভাঙ্গা মধু॥"

সুন্দর সবই বোঝে আর বুঝে শুধু হাসে। সুন্দর আসছে না দেখে বিদ্যা চিন্তিত হয়েছে। মনে কত কী উঠ্‌ছে। তবে কি আমার দয়িত আমাকে ভুলে গেল? মালিনী বিরহিণী বিদ্যাকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

"ভোলা সে কি কথার কথা, মন যে মনে গাঁথা।
শুকাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িত লতা॥
হলে পরে বারিহীন, থাকিতে পারে কি মীন,
ছেড়ে কভু নব ঘন থাকে কি বিদ্যুত লতা॥"

এমনি করে গানের আনন্দধারা বাঙালী হৃদয়ের ঘাটে ঘাটে বইয়ে দিয়েছিল গোপাল উড়িয়া।

অভিনয়ের দিক থেকে বিদ্যাসুন্দর নাটকে সমস্ত বক্তব্য গান দিয়ে ব্যক্ত করা হত আর এই নাটকে ভাঁড়ামির মাত্রা ছাড়িয়ে যেত বলে একটা অভিযোগ শোনা যায়। অভিযোগ সত্য সন্দেহ নেই। ত্রুটী ছিল বৈকি। তবে এই ত্রুটী কেবল উপযুক্ত নাটকের অভাবেই নয়, দর্শকসাধারণের রুচি ও রঙ্গমঞ্চের শক্তিহীনতা এর জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। আজ রঙ্গ ও ছায়াচিত্র জগতের দিকে লক্ষ্য করলে কি একই জাতীয় ত্রুটীর দর্শন মেলে না? চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি আজ এই কথা ভাবছেন না?

ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রভাব অল্প ছিল না। 'বিদ্যাসুন্দর,' ও 'রসমঞ্জরী' অনেকদিন ধরে বটতলার সাহিত্যিকদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। খাঁটি বটতলার সাহিত্যিকদের লেখা 'কামিনীকুমার', 'রহস্যবিলাস', 'মধুমালতী' ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও স্বনামখ্যাত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের হাত দিয়েও 'বাসবদত্তা' কাব্য বেরিয়েছিল। আবার গথিক গির্জার মত খোঁচাওয়ালা গুরুগম্ভীর গদ্য-লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত একদিন অকস্মাৎ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন 'অনঙ্গমোহন' কাব্য।

শুধু বাঙালীরাই নয়, ইংরেজরাও ভুলেছিল। স্যার এডুইন্ আর্নল্ড সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যের স্বাধীন ইংরেজী কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন ছবি-টবি দিয়ে সাজিয়ে। বইটি লণ্ডনের *Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.* নামে প্রকাশকেরা ১৮৯৬ সালে প্রকাশ করেছিলেন। আর্নল্ড সাহেব কিন্তু লণ্ডনে বসে বইটা লেখেন নি। ছুটিতে কেনেরী দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে গেছলেন। সেইখানেই রোজ প্রাতরাশের আগে

৯ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩৫৪]।

একটু একটু করে অনুবাদ করতেন। নেশাটা একবার দেখুন! আবার কেন লিখলেন তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন—'*to amuse scholars, lovers and ladies*'—অর্থাৎ তিনি পণ্ডিত, প্রেমিক ও মহিলাদের আনন্দ দেবার জন্যই লিখেছেন। তাই তো শুনি বিভিন্ন ভাষায় নিত্য-সুন্দর নিত্য-বিদ্যার জন্যে আবহমান কাল ধরে স্মৃতিমন্থন করে চলেছে—

"অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লার বিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি।

"কনকচম্পক সম গৌরাঙ্গী অবলা। ঘুম হৈতে উঠিল সে মদন-বিহ্বলা॥
ফুল্ল পদ্মতুল্য মুখ অঙ্গ সাভিলাষ। ক্ষীণোদরে সূক্ষ্ম রোমরেখার প্রকাশ॥
অনবধানেতে স্মৃতা বিদ্যার মতন। অদ্যাপি বিদ্যারে স্মরি বিপত্তি কারণ॥

"I am to die ! Yet, I remember, dying
My soul's delight—my sweet unequalled love,
Like a fresh *champak's* golden blossom lying
Her smile its opening leaves ; and bright above
Over her sleepful brow those lustrous tresses
Dark-winding down, tangled with love's caresses."[১০]

তাইচৌর পঞ্চাশিকার কবিকে কবিগুরুর ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছা করে—

"শুধু দূর সেকালের বহি এক শোক, জপি এক নাম।
কেঁদে কেঁদে বিশ্বে তব পঞ্চাশটি শ্লোক ফিরে অবিশ্রাম।
তোমারি রচিত স্বর্ণ-ছন্দের পিঞ্জরে বাঁধা চিরদিন।
শতবর্ষ এক গান গাহে এক স্বরে বিশ্রাম-বিহীন॥"[১১]

আরও একটি মজার কথা বল্‌ছি। আর্নল্ডের কবিতা তবু ত খানদানী আওতায় পড়ে। কৃষ্ণনগর-শান্তিপুরের জিনিষ কেবল কলকাতা-বটতলাতেই পৌছায়নি, একেবারে সহস্র যোজন পেরিয়ে লণ্ডনে গিয়ে দেখা দিয়েছে। এই 'বিদ্যার' আকর্ষণে *Calcutta Gazette* ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাতে নানা রকম চুট্‌কি ইংরেজী কবিতা বেরুত। এইরকম একটা ছোট কবিতা আপনাদের কাছে নিবেদন করে বর্তমান আলোচনায় ছেদ টানছি—

"My Veedya's beauty fills my head—I study nought beside ;
My Veedya's name I dwell upon from morn till even-tide ;
She only is my every hope, my wish, my aim, my end ;
My orisons to Veedya and to her alone ascend."[১২]

অর্থাৎ ভাষান্তরিত করে বলি—

বিদ্যাবতী-রূপে হৃদি পরিপূর্ণিত নান্যা চিন্তা মে ভ্রাতঃ।
বিদ্যাবতী নামে নিবসামি সম্প্রতি নিরবধি সায়ং প্রাতঃ॥
সো ধনী অব ভেল শরণ হি অন্তিম লক্ষ্য, বাসনা, অভিলাষা।
বিদ্যাবতী-পাশ মিনতি মে পহুঁছত, সো মম এক হি আশা॥[১৩]

নমস্কার॥

---

[১০] সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ কাব্য [পৃঃ ৩৫]।
[১১] ভারতী [ভাদ্র, ১৩০৬ সাল। পৃঃ ৩৮৫-৮৭]
[১২] কালপেঁচার দু'কলম ['বটতলার সাহিত্য (তিন)'। যুগান্তর (৯-৬-১৯৫২ সাল)]।
[১৩] ভাষামিশ্র অনুবাদটি মৎকৃত।

কলিকাতা। [২৯।৪।১৯৫৯]

লঘু বাংলা প্রবন্ধ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জীবনে লঘু-গুরুর পার্থক্য যেমন স্বীকার করা হয়, সাহিত্যেও অনেকটা তাই করা হয়। লঘু সাহিত্য বলতে সচরাচর আমরা বুঝি সাহিত্যের এমন কয়েকটি অঙ্গ বা বিষয়—যার মধ্যে ভাবনার খোরাক নেই অথবা থাকলেও খুব কম। পড়বার সময় একটা প্রীতিকর অনুভূতি পাওয়া যায় মাত্র কিন্তু পাঠান্তে মনের ওপর তেমন কোনও দাগ পড়েনা। কিছু কিছু গল্প উপন্যাস এবং যাকে বলা যায় চুট্‌কি লেখা—এই পর্যায়ে পড়ে বটে। তাদের মধ্যে চিন্তা-বস্তু, শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষ কিছু নেই। যা মনকে ভাবিয়ে তোলে, হৃদয়কে নাড়া দেয়, সাময়িক আবেদনের অতিরিক্ত একটা প্রভাব রেখে যায়, তা লঘু সাহিত্য নয়,—প্রকৃত সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত, সাহিত্য-গুণ-বিশিষ্ট রচনা—এই হল প্রচলিত ও স্বীকৃত ধারণা।

প্রবন্ধের বেলাতেও এই ধরনের প্রভেদ মেনে নেওয়া হয়। প্রবন্ধ-সাহিত্য হল সেই শ্রেণীর সাহিত্য যার মধ্যে শুধু স্তর বিভাগই নেই, আছে রসভেদ। অর্থাৎ একটি বিষয়গত, অপরটি হৃদয়গত রসের আস্বাদ। তাই প্রবন্ধ বা নিবন্ধ হতে পারে তত্ত্বপ্রধান আবার রসপ্রধান। যেখানে তথ্যকে বহন করা, ব্যাখ্যা করাই মূল উদ্দেশ্য, সেখানে প্রবন্ধ হয়ে ওঠে যুক্তিবাদী মননশীল তথ্য-সাহিত্য। তবে তথ্যমূলক প্রবন্ধকেও অকারণ পাণ্ডিত্যে কণ্টকিত না করে সুপাঠ্য ও সরস করা যায়, যদি থাকে সামঞ্জস্য-বোধ, ভাব ও ভাষার প্রসাদ। আর যে প্রবন্ধ শুধুই সংবাদ পরিবেশন করেনা, নিজস্ব আবেগ ও সরসতায় অপর হৃদয়কে সংক্রামিত করে, পাঠকচিত্তের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম-গভীর বন্ধন স্থাপনা করে, সেটাই হল রস-প্রবন্ধ। এ জাতীয় রচনাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, লঘু প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। লঘু প্রবন্ধ মানেই চিন্তালেশ-হীন খানিকটা তরল বাচালতা নয়। তার মধ্যেও অনেক কিছু ভাবনার বিষয় এবং ভালো জিনিস থাকতে পারে এবং থাকেও। ওর বহিরঙ্গ অর্থাৎ চালটাই লঘু, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নেই—এ কথা বলা চলে না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-কৌতুকের হালকা ভঙ্গীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আলোচনা করেছেন রস-সাহিত্যের এই মাধ্যমে। ফলে, রস-চেতনার ভিতর দিয়ে চিন্তনীয় বস্তু আরও সহজ ও পরিষ্কার রূপ নিতে পেরেছে।

একে একরকম সাহিত্যিক স্বগতোক্তি বা ছাপা অক্ষরে নিভৃত সামাজিক আলাপ বলা চলে। এর মধ্যে আছে মনের ও কল্পনার অন্বয়। এর জন্য চাই এমন একটি ভাষা ও মেজাজ, যার ঘটকতায় নিজের কথা ও ভাবনা অপরের কাছে পৌছে দেওয়া যায়। যা থেকে সমাজের সূত্রপাত, তাই থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি। প্রয়োজন-সাহিত্যের মারফৎ সাহিত্যের একরকম বিবর্তন, কল্পনা-সাহিত্যের মাধ্যমে আর এক ধরণের রস-সাহিত্যের বিকাশ। যেখানে মনের অন্বয়, সেখানে সাহিত্য হল প্রণয়জ সৃষ্টি। বিশেষ করে রস-সাহিত্য। অতএব লঘু প্রবন্ধ যদি সেই রসগ্রহণ ও বিতরণ করে, তা হলে প্রবন্ধ হিসাবে তা সার্থক। তার সাহিত্যিক অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য।

বর্তমানে এই জাতীয় সাহিত্যকে 'রম্যরচনা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাক্যটি অনেক রসিক পাঠকের মনঃপূত নয়। যেন এ রচনার একমাত্র গুণ রম্যতা অথবা ঐ গুণেই অন্যান্য সাহিত্য-রচনা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী। সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্যপদবাচ্য রচনা

মাত্রেই রম্য। যে রচনায় রমণীয়তার চিহ্ন নেই তা কোনো দিনই প্রকৃত সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হয় নি। সে যাই হোক্, লঘু প্রবন্ধের মর্মে একটি সঙ্গীত-ধর্ম রয়েছে। তা নানাভাবে ও ভঙ্গীতে রস পরিবেশন করে' তৃপ্তি দিতে পারে। তাই লঘু প্রবন্ধের জন্য একটা নিখুঁত মাপকাঠি তৈরী করা, তার প্রকাশ-পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোনও রীতিবদ্ধ নীতিসূত্র সন্ধান করা সঙ্গত হবে না। কেননা, সাহিত্যের এই অঙ্গটিকে একটা নির্দিষ্ট 'ফর্ম্যুলা'র মধ্যে বেঁধে ফেলা চলে না। রসান্বিত এক লঘু, ব্যঞ্জনাময় রচনা কখন ও কি ভাবে সাহিত্য-ধর্মে রূপায়িত হচ্ছে, তা ঠিক দেখানো যায় না। উভয়ের অলক্ষিত সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়।

তবে মোটের ওপর বলা চলে, কি থাকলে পড়া সার্থক হয়, মন ভরে ওঠে আর কিসের অভাবে অতৃপ্ত মন পীড়িত বোধ করে। যেমন বলা যেতে পারে, রসনিবন্ধের মধ্যে একটা ভাবের পরম্পরা, একটা যুক্তির শৃঙ্খলা থাকবে, তা সে সমর্থনযোগ্য বাস্তবই হোক অথবা কাল্পনিক মনগড়াই হোক। ভাবনা যতই বিস্তৃত, প্রক্ষিপ্ত বা সঞ্চারী হোক, সকল কথার পিছনে যেন একটা মূল ধারা থাকে। এইসব প্রবন্ধ তত্ত্বসর্বস্ব হয় না। শুধু নানামুখী চিন্তার সূক্ষ্ম জাল বুননের ভিতর থেকে দেখা যায় লেখক-মনের প্রসন্ন নির্মুক্তি। স্মৃতি-রসের বিন্যাসে, প্রয়োজন ও প্রসঙ্গ-অনুযায়ী লঘু-গুরু ভাষার যথাযথ ব্যবহারে ধরা যায় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ব। থাকে নিজেকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব সম্পন্ন ইচ্ছা আর অনতিরঞ্জিত শিল্পকৌশলের সুপ্রয়োগ। এক কথায় উপলব্ধির ব্যক্তিত্বধর্মী প্রকাশ। তবে এ ধরণের রচনায় লেখকের অবাধ স্বাধীনতা আছে, এ ধারণা ভুল। যেখানে আতিশয্য ও পুনরুক্তির যথেষ্ট আশঙ্কা ও সম্ভাবনা, সেখানে সংযত না হলে তাল কেটে যায়। মনে হয় রসিকতা দীপ্তিহীন, বক্তব্য কষ্ট-কল্পিত। অভিজ্ঞতা উপলব্ধি যখন নিঃশেষিত-প্রায়, প্রিয়বচন তখন ক্লান্তিকর বাগ্‌বাহুল্য। 'আমিত্বে'র খোঁচা যেখানে উগ্র, সেখানে আত্মপ্রকাশ আত্মম্ভরিতার নামান্তর। তখনই রস-জ্ঞানের সমাধি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি অন্তরঙ্গ বাক্যপ্রয়োগে গ্রাম্যতা বা স্থূলতার স্পর্শ এসে যেতে পারে। লেখকের একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার এবং সে দৃষ্টি কিছুটা তির্যক হলে, পাঠকের কৌতুক আরও জেগে ওঠে। কিন্তু অতি-বিরূপ বিদ্রূপ সুরুচির পরিচয় নয়, আর চোখ সর্বদাই বাঁকা হয়ে থাকলে, সেটা আর সরস কটাক্ষ নয়, কটু দৃষ্টি। কথার খেলা ও শাণিত দীপ্তি রচনায় ধার আনে, এ কথা ঠিক। কিন্তু বীরবলী ঢঙকে অনুকরণ করে যদি শুধুই কথায় পালিশ দেওয়া যায়, তা হলে সেটা চপল মুদ্রাদোষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

লঘু প্রবন্ধের এই চরিত্র-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, কেননা এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা কেমন যেন ধোঁয়াটে। এই জাতীয় প্রবন্ধে যা খুশি তাই বলা যায়, অনেক কিছুই ঢুকিয়ে দেওয়া চলে, এই রকম একটা বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের হেতুটা কি ? বোধ হয় এই। যে বিশিষ্ট অর্থে আমরা রম্য রচনা শব্দটি ব্যবহার করছি আজকাল, তা গল্প উপন্যাস, কবিতা নিবন্ধ নয় অথচ সকলেরই কিছু কিছু রস এর মধ্যে সিঞ্চিত আছে এবং মুখ্যতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকের চিত্ত-বিনোদন। এ ধারণা আংশিক সত্য। কিন্তু গদ্যে লেখা বলেই লেখাটা খুব সহজ জগাখিচুড়ি নয়। এর মধ্যে কাব্যের আবেগ, তত্ত্বের ভাবুকতা থাকতে পারে। কাহিনী না থাকলেও গল্পের গতি বা আকর্ষণ থাকতে কোনও বাধা নেই। যুক্তি-প্রমাণের বাহুল্য নেই অথচ পাঠকের বুদ্ধি চেতনাকে চমকিত জাগ্রত করতে পারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য-কর্মের বিভিন্ন রূপগুলির কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বর্তমান।

লঘু প্রবন্ধের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সুর আছে, এমন কি বলা যায় ব্যক্তিগত সুরই হল তার ভিত্তি। গদ্যে রস-রচনার সগোত্র বলেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ইংরেজিতে থাকে 'ফেমিলিয়র' বা 'পার্সোনাল' প্রবন্ধ

বলে থাকি, একটি অন্তরঙ্গতার আমেজ আনে। কখনো ঘরোয়া, কখনো বৈঠকী, কখনও নিজের মনের সঙ্গেই আলাপ। এর মধ্যে লেখক হয় দু চারটি তীক্ষ্ণ সংহত মন্তব্য করে ভাব থেকে ভাবান্তরে চলে যান। তখন লেখক-পাঠকের মধ্যে সূক্ষ্ম সহযোগিতা শুরু হয়, শেষ হয় উষ্ণ কর-মর্দনে। আবার কখনও বা কথকতার চাল। লেখক একটি তুচ্ছ বা নিতান্ত সাধারণ বিষয় অবলম্বন করে কথা বলতে বলতে পাঠকের সঙ্গে একই পথে এগিয়ে চলেন। আর পাঠকও কখনও বিস্মিত, কখনও পুলকিত, কখনও হাস্যরসে উচ্ছল, কখনও বা বেদনাবোধে গম্ভীর হয়ে লেখকের সঙ্গে পা ফেলে চলেন। লঘু প্রবন্ধের এই দু-রকম স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গী থাকতে পারে। কিন্তু যে রকমই লেখার রীতি হোক না কেন, একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য মিলবে। সেটা হল সহজ সাবলীল গতি, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'রিদ্‌ম'। এবং সে গতির মৃদু ছন্দ সৃষ্টি হয় মনের আনন্দ বৃত্তি, সুকুমার সমবেদনা আর লঘু কৌতুক থেকে।

লঘু বা রস প্রবন্ধের প্রাণ হল 'মূড', যার কাছাকাছি প্রতিশব্দ হল মেজাজ, আমেজ। এই মেজাজ বা আমেজের জারক রসে উজ্জীবিত হয়েই আলোচনা পরিণত হয় সৃষ্টিধর্মী জল্পনায়। শুধু প্রবন্ধের যে আলোচনা, তা বিষয়বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ, নিবদ্ধ। কিন্তু পার্সোনাল রচনায় যে আলোচনা, তা বক্তব্যকে এক নিপুণ কলাকৌশলে, মনের ও হৃদয়ের উজ্জ্বল স্পর্শে সুরসিত করে উপস্থাপিত করে। এ হল লেখকের নিজস্ব মনের রূপ, ভাবনার সম্পদ্। এ রচনায় কথা আছে, কথার মানে আছে, গঠন আছে, বলার ভঙ্গী আছে। কিন্তু বাক্য অর্থ ভঙ্গী রূপ সব কিছুর ওপরে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা হল লেখকের ব্যক্তি-সত্তা। সেই সত্তার রূপটি পাঠক দেখতে পায়, আপনার আত্মায় তার স্পর্শ পায় বলেই, পাঠকের কাছে লঘু রসপ্রবন্ধের বিশেষ আকর্ষণ। সাহিত্যের আসরে তার একটি নিজস্ব আসন স্বীকৃত হয়েছে, এই আকর্ষণের জোরেই।

যে 'মূড' বা মেজাজের আওতায় এই সব খেয়ালী রচনার জন্ম হয়, সেই খেয়ালকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই রসবোধ এবং জীবনের উপভোগ। মুখ ভারী করে এ রসরচনা লেখা যায় না, পড়লেও আনন্দ পাওয়া যায় না। কোনও তথ্যকে প্রতিপন্ন করার জন্য লেখক এখানে ব্যগ্র নন। তিনি শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা-জল্পনাকে মনের মতন সাজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরছেন। সেই পরিবেশনেই তাঁর দৃষ্টি, রসজ্ঞান, সহানুভূতি, সৃষ্টির আনন্দ এবং কৃতিত্ব। এক কথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। তাঁর লেখায় তেমন কোনও উদ্দেশ্য নেই, জুলুম তো নেই-ই। লঘু সঞ্চারী শারদ মেঘের মতই তাঁর চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে রূপ ও রঙ বদলায় এবং তার প্রতিচ্ছবি ফেলে যায় পাঠকের মনের পটে। 'পালামৌর পর' রচনাটিতে সঞ্জীবচন্দ্র বোধ হয় এই কথাটিই বলে গেছেন; "সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে। ইহা বুঝাইবার নহে............কোনো পটের বন্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনি কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন............" এই ক'টি লাইনে সঞ্জীবচন্দ্র রস-সাহিত্যের, তথা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের, অন্তর-সুরটি অতি পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। আবার কবিতার সঙ্গে আকারে তার অমিল, কিন্তু সুরে যথেষ্ট মিল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে একটা মূল বক্তব্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বক্তব্যের চেয়ে বলার সানন্দ ভঙ্গিটাই যেন রসসৃষ্টি করে বেশি। শুধু প্রবন্ধে যুক্তি আর তথ্যকে সাজানোর চেষ্টাটাই বড় এবং আসল কথা। কিন্তু যে প্রবন্ধের আসল পরিচয় রসের প্রেরণা, সেখানে যুক্তি-সঙ্গতি কিছু বজায় রেখে লেখককে হালকা মেঘের মতই আলোয় ছায়ায়, উদ্ভাসিত

হাসিতে আকস্মিক বর্ষণে ভেসে যেতে হয়। লেখকের লেখার গতি আর পাঠকের মনের গতি সেখানে এক হয়, পরস্পরের সরস স্পর্শ তখন ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে সার্থক করে তোলে।

কেননা, নিজের মনকে অবাধ-মুক্ত করার চমৎকার পথ হচ্ছে ঐ রসপ্রবন্ধ। সেই পথে, চলতি মানুষ, ক্ষণিকের দৃশ্য, ভেসে-আসা ভাবনা, একটি বড় সত্যের একটু আভাস, বহু-বিচিত্র জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা —সব কিছুই এসে পড়ে। যে বিশেষ মুডে একটি নিটোল গীতি-কবিতা লেখা যায়, অনেকটা সেই মূডেই একটি ভালো লঘু প্রবন্ধ জন্মলাভ করে। নিরতীত, বিস্মৃতিপরায়ণ, নীরব প্রকৃতির পরম-সুখী অবস্থা কল্পনা করে কীটস যখন মানুষের গভীর ও অপ্রকাশ্য পরিবর্ত্তনের দুঃখ নিয়ে কবিতা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিপরীত কৌশলে সেই লিরিকের মূডেই আতা গাছের মধ্যে এক ফোঁটা মন ফেলে দিলে কি মজা হয়, তারই সরস চিত্র আঁকেন 'পঞ্চভূতে'। অবশ্য কবিতা, নাটক, প্রবন্ধের যে অভিজাত ঐতিহ্য, লঘু প্রবন্ধের তা নেই। সে দিক থেকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হয়তো একটু প্লীবিয়ন। কিছুকাল আগেই সে ছিল দুঃস্থ অন্তঃপুরিকা। কিন্তু ঐতিহ্য বড় না হলেও, এর ঐশ্বর্য কম নয়। বিষয়বস্তুর এত বৈচিত্র্য সাহিত্যের অন্য কোনও ফর্মে বোধ হয় পাওয়া যাবে না। এবং সেই সঙ্গে প্রকাশের ভঙ্গিমাও। বহুরূপীর মতই 'ব্যক্তিক' প্রবন্ধ রঙ বদলায়। কখনো তা সারবান বক্তৃতার সামিল, কখনো প্রায় নিখুঁত ছোট গল্পের রেখাচিত্র। কখনো তা আত্মজীবনীর একটি টুকরো, কখনো নির্জন অন্তরঙ্গ আলাপ, কখনো বা লীলায়িত শুদ্ধ প্রলাপ। কোনও কোনও রচনায় শাণিত ব্যঙ্গ এবং বক্রোক্তি, কোথাও বা মৃদু বিদ্রূপের, লঘু কৌতুকের কোমল উত্তাপ। এর বিষয়-বস্তু যা খুশি তাই হতে পারে—ভগবান্ থেকে লাটিম, বিশ্বসৃষ্টি থেকে দেশলাই ধার করা, অভিসার থেকে নিদ্রাহীনতা, বাড়ীর উঠোন, লোহার সিন্দুক থেকে চৌবাচ্চা, শোবার ঘর আর গোরুর গাড়ী, ক্লাইব্ ষ্ট্রীট, হাট-বাজার থেকে খোকার খেলনা আর মধুমালার দেশ, মুখ-চেনা থেকে পর নিন্দা, ভ্রমণ কাহিনীর ভূমিকা থেকে দেশী-বিদেশী শহরের কথা—কিছুই বাদ যায় না।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে এমন কোনও খাঁটি ও নকল জিনিস নেই, যাকে লেখক তাঁর রচনার উপজীব্য হিসাবে ব্যবহার করতে না পারেন। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, চকিতে দেখা একটা নগণ্য খণ্ডচিত্র, একটি বিরল মুহূর্ত্তের খামখেয়াল এ জাতীয় সাহিত্যের খোরাক হতে বাধা পায় না। কেননা লঘু রসপ্রবন্ধই তো আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত বাহন। চেস্ট্যরটন যখন বিছানায় শুয়ে সীলিং-এ লম্বা রঙীন খড়ি দিয়ে ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখেন কিংবা বেলক্ যখন পাখাওয়ালা ঘোড়ার মালিকের সঙ্গে শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়েই কথা বলেন, তখন আমরা বিস্মিত হবার কারণ দেখিনা। কেননা, এগুলো তো খেয়ালী রচনা। এখানে সাধারণ ঘটনার মধ্যেই অসাধারণত্বের বীজ রয়েছে। এখানে টাইম-টেব্‌ল বা ড্যচ গেজেটের নীরস পাতাও সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে যদি লেখকের কলমে সে যাদু থাকে আর পাঠকের মন উন্মুখ হয়। কিন্তু লঘু প্রবন্ধের মতন সংবেদনশীল রচনার কাছে আমাদের একটা প্রাথমিক দাবি আছে। সেটা হল লেখার কৌশলে, দেখা ও দেখানোর ভঙ্গীতে সে আমাদের মনের ওপর একটা বিশেষ নূতন রকমের আলোক-সম্পাত করবে। সে আলো টর্চের তীব্র রশ্মির মতো এ ধার ওধার ঘুরুক অথবা মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোর মতো চারদিকের অন্ধকারকে মোলায়েম আবছায়ায় পরিণত করুক—আমরা দেখতে চাই আলো-জ্বালানো সেই আধো-প্রকাশিত মানুষটির জীবনপ্রীতি, মমত্ববোধ। হৃদয়েরই হোক আর মস্তিষ্কেরই হোক, আমরা চাইব রস, মানব-মনের অভিজ্ঞতার সহজ সুন্দর প্রকাশ। সে অভিজ্ঞতার আবরণ হবে উজ্জ্বল অথবা ম্লান হাসি, তবেই তার আকর্ষণ হবে স্থায়ী। যাঁর রচনায় মননের অনুভূতির বিচ্ছুরিত জ্যোতি নেই, ব্যক্তিত্বের দীপ্তি নেই, আছে নীরস গম্ভীর অহমিকার কুণ্ডলিত ধোঁয়া, সেখানে আমাদের উৎসাহ নিস্তেজ।

এই প্রসঙ্গে লঘু প্রবন্ধে রস-সৃষ্টির কয়েকটি অন্তরায় উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ, এখানে জোর করে হাসানো বা চমক-লাগানোর রীতি মানায় না। একটা কথা বলতে হবে বলেই, তাকে প্রাণপণে ভালো করে বলতে গিয়ে শ্লেষে আর মোচড়ে গলদ্ ঘর্ম হয়ে ওঠা আর্যের পরিচয় নয়। তেমনি আবার একটা সূক্ষ্ম মন্তব্যকে টেনে বুনে সাজাতে গেলে, সেটা হয় শুধুই আলোচনা। তাতে বক্তব্যটা বিশদ বা পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু রসের অপমৃত্যু ঘটে। ব্যক্তিক প্রবন্ধে একটা মোটা কথা অবশ্যই থাকে, কিন্তু কণ্টকিত থীসিস নেই। পারম্পর্য থাকুক্, কিন্তু অকাট্য যুক্তির ধারাবাহিকতার প্রয়োজন নেই। কারণ চেষ্টাকৃত ফল লাভের ইচ্ছাটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠলে রচনার অবলীলা নষ্ট হয়ে যায়। বক্তব্য আর বলার ভঙ্গী—এ দুয়ের শুভ মিলনেই রস প্রবন্ধের সার্থকতা। বলার ধরণটা অনাবশ্যক রকমের উগ্র হলে স্পর্শকাতর পাঠকের মনে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক। তেমনি একই কথাকে অকারণ টেনে যাওয়াও নিরর্থক। বলার ভঙ্গী বেশী মাত্রায় উগ্র হলে সেটা বোঝায় লেখকের স্পর্ধা ও অভিমান।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ও প্রকাশ, কিন্তু স্থূল প্রকাশ নয়। এখানে পাঠক এসেছে দণ্ড মুখোমুখি সহজ আলাপের আশায়, লেখকের হুমকি বা বুদ্ধির কসরতের পরিচয় পেতে আসেনি। তাই 'ব্যক্তিক' প্রবন্ধ ব্যক্তিগত হয়েও নিতান্ত ব্যক্তিগত হওয়া মানায় না। লেখকের ব্যক্তিত্ব থাকবে খানিকটা প্রচ্ছন্না নায়িকার মতন, যার শারীর উপস্থিতি আমরা আভাসে টের পাই কিংবা কোনও এক গভীর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্তে সহসা উদ্‌ঘাটিত হতে দেখি। আর্টকে মুখর করে তোলা এ জাতীয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অভিজ্ঞতার কূজনে, সঞ্চারী দৃষ্টির বৈচিত্র্য-গানে আর্টিস্টের মনের প্রকাশই তার মুখ্য ধর্ম। তৃতীয়তঃ, লঘুতার ধর্মই হল ছন্দোপতনের ভয়। এ সব প্রবন্ধে সামঞ্জস্য জ্ঞান—যার আর এক নাম 'সেন্স অব্ হিউমার' না থাকলে লঘুত্বের মনোহারিত্ব, মিষ্ট স্পর্শটুকু উড়ে যায়। লেখকের মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার, তিনি জানবেন কোথায় ভারসাম্য ব্যাঘাত ঘটছে, কোথায় থামতে হবে। অবান্তর কথা—যাকে বলা হয় ধান ভানতে শিবের গীত, আর উগ্র আত্ম-বিজ্ঞাপন এ দুটো জিনিস না থাকলেই রসপ্রবন্ধ জমে ভালো।

বলা বাহুল্য, লঘু প্রবন্ধের স্বরূপ বর্ণনায় বাংলা সাহিত্যে তার স্থান ও চরিত্রের কথা আমরা ভুলিনি। ইংরেজী আর বাংলা সাহিত্যে লঘু প্রবন্ধের আদর্শ বা উদ্দেশ্য এমন কিছু পৃথক নয়। আঠারো উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে ডায়েরি, স্মৃতিচিত্র, ভ্রমণ চিত্র জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে লঘু প্রবন্ধ একটা বিশেষ রূপ নিয়েছিল। তারপর সাময়িক পত্রিকার মারফৎ তার দ্রুত বিকাশ, অবশেষে সাংবাদিকাতার উর্দ্ধে সাহিত্যের আসরে একটি স্থায়ী আসন অধিকার। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বাতায়নপথে লঘুধর্মী রচনার মৃদু আলো এসে পড়ল বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ঐ উনিশ শতকেই। তাই ঋণ স্বীকারের খাতিরে ইংরেজি সাহিত্যের নজির দেখানো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হলক্রফ্‌ট, হেজন, হ্যাজলিট-প্রমুখ লেখকদের পর ল্যাম-এর অনন্থকরণীয় প্রতিভা লঘু প্রবন্ধের মধ্যে আপনার সার্থকতা খুঁজে পেল। তিনিই সর্বপ্রথম খেয়ালী রচনাকে ইংরেজী সাহিত্যে জাতে তুললেন, তাকে এমন একটি নূতন রূপসজ্জা দিলেন যার জৌলুস আজও কমে নি। তারপর এলেন ল্যে হান্ট, স্টিভনসান। বিংশ শতকে আরো অনেক সাহিত্যিক এই নতুন ফর্মের দিকে ঝুকলেন এবং লঘু প্রবন্ধকে নানা ভাবে রসোত্তীর্ণ করলেন। চেষ্ট্যরটন ও বেলক, ল্যুকস ও বীয়রবম, গার্ডিনার ও জেরোম-কে জেরোম, রবার্ট লিন্ড ও প্রিস্টলি—এদের হাতে 'ব্যক্তিক' প্রবন্ধ উঠল আর্টের পর্যায়ে। মোট কথা,

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে ইংরেজী সাহিত্যের একটি পরিপুষ্ট শাখা। সেখানে বিভিন্ন লেখকের ভিন্নমুখী প্রতিভা সাহিত্যের এই 'সিণ্ডারেলা'কে ভাব-সম্পদে কলাকৌশলে সুসমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের দেশে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই ব্যক্তিগত লঘু প্রবন্ধের পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এর সূচনা আরও আগে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'দুর্গোৎসব' প্রস্তাবে লঘু নিবন্ধের আভাস পাওয়া যায়। আর বিদ্যাসাগরও সব্যসাচীর মতন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ছাড়া লঘু রসরচনায় হাত দিয়েছিলেন, প্রমাণ 'ব্রজবিলাস'-এর বিজ্ঞাপন। এই রচনাটির সুর প্রবন্ধেরই সুর। সঞ্জীবচন্দ্রের অনবদ্য সুন্দর রচনার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। তারপর বঙ্কিমের লেখনীতেই পরিস্ফুট হল ব্যক্তিগত রস-প্রবন্ধের প্রথম অভিনব রূপ। ষ্টাইলের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, বঙ্কিমের রস-প্রকাশরীতি প্রায় ত্রুটিহীন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছদ্মবেশী রচনা হলেও, একে পার্সোণাল প্রবন্ধ বলতে আপত্তি নেই। আর 'বুড়া বয়সের কথা'—এটা তো ষোল আনাই লঘু ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথও এ ধরনের লেখায় একদা হাত পাকিয়েছেন। 'সোনায় সোহাগা' আর 'মুখ-চেনা' এ দুটি নিবন্ধই তার উৎকৃষ্ট নমুনা। তবে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দু একটি রচনা, বিশেষ করে শাস্ত্রী মশায়ের 'তৈল' প্রবন্ধটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা তেমন বেশি নজরে পড়ে না এই যুগে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি লঘু নিবন্ধের উজ্জ্বল নিদর্শন। এমন সূচ্যগ্র অথচ রসার্দ্র, আলোচনা আমাদের সাহিত্যে বড় বেশি নেই।

তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম এ জাতীয় প্রবন্ধের বিপুল সম্ভাবনা দেখালেন ও বহুলাংশে পূরণ করলেন। তাঁর হাতে লঘু প্রবন্ধ কখনও হয়ে উঠেছে কবিত্বময় কথিকা বিশেষ, কখনো একটি আপাত-সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ঊর্ধ্বমুখী কল্পনা, কখনও বা সরস বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষন। 'লিপিকা'র অনবদ্য সুন্দর কথিকা, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', এবং 'কেকা,' 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রভৃতি আরও অনেক রচনা এই রস-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। বুদ্ধি ভাবনার সঞ্চয়কে কত অনায়াসে ও রম্য রীতিতে পরিবেশন করা চলে, একা 'পঞ্চভূতই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর 'ছিন্নপত্রে' কত লঘু-গুরু রসনিষিক্ত গল্প-প্রবন্ধের বীজ ছড়ানো আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিক মাত্রই সে কথা ভালো করে জানেন। রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁর রচনায় ছিল নানা আলোচ্য বিষয়বস্তু। কিন্তু ওরই মধ্যে স্মৃতি, কল্পনা ও চিত্রধর্মী প্রবন্ধগুলিই খাঁটি বলেন্দ্রী সুরে বাঁধা। তাঁর রচনার ভঙ্গী ছিল বিশেষভাবেই নিজস্ব, ব্যক্তিগত। এবং সে ভঙ্গীর চর্চায়ও যথাযথ বিকাশে তাঁর নজর ছিল যথেষ্ট। তাই 'গৃহকোণ', 'শুভ উৎসব' 'যাত্রা' 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' আর 'নিমন্ত্রণ সভা' এতো সম্পূর্ণ, সরস। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে, রসঘন বর্ণনাশক্তিতে, সুদূর স্মৃতিকে স্পষ্টতর রূপ দেবার আশ্চর্য ক্ষমতায় বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের পরেই। প্রবন্ধ সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান হল এই উজ্জ্বল মধুর ব্যক্তিগত স্পর্শ আর বলবার নিজস্ব রীতিটুকু। শরৎকুমারী দেবী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কোনও রচনায় এই অন্তরঙ্গ সুর ও প্রকাশভঙ্গীর ভালো নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। সম্পূর্ণ স্বকীয় বীরবুলী ঢঙে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যকে অভিনব শ্রীতে মণ্ডিত করেছে। লঘু-গুরু রসের তিনি ব্যক্তি-স্বতন্ত্র স্রষ্টা। মননের দীপ্তি আর হৃদয়ের অনুভূতিকে কিভাবে জোড় লাগানো যায় হালকা প্রবন্ধে, তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'বর্ষা' রচনাটিতে।

আধুনিক কালে, অর্থাৎ গত বিশ বছর ধরে, সাহিত্যের এই ফর্মের দিকে অনেক শক্তিশালী কবি ও গদ্য লেখক দৃষ্টি দিয়াছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই

এখনও লিখছেন। তাই তাঁদের দান স্বীকার করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত, যেহেতু যথার্থ সাহিত্য-বিচারের সময় এখনও অনাগত। শুধু এইটুকু বললেই হবে, তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এক একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। বর্তমান লঘু প্রবন্ধ-সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু একটি নতুন পথ দেখিয়েছেন, তাঁর লেখায় কিশোর কালের বিস্ময় আর যৌবনের রোমান্টিক মন সুন্দর ফুটেছে। কোনও কোনও জায়গায় তাঁর মনের আনন্দ লিরিকেরই কোল ঘেঁসে চলে। জ্যোতির্ময় রায়ের লেখায় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। চতুর শ্লেষে, তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য সতেজ। নবেন্দু বসুর ব্যক্তিত্ব ছিল আরও প্রচ্ছন্ন কিন্তু তাঁর হাত ছিল অসম্ভব মিষ্ট। তিনি বলেন্দ্রনাথের উত্তর সাধক। তারপর কবি অজিত দত্ত, পরিমল রায়, ইন্দ্রজিৎ স্মিতোজ্জল ও রুচিবান পন্থায় এই জাতীয় প্রবন্ধের শ্রী-বৃদ্ধি করেছেন। আরো অনেকে এখন লিখেছেন যেমন সৈয়দ মুজতবা আলি ও রঞ্জন এবং তাঁদের ভঙ্গীকে অনুগমন করে অপেক্ষাকৃত তরুণ দল। তবে ক্যোনো কোনো লেখকের রচনায় শিথিলতা ও ফর্মের ত্রুটি এসে যাচ্ছে।

শেষ কথাটি বলি। লঘু প্রবন্ধের বা রসপ্রবন্ধের প্রধান আকর্ষণ হল লেখকের মন ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মূল সূত্র হল ঘনিষ্ঠতা—বিষয়ের সঙ্গে ভাষার, উভয়ের সঙ্গে লেখকের আর লেখকের সঙ্গে পাঠকের। সাহিত্যের এই বিভাগে আমরা বিচরণ করতে চাই গুরুভার তথ্য সন্ধানে নয়, একটি স্রষ্টার বিচিত্র সন্ধানী মনের নাগাল পেতে। আর সে মন যতই ব্যাপক ও সঞ্চারী অথচ গভীর, তার প্রকাশ ততই মূল্যবান।

———

GT12891
OLD & RARE
Central Library
Jadavpur University, Kol-32
JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

স্বদেশী গান

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

১৯০৫-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনে গীত গানগুলিকে স্বদেশী গান বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এবং স্বদেশী গানের অধিকাংশই স্বদেশী যুগেই রচিত। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সমকালীন স্বদেশী সঙ্গীতের পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে, তাহার ভাব ও কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহার পূর্ব্বে রচিত দেশপ্রীতিমূলক বহু সঙ্গীতের সংবাদ লইতে হইবে। বস্তুতঃ স্বদেশী আন্দোলনের যেমন পূর্ব্বকথা আছে স্বদেশী গানেরও তেমন পূর্ব্বকথা আছে। অবশ্য দেশভক্তির উদ্দীপক কবিতা বা কবিতার অংশ এ আলোচনার বহির্ভূত। **অন্নদামঙ্গলের**

সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বু দ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ।

অথবা,

সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

স্বদেশের প্রশংসা, কিন্তু ইহা স্বদেশী ভাবের কথা নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন দেশাত্মবোধ বা Patriatism-এর ভাবটি পাইনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও তেমন সেভাব অতি বিরল। সেই patriotism-এর আবির্ভাব ইংরাজ আমলে। উহা আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি বলিলে ইংরাজ খুসী হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সত্য কথা বলা হইবে না। বিদেশী শাসনের ফলে এই ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে এমন সিদ্ধান্তই ইতিহাস সমর্থন করিবে। একথা অবশ্য সত্য যে শত শতাব্দীতে দেশাত্মবোধের প্রথম কবি Henry Derozio। তিনি ইংরেজী-ভাষী, জন্মসূত্রে অভারতীয়, কিন্তু ভারতবাসী হিসাবেই

My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast;
Where is that glory, where that reverence now?

ইংরাজীতে রচিত এই patriotic song বাঙ্গালী চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার অনুবাদ করেন:

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেইদিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।

তারপর সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেখি ভারতীয় সিপাহী ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে কিন্তু সেই জাতি বৈর বাংলা কাব্যে বা গানে প্রতিফলিত হইতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 'এসময় এদেশে দেশ বাৎসল্যের বড় অভাব।' কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের দেশভক্তি উপেক্ষা করেন নাই। রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'বাংলা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা' বলিয়া লিখিলেন 'ঈশ্বরগুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ'। বিদ্রোহের প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে ১২৫৫ সালের ১লা বৈশাখ **সংবাদ প্রভাকরে** প্রকাশিত দেশপ্রীতির কবিতাটি সম্বন্ধে কোন সমালোচক বলিয়াছেন 'এই কবিতাটি মনে হয় দেশবাৎসল্যের আদি বাংলা গান—স্বধর্ম্মানুরাগ-জনিত দেশ-প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস'। কিন্তু কবিতাটি পড়িয়া বোধহয় এইরূপ মনে হইবেনা।

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি,
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
মিছে কেন মর ভার ব'য়ে?

এই ভাবের সঙ্গে সে যুগের রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম্মের সম্পর্ক বড় নাই। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং সেই কারণে তাহার স্বদেশপ্রীতি প্রসূত কবিতা ঠিক আধুনিক অর্থে জাতীয়ভাবের কবিতা নয়।

তবে ঈশ্বরগুপ্তের কয়েকটি পদে পরবর্ত্তীকালের স্বদেশীভাবের সূচনা দেখিতে পাই। যেমন,

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

অথবা,

জান না কি জীব তুমি জননী জনম ভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?

ঈশ্বর গুপ্ত দেশকে মাতৃসম্বোধন করিলেন, দেশবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উন্মেষ আকাঙ্খা করিলেন, বিদেশীপনা ছাড়িতে বলিলেন এবং দেশ হিতৈষিতার আদর্শ প্রচার করিলেন। এক সমালোচক অনুমান করিয়াছেন যে ঈশ্বর গুপ্ত Derozio দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একান্তই অনুমান।

ইহার পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় **পদ্মিনীর উপখ্যানে** (১৮৫৮) লিখিলেন

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়!

ক্ষত্রিয় সৈন্যদিগের রাজা ভীম সিংহের প্রতি এই উৎসাহ বাক্য উল্লেখ করিয়া স্বদেশী যুগের কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ বলিয়াছিলেন 'যখন স্বদেশানুরাগের প্রাধান্য ছিল না, বীররস বঙ্গভাষায় অপরিচিত প্রায় ছিল তখন রঙ্গলাল লিখিয়া গিয়াছেন "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"।

...এখন স্বদেশানুরাগের স্রোত বঙ্গের প্রায় চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রঙ্গলাল যখন দেশ হিতৈষীদিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অনুরাগ বিষয়টা কি তাহাই অনেকের ধারণার অতীত ছিল।' এখানে দেখিতেছি ১৯০৫এর স্বদেশীগান রচয়িতা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কাব্যে যথার্থ স্বদেশী ভাবের পরিচয় পাইলেন। **Freedom Movement in Bengal** নামক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল ও রঙ্গলালের এই কাব্যাংশকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বাণী বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান রচনার দুই বৎসরের মধ্যেই নীল বিদ্রোহ। এই সময় নীলকরের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজার দুঃখ লইয়া রচিত গান কয়টি স্বদেশী সঙ্গীতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। কারণ এ গান বিদেশী বণিকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে রচিত। দীনবন্ধু মিত্রের **নীল দর্পণের** কয়েকটি সংস্করণে এইরূপ তিনটি গান মুদ্রিত হইয়াছিল। একটি আড়ানা বাহার সুরে, একটি কবির সুরে, এবং আর একটি সুরট মল্লারে। তিনটিরই যখন সুর উল্লিখিত হইয়াছে তখন অনুমান করিতে পারি যে নীল দর্পণের যুগে এই ধরণের গান কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ নাই। 'নীল দর্পণে লং সাহেব যথার্থ তাই লিখেছে' গানটি বর্দ্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদের গায়ক ধীরাজ কর্ত্তৃক রচিত এবং দুর্গাদাস লাহিড়ীর **বাঙ্গালীর গান** নামক সংগ্রহ গ্রন্থে এই নামেই মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত কোষে দেখি এটি এবং 'নীল বানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার

ছারেখার' গানটি দীনবন্ধুর রচনা বলিয়া মুদ্রিত। যাহা হউক এই গানের ভাব স্বদেশী গানের ভাব হইতে ভিন্ন হইলেও দেশের দুর্দ্দশার কথা হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। এই প্রথম একপ্রকারের গণ-আন্দোলনের পথে গান রচিত হইল এবং তাহা গীত হইল। এ গানের বিষয় ইংরাজ আমলে দেশের দুরবস্থা। যেমনঃ

কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদণের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুঠেছ সকল তো হে কি আর আছে এখন॥
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালি দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।

তবে নীল চাষীর যে তেজ এই গানে সে তেজ দেখিনা। ইহার সুর আর্ত্তজনের সুর, ইহার ভাব কাতর ভাব। যাহারা নীলকরের বিরুদ্ধে লাঠি ধরিয়াছিল তাহারা এগান রচনা করে নাই।

নীল বিদ্রোহের প্রায় চার বৎসর পরে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বীরবাহু কাব্য প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)। স্বদেশীগানের ইতিহাসে এই কাব্যের উল্লেখ অপরিহার্য্য। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে হেমচন্দ্র বলিলেন 'পুরাকালে হিন্দুকুল তিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।' এ ধরণের কাহিনী ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গলালের পদ্মিণী উপাখ্যানে পাইয়াছি। কিন্তু বীরবাহু কাব্যে স্বদেশের যে বন্দনা উচ্চারিত হইয়াছে তাহা পদ্মিণী উপাখ্যানে অথবা ঈশ্বরগুপ্তের কোন কবিতায় নাই। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে সমগ্র ভারতবর্ষে যশোগান এই প্রথমঃ

রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার॥
উচ্চ হিম গিরিচূড়া হিমাণী-মণ্ডিত।
অরুণের রথ বোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি॥
গোমুখী বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবারাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নর অংশে জন্মে সেই রামনারায়ণ।
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন॥
তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছ তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
স্বরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ॥
ভবভূতি তব নাম অনাম্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব-অন্তরে॥
এবে সেই দেশমান্যা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছ কুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥

স্বদেশ বন্দনা যেমন হেমচন্দ্রই প্রথম করিলেন আবার জাতি-বৈরের ভাব লইয়া স্বাধীনতা আকাঙ্খার উদ্দীপক কবিতাও তিনিই প্রথম রচনা করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছিলেন 'হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বধর্ম্ম পালন বা স্বজাতি বাৎসল্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু হেমচন্দ্র জাতিবৈর-জনিত দেশ ভক্তিতে ভোরপূর।' হেমচন্দ্রের এই জাতিবৈর-জনিত দেশভক্তির সার্থক প্রকাশ তাহার 'ভারত-সঙ্গীতে।' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে পাঠাইলে তিনি মন্তব্য করেন 'জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ—বাক্যটা ভারতের সম্মিলন সাধন জন্য বিধি প্রেরিত ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে উল্লেখ করে; উহা ঠিক নয়। বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে নরম সুরই সঙ্গত।' ইহাতে হেমচন্দ্র 'ভারত-বিলাপ' কবিতাটি

লিখিয়া পাঠান এবং তাহাতে ভূদেবের সাবধানবাণীর উপর মৃদু কটাক্ষ করিলেন—'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।' কবিতাটি ১৮৭০ সালে ১০ই জুন এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভূদেব 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি কবিতাটিকে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উপস্থিত করিবার পরামর্শ দিয়া বলিলেন 'ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপক কথা দিলে মনও সরস হয় উচ্চভাবেরও আলোচনা হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে শান্ত, সংযত হিন্দুর দেশে আইনভঙ্গের বা রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য উত্তেজনা হয় না।' পরিবর্ত্তিত আকারে কবিতাটি ১৮৭০ সালে ২২শে জুলাই **এডুকেশন গেজেটে** 'ভারত-সঙ্গীত নামে প্রকাশিত হইল। কিন্তু এত সাবধান হইয়াও ভুদেব রাষ্ট্ররোষ এড়াইতে পারিলেন না। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টার রবিনসন সাহেব কবিতার যবন শব্দের অনুবাদ করিলেন বৈদেশিক এবং মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীকে শিউজী নামে কোন এক সাধারণ লোক মনে করিলেন। ভূদেব কোনমতে এক যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়ত দিয়া সরকারকে নিশ্চিন্ত করিলেন। ভুদেবের ব্যাখ্যায় সরকার তুষ্ট হইলেন কিন্তু কবিতাটি একান্ত ভাবে জাতি বৈরের কবিতাঃ

জপ তপ আর যোগ-আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,—
তূণীর কৃপাণে করবে পূজা!
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহী মণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত—রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবেনা, হবেনা, খোল তরবার
এসব দৈত্য নহে তেমন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন 'হেমচন্দ্রের দেশভক্তি কখনও রৌদ্ররসে ফুলিয়া উঠে নাই।' উদ্ধৃত অংশটি পড়িয়া এই মতের সমর্থন আর কে করিবে। এ কবিতার যথার্থ মূল্য বিচার করিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি বলিলেন ইহা 'স্বদেশ প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্জলিত করিয়া তোলে এবং তূরী ধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।' এবং স্বদেশীযুগে এই কবিতার জনপ্রিয়তার কারণ বিপিনচন্দ্রের কথা হইতে বুঝিতে পারি, 'প্রতিভাশালী লোকের ঝঙ্কার তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া জাতিকে উদ্বোধিত করে। হেমচন্দ্রের কবিতার দুইটি চরণ যাহা কোন সুদূর বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত এই পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তাহা প্রাণে প্রাণে জাগ্রত রহিয়া আমার হৃদয়ে কত সময় কত নব বলের কত নবীন আশার সঞ্চার করিয়া দিতেছে।' ১৮৭০ খৃঃ প্রকাশিত এই দুইটি কবিতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যও বড় কম নয়। ১৮৬৭ খৃঃ হিন্দুমেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কর্ম্ম ও চিন্তায় সরকার ক্রমে ক্রমে কিছু রাজবিদ্বেষের ভাব আবিষ্কার করিতেছেন। ১৮৬০ খৃঃ যখন মেকলে কৃত Indian Penal Code বিধিবদ্ধ হয় তখন অনবধানবশতঃ রাজদ্রোহ সম্বন্ধীয় ধারাটি উহা হইতে বাদ পড়িয়া যায়। ১৮৭০ খৃঃ উক্ত ধারা Code এ সন্নিবেশিত হইল। ভূদেব যে রাজদ্রোহকে **সামাজিক প্রবন্ধে** অবাঞ্ছণীয় ও অহিন্দু বস্তু বলিলেন তাহার অঙ্কুর এই সময় দেখা দিল। হেমচন্দ্র একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে তিনি 'ভারত সঙ্গীত' ও 'ভারত বিলাপ' লিখিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছেনঃ 'একটা লোক নাই যে প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য নিজের জীবনটা দিতে পারে। যে দেশের লোকর অবস্থা এইরূপ, সে দেশের লোক জাতীয় সঙ্গীত লেখে কেন'? এ প্রশ্নের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াও বলিতে পারি সে যুগের জাতীয় সঙ্গীত জাতীয়তাবোধ ও জাতিবৈর দুয়েরই সৃষ্টি করিয়াছিল।

হিন্দুমেলা বা স্বদেশী মেলার স্বদেশী গানের আলোচনার পূর্ব্বে ঐ মেলা প্রবর্ত্তনের দুই বৎসর পূর্ব্বে রচিত দুটি স্বদেশী গানের উল্লেখ করিতে চাই। মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর দুইটি সনেট 'ভারত-ভুমি' ও 'আমরা'। এই সনেট দুটি কখনও স্বদেশী গান বলিয়া গীত হইয়াছিল কিনা জানিনা। তবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশিত **সোণার বাংলা** নামে স্বদেশী গানের এক সংগ্রহের তৃতীয় সংস্করণে (১লা বৈশাখ ১৩২৮) 'আমরা' কবিতাটি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সনেটটি ভার্সাই সহরে রচিত এবং চতুর্দ্দশ-পদাবলীর প্রথম সংস্করণের তারিখ ১লা আগষ্ট ১৮৬৬। সুতরাং অনুমান করিতে পারি এই সনেটটি ১৮৬৫ খৃঃ কোন সময়ে রচিত। এই হিসাবে 'আমরা' সনেটটি বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রীতি প্রসূত প্রথম সম্পূর্ণ কবিতা। ভাবে ও ভাষায় এটিকে একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলিতে পারি না।

কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?
বামন দানব-কুলে সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমার?

১২৭৩ সালে চৈত্র সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ (১২ এপ্রিল ১৮৬৭) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়ায় ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত চৈত্র-মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। এই মেলার প্রথম অধিবেশনে গীত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত,

মলিনমুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি॥
চন্দ্রজিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখে কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি॥

স্বদেশী যুগের নানা সঙ্গীত সংগ্রহে এটি অবশ্য স্থান পাইয়াছিল। তবে ইহাতে বীর রসের অভাব বলিয়া পরবর্ত্তীকালে ইহা তেমন সমাদর লাভ করে নাই। ১৮৬৮ সালের ১১ই এপ্রিল হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটি প্রথম গীত হয়। **আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস গ্রন্থে** সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: 'এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা'। এই হিন্দুমেলাতেই প্রথম বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত জাতীয় সঙ্গীত রাজনৈতিক সভায় গীত হইল। সত্যেন্দ্রনাথের গানটি স্বদেশী যুগে প্রায় প্রত্যেক সঙ্গীত সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কোরাস হিসাবে এ গানের শক্তি যে অপূর্ব্ব তাহা এটি এতকাল পরে কবিতা হিসাবে পড়িয়াও বুঝিতে পারি:

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥
... ...
কেন ডর, ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়॥
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

এই গানের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা যেমন একদিকে ভারত বন্দনা অন্যদিকে আবার ইহা স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এক নুতন আহ্বান। বোধ হয় এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র এই গান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়—কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষ্যে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।' বন্দেমাতরমের পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রনাথের এই গানটি ছিল বাঙ্গালীর প্রধান জাতীয় সঙ্গীত। ১৮৮৪ খৃঃ প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী** নামক সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম গান এইটি। এই সংগ্রহের তৃতীয় সংস্করণের (১৮৯৩) প্রথম বিভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে ৭৪টি জাতীয় সঙ্গীত। এখানেও 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি ভারত সঙ্গীত নামে প্রথমে স্থান পাইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই যে জাতীয় সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহাই **ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীতে** গান সন্নিবেশের পারম্পর্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারি। এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগের নাম জাতীয় সঙ্গীত এবং দ্বিতীয় বিভাগের নাম সামাজিক সঙ্গীত। ইহার প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে এবং কংগ্রেসের জন্মের প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে **অবলা বান্ধব** সম্পাদক **সঞ্জীবনী** পত্রিকা ও ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন ও শিবনাথের সহকর্ম্মী দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে ১৮৭৬ খৃঃ জাতীয় সঙ্গীত নামে একখানি স্বদেশী গানের সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। এবং এই সংগ্রহেও প্রথম গান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান'। জাতীয় সঙ্গীতের এই প্রথম সংগ্রহটি নয়টি সংস্করণ হয়। কিন্তু আজ ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে একখণ্ড দেখিয়াছি। দ্বারকানাথের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্রের কাছে একখণ্ড আছে শুনিয়াছি। ১৮২৩ খৃঃ শ্রীশচন্দ্র বসুর লাহোর হইতে এই জাতীয় সঙ্গীতের এক ইংরাজী অনুবাদ Indian National Songs and Lyrics নাম দিয়া প্রকাশ করিলেন তারপর শ্রীশচন্দ্র লাধারাম নন্দ নামে তার একটি পাঞ্জাবী বন্ধুর সাহায্যে এই সঙ্গীতগুলির হিন্দী অনুবাদ প্রচার করেন। লাহোরের রাজপথে ঐ সময় পাঞ্জাবী যুবকের চারণদল এই গানগুলি গাহিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সংগৃহীত এই গানগুলি তর্জমা করিয়া রাশিয়ার যুবরাজকে শুনাইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ২রা মার্চ্চ সেণ্ট পিটার্সবার্গ হইতে রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত এক পত্রে নিশিকান্ত জানান 'Alluding to the Patriotic songs, His Imperial Highness asked, if such hymns were not prohibited by the British Government, to which, as far as I was aware, I answered in the negative.' ইহার উত্তরে নিশিকান্ত যুবরাজকে বলিয়াছিলেন 'A propos, I observed that these patriotic hymns had been mostly composed and sung on the occasions of what we call 'The Hindu Mela' : an annual vernal feast which bore much resemblance to the Greek Olympic Games and which has for its objects, as in the other case, the inculcation and the development of the national spirit of the Hindu race.'

বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেস প্রতীক্ষার প্রাক্কালে জাতীয় সঙ্গীতের বড় আদর। তার কারণ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাংলা দেশে জাতিবৈরের ভাব বেশ একটু তীব্র হইয়া উঠিতেছে। ১৮৭৬-এর জানুয়ারী মাসে দেখি ইংলণ্ডের যুবরাজকে অভিনন্দিত করিবার জন্য জগদানন্দ

মুখোপাধ্যায় সমাজে উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িলেন। তাহায় পর ১লা মার্চ্চ দি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাস কৃত **সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক** মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেব বিদ্রোহী বন্দীদের হাতে নিহত। বন্দীদের মধ্যে একজনের কথা 'এই ইংরাজের অত্যাচার আর সওয়া যায় না। হয় পায়ের শিকল ছিড়ব, না হয় মরব।' এবং নাটকের আরম্ভেই একটি দেশপ্রেমের গান :

হায় কি তামসী নিশি ভারত সুখ ঢালিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভাষি,
ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি,
কান্দিতেছে অবিরল,
কে এখন নিবারিবে,
জননীর অশ্রুজল।

৪ঠা মার্চ্চ এই নাটক অশ্লীল এই অভিযোগে উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু এবং আরও কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। ২০শে মার্চ্চ হাইকোর্টের বিচারে ইহারা মুক্তি পান। সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া Dramatic performances control Act বিধিবদ্ধ করেন। ইহার দুইবৎসর পর Vernacular press Act এবং তারপর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি কোনক্ষনে রচনা করেন তাহা অনুমান সাপেক্ষ। তবে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ইহা মুদ্রিত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। এবং সমগ্র আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৫ এই দশবৎসরে বাংলা দেশে যে জাতীয় ভাব ও জাতিবৈরের উন্মেষ হয় বন্দেমাতরম সঙ্গীতে তাহার সার্থক প্রকাশ। ইহা কোন সঙ্গীত সংগ্রহে প্রথম সন্নিবেশিত হয় ঠিক বলিতে পারি না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর তৃতীয় সংস্করণে ইহা স্থান পাইয়াছে দেখিয়াছি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে 'বন্দেমাতরম্' ও অন্যান্য জাতীয় সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে তাহার এক প্রমান পাই সঙ্গীত **মুক্তাবলীর** তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায়। সেখানে নবকান্ত অভিযোগ করিয়াছেন যে 'ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে সঙ্গীত মুক্তাবলীর অনুকরণে, উহা হইতে বহু সঙ্গীত লইয়া এমন কি উহার "জাতীয়, সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি সঙ্গীতবিভাগগুলি পর্য্যন্ত অবিকল গ্রহণ করিয়া কয়েকখানা সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইয়াছে। শুনিয়াছি বটতলা হইতে একাধিক জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ সে যুগে ছাপা হইয়াছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যেই প্রথম বাংলা দেশে জাতীয় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ১৯০৫-৬ সালে বাঙ্গালী যেমন দেশী কাপড় লইয়া স্বদেশী গান গাহিল ১৮৮৪ খৃঃ তেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশী ষ্টীমার ব্যবসা লইয়া বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একখানি জাহাজের নাম হইল 'স্বদেশী'। বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর সহিত পাল্লা দিয়া বাঙ্গালী জাহাজ চালাইতেছে ইহা সে যুগে এক বিশেষ আত্মপ্রসাদের ব্যাপার ছিল। বরিশালে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে এই কীর্ত্তির জন্য এক সভায় অভিনন্দিত করা হয় এবং তাহার পর নগরে জাতীয় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ইহার এক সুন্দর বর্ণনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখেই শুনিতে পারি : 'সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল-কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্ত্তনের দল " — " বাবুর বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন্—যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়্তে লাগল—তারপর বাজারে পৌছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠ্ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝতে পারলে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।' জ্যোতিরিন্দ্র নাথের **জীবন স্মৃতি** গ্রন্থে এই সংকীর্ত্তনের কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইয়াছে। এই economic স্বদেশীর আবির্ভাব ও ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হইয়াছিল। এমন কি বিদেশী পণ্য বর্জনের কথাও এই সময়ের মধ্যে প্রথম উঠে। ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত কৃষ্ণ মোহন মল্লিকের A brief History of Bengal commerce গ্রন্থের সমালোচনায় ভোলানাথচন্দ্র বলেন 'Allow us a share in the administration, and to frame our own Tariff—and, with, perhaps at starting, a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether Providence has willed them to be more agriculturists, or whether they cannot dethrone king cotton of Manchester, and once more re-establish their sway in the cotton world'.

এই প্রবন্ধ Mookherjee's Magazine-এ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। স্বদেশী আন্দোলনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' ইহাই পূর্ব্ব ইতিহাস। অবশ্য ভোলানাথ চন্দ্র ইংরাজী নবিশ এবং ইংরাজী patriotism-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাহার *Travels of a Hindoo* গ্রন্থে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন 'the Vocabulary of the Brahmins has no word for patriotism' এবং in the whole compus of that literature, there is not one spirit-stirring war, song like the Bannockburn or the Battle of the Baltic. তবে ১৯০৬-এর স্বদেশী ভাবের সঙ্গে ভোলানাথ চন্দ্রের স্বাদেশিকতার প্রভেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি না।

কংগ্রেস শুরু হইবার পর যে বাংলা জাতীয় সঙ্গীতটি প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে গীত হয় সেটি রবীন্দ্রনাথের 'আমরা মিলেছি মায়ের ডাকে'। ১৮৮৬খৃঃ কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই গানটি গাহিয়াছিলেন। এবং কংগ্রেসের এই অধিবেশন উপলক্ষে যে এই গানটি রচিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে পারি। এই গানের প্রতি পদে দেখি স্বদেশী যুগের ভাব :

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে—
নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে॥
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে—
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিতে আয়রে মাকে॥

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে। গীতবিতানে 'জাতীয় সঙ্গীত' বিভাগের প্রথম গান দুটি হিন্দুমেলার জন্য রচিত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় গানটি 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' ১৮৭৭ খৃঃ হিন্দুমেলা পঠিত বা গীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দুর্গাদাস লাহিড়ীর বাঙ্গালীর গান গ্রন্থে ইহা রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কাজে সপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দেমাতরম্।

এই গানটি প্রথম মুদ্রিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের **পুরুবিক্রম** নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) পরে গানটি স্বর লিপিসহ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক সম্পাদিত **সঙ্গীত প্রকাশিকা** এক সংখ্যায় এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা রূপে পুর্ণমুদ্রিত হয়। **জীবন স্মৃতির** 'স্বাদেশিকতা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলা ছাড়া স্বাদেশিকের সভারও উল্লেখ করিয়াছেন! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের **জীবন স্মৃতি** হইতে বুঝিতে পারি এই সভাই সঞ্জীবনী সভা। ইহারই সাঙ্কেতিক নাম ছিল হামচুপামুহাফ্। অনুমান করিতে পারি এই সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' গানটি কবি কর্ত্তৃক গীত হয় কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশনে এবং

গানটি এই উপলক্ষেই রচিত। বাংলা সাহিত্যে এইটিকে শ্রেষ্ঠ ভারত বন্দনা বলিতে পারি। এই সুরের প্রত্যেকটি অক্ষরে মন্ত্রের শক্তি, সুর ছাড়া ইহা উচ্চারণ করিলে দেখি ইহা এক সুষ্ঠু সূক্তের মত শুনায়। এবং এই বৈশিষ্টে এই গানটি বঙ্কিমের বন্দেমাতরমের সঙ্গে তুলনীয়।

১৯০৫-এ স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার মধ্যে যে জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় তাঁহার অধিকাংশই সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত। উহার সহিত পূর্বে রচিত জাতীয় সঙ্গীতের যেমন সাদৃশ্য তেমন প্রভেদ। ভাষা ও ভাবে এই দুই যুগের জাতীয় সঙ্গীত দুই প্রকারের রাজনৈতিক চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। প্রথম যুগের স্বদেশী গানের সহিত পরবর্ত্তী যুগের স্বদেশী গানের তুলনা করিয়া বিপিন চন্দ্র পাল তাহার 'The Hymnology of the New Patriotism in Bengal' প্রবন্ধে বলিয়াছেন 'the weakness of the old patriotism lay in this unreality. It was an airy fairy sentiment that appealed the imagination very powerfully no doubt, but had no direct and vital reference to our traditions or our experiences, and it naturally failed therefore to take any root in the real life of the people'. এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। অন্ততপক্ষে মনমোহন বসুর স্বদেশী গান প্রাণহীন এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সহিত সম্পর্ক শূন্য একথা একেবারেই বলা চলে না। যাহার গানের কথাঃ

'দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ অনশনে তনুক্ষীণ।

অথবা,

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে সার শস্য
গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূসি শেষে হায়
গো রাজ্য কি কঠিন।

তাহার গানে দেশের বাস্তব জীবনের কথা নাই কে বলিবে? এ গানের মন্ত্রের যাদু নাই; আত্মপ্রত্যয়শীল নির্ভীক জাতীয়তার ভাব নাই। কিন্তু ইহাকে airy fairy বলিয়া বাতিল করিতে পারিনা। এবং এখানে মনে রাখিতে হইবে যে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশক রাজনৈতিক ভাবের যুগ। অপর পক্ষে এই শতাব্দী রাজনৈতিক কর্মের যুগ। **নীলদর্পণ** নাটকও মূলত দুঃখের কাহিনী বা অত্যাচারের অভিযোগ। ইহাতে কোন মহৎ উদ্যোগ বা রাজনৈতিক প্রচেষ্টার আভাষ নাই।

হিন্দুমেলা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব। মনোমোহনের গানে এই পর্ব্বের সমস্ত কথা বিধৃত। কিন্তু তবুও দেখি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত **জাতীয় সঙ্গীত** গ্রন্থে মনমোহনের কোন গান স্থান পায় নাই। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশিত স্বদেশী গান সংগ্রহে তাহার গান পরিত্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ রচিত স্বদেশী গানের জনপ্রিয়তা মনোমোহনের সঙ্গীতগুলিকে ক্রমে অপ্রচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ দুইযুগের স্বদেশী গানের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বহুলাংশে ভাষার উৎকর্ষের প্রভেদ। মনোমোহন বসু প্রভৃতির গানগুলির ভাষা যত সরল তত সুষ্ঠু নয়। হাফ-আখড়াই বা দাঁড়া কবির রচনার ন্যায় ইহাতে শব্দের চমক আছে। কিন্তু পদের চারুতা নাই। পরবর্ত্তী যুগের স্বদেশী গান কবিতা হিসাবেও উপভোগ্য। মনোমোহনের গান ছড়া মাত্র, সুর ছাড়া উহা প্রায় নিরাশ্রয়। যদি বলি ভাষার সুষ্ঠুতা বা প্রসাদগুণ ভাবের গভীরতারই পরিচায়ক তাহা হইলে কাব্যতত্ত্বের একটি বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। সে প্রশ্ন এখানে না তুলিয়া ইহাই বলিতে পারি যে প্রতিভা ও রচনা কৌশলে স্বদেশী যুগের সঙ্গীত তাহার পূর্ব যুগের সঙ্গীত হইতে শ্রেষ্ঠ। দুই যুগের রাজনৈতিক প্রেরণার যে প্রভেদ তাহার ঐতিহাসিক কারণ সুস্পষ্ট। ১৯০৬ পর্য্যন্ত

অর্দ্ধ শতাব্দীর স্বদেশী গানের হিসাব লইলে বুঝিব যে প্রথম যুগে যাহার আরম্ভ দ্বিতীয় যুগে তাহার পরিণতি, একই জাতীয়তা বা জাতি বৈরের ভাব স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের পথে এবং নানা রাজনৈতিক ঘটনার প্রবাহে ক্রমে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

১৯০৩ সালে ১২ই ডিসেম্বর Govt. of India Gazzettee-এ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে সারা দেশে যে প্রতিবাদ সভা হয় তাহাতে স্বদেশী গান গীত হইয়াছিল কিনা এখন জানিবার উপায় নাই। একমাসের মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পাঁচশত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় প্রথম সভা হয় ১৯০৪ সালের ১৮ই মার্চ টাউন হলে রাজা প্যারীচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। ইহার পর দ্বিতীয় বৃহৎসভা হয় ১৯০৫-এর ১০ই মার্চ টাউন হলে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে। ঐ বৎসরের ৭ই জুলাই সিমলা হইতে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত সরকারী ইস্তাহারে বিজ্ঞাপিত হয়। অনুমান করিতে পারি সভাসমিতিতে স্বদেশী গানের প্রচলন আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই সঞ্জীবনী পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখিত 'প্রতিজ্ঞা পত্র' প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই। এই প্রতিজ্ঞা পত্রে যে ব্রত গ্রহণ করা হইল তাহার জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। ইহাতে সঞ্জীবনী সম্পাদক লিখিলেনঃ 'আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য্য কেবল নিজেরা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধু-বান্ধবও অন্যান্য লোকদিগকে এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পের সহায় হউন।' যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত **স্বদেশ সঙ্গীত** রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গানের সংগ্রহ **বাউল** ও **স্বদেশ** এবং আর একখানি জনপ্রিয় সঙ্কলন **সোনার বাংলা** ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত সংগ্রহটি স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় নামে একটি গানের দলের জন্য ভবানীপুরে ১৬৩ নং কালীঘাট রোডে পার্থিব যন্ত্রে শ্রীনীরদ বরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশকের নিবেদনের তারিখ ১লা আশ্বিন ১৩১২। অর্থাৎ ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন (১৯০৫ ১৬ই অক্টোবর) কলিকাতায় যে রাখি বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহার প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে এই সংগ্রহটি কলিকাতা সহরে প্রচারিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সংগ্রহ **বাউল** গ্রন্থখানি ইহার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সিটিবুক সোসাইটি হইতে যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত সখারামগণেশ দেউস্কর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত বন্দেমাতরম সঙ্গীত সংগ্রহের খানি বোধ হয় এই আশ্বিনে বাহির হয়। ভূমিকায় তারিখ ১২ই ভাদ্র ১৩১২। **স্বদেশ** নামে সংগ্রহটিও এই বৎসরই প্রকাশিত। ৩০শে আশ্বিনের রাখিবন্ধনের উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে দেখি কবি ঐ উপলক্ষে গান রচনায় তৎপর!

আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে—
এবার যার খুসী সে বাধন কাটুক, আমরা বাঁধব মাকে।

গানটির রচনার তারিখ ২৪শে আশ্বিন। এবং যে পাণ্ডুলিপি হইতে এই গানটি **গীতবিজ্ঞানে** সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে অন্য অনেকগুলি জাতীয় সঙ্গীত লিপিবদ্ধ!

ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবোনা!
হবার নয় যা, কোন মতেই হবেইনা সে, হতে দেব না!
পড়ব না রে ধুলায় লুটে, যাবে না রে বাঁধন টুটে—
যেতে দেব না।

ঐ বৎসরের ভাণ্ডারের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। অনুমান করিতে পারি এটিও রাখি বন্ধন উৎসব

উপলক্ষেই রচিত। ইহার স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় **সঙ্গীত প্রকাশিকার** পৌষ সংখ্যায়।

৩০শে আশ্বিনের রাখি বন্ধন উৎসবে বন্দেমাতরম্ ভিক্ষু সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রায় এই উপলক্ষে রচিত

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক

গানটি গীত হয়। এই শোভাযাত্রায় পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাহার পর ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা শেষ হইলে শোভাযাত্রা পশুপতি বসুর বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখিত যে দুটি গান সহস্র কণ্ঠে গীত হয় সে দুটি বোধ হয় স্বদেশী যুগের সব চাইতে জনপ্রিয় গান। প্রথম গাওয়া হয়,

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদেয যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥

এবং তাহার পর ঐ শোভাযাত্রায়ই গীত হয়,

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে
এত বল নাই রে তোমার, রবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্ব্বলেরও
হওনা যতই বড়ো আছেন ভগবান॥
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান॥

রাখি বন্ধন উৎসবের কিছু আগে পরে অর্থাৎ ১৩১২ সালের ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে **ভাণ্ডার** ও **বঙ্গদর্শনে** যে সব স্বদেশী গান মুদ্রিত হয় তাহার মধ্যে আছে (১) 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', (২) 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', (৩) 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,' (৪) 'মা তুই কি পরের দ্বারে,' (৫) 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,' (৬) 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল', (৭) 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,' (৮) 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি,' (৯) 'আমার সোনার বাংলা,' (১০) 'ও আমার দেশের মাটি,' (১১) 'নিশিদিন ভরসা রাখিস্' ইত্যাদি। ইহার মধ্যে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি সে যুগে জাতীয়তা মন্ত্র গানরূপে গণ্য হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাহার **বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথার** প্রতিজ্ঞা অংশ এই গানটি দিয়াই শেষ করিয়াছেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে কুন্তলীন প্রেসের এইচ্ বোস রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ফোনোগ্রাফে রেকর্ড করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রচিত এযুগের স্বাদশী গানের সঙ্গে তাহার যৌবনের জাতীয় সঙ্গীতগুলির তুলনা এখানে অনাবশ্যক। অপরিণত বয়সে রচিত গানগুলির মধ্যে রামপ্রসাদী সুরে গীত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এই গানটি শ্রেষ্ঠ। 'অয়ি ভুবন মনমোহিনী' ৩৫ বৎসর বয়সের রচনা এবং ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক পত্রে স্বীকার করেছেন যে 'এ গান সার্ব্বজনীন ভারত রাষ্ট্র সভায় গাবার উপযুক্ত নয় কেননা এ কবিতাটি একান্ত ভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।' স্বদেশী যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সার্ব্বজনীনতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গান যেখানে শুধু বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যে রচিত সেখানেও কোন সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন দেখিনা। বস্তুতঃ যেদিন রবীন্দ্রনাথ প্রথম তার নিজের কণ্ঠে তাহার 'সোনার বাংলা' গানটি রাখি

বন্ধন উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে টাউন হলে গাহিলেন সেদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সে যুগের রাজনৈতিক চেতনার যথার্থ ধারক ও বাহক হইয়া উঠিল। এই সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন: 'Rabindranath's **Sonar Bangla,** sung for the first time on the occasion of the second New India Lecture in the Calcutta Town Hall, delivered last month September, 1905 by himself, is the most realistic idyll of Bengal we have as yet had in our literature; and the fact that it has, within less than six week's time, gone down to the most illiterate classes of the community, shows how widespread is the sentiment of patriotism that has so weirdly possessed Bengal today.

এরপর আন্দোলনের নানা দুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে সময়োপযোগী গান রচনার জন্য কবিকে অনুরোধ করা হইত। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই অবশ্য অপরের অনুরোধ কবি তাহার স্বাভাবিক প্রেরণার জন্য রক্ষা করিতেন। বিদেশী কাপড় বর্জনের উদ্দেশ্যে বড়বাজারে যে পিকেটিং হইত তাহার জন্য কয়েকবার বহু যুবক পুলিশ দ্বারা ভীষণভাবে প্রহৃত হয়। ইহাতে ক্রমে উপযুক্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীপূজার দিন বড়বাজারের মারোয়ারী বনিক ল্যাঙ্কাসায়ারে কাপড়ের জন্য advanced contract পাঠাইতেন। ইহাকে বলা হইত Lucky day contract। এই contract প্রেরণ বন্ধ করিবার জন্য যে পিকেটিং হয় তাহাতে পুলিশের প্রহারে কয়েকটি যুবক বিশেষ আঘাত পায়। স্বেচ্ছাসেবকদলের শোভাযাত্রা তখন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ী হইতে বাহির হইত। এই প্রহারের পরে ঐ বাড়ীতে স্থির হয় যে স্বেচ্ছা-সেবকদের উৎসাহ দিবার জন্য এবং কঠিন কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে একটি গান রচনা করিতে অনুরোধ করা হইবে। এই উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রেরণা জোগাইবার জন্য লিখিলেন:

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার॥
দিয়ে তোমর জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গনি,
ওগো কর্ণধার॥

এই বিদেশী, পণ্য বর্জনের পথেই রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি রচিত। শুনিয়াছি বড় বাজারে ক্ষেত্রবাবুর দোকানে যখন প্রথম বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মোটা কাপড় বিক্রী আরম্ভ হয় তখন বোম্বাই মিলের বিলাতী সুতার মিহি কাপড় কিনিতে জনগণকে নিরস্ত করিবার জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা এই গানটি গাহিত।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।

এই গান সম্বন্ধে রজনীকান্তের জীবনীকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন তাহাই বোধ হয় ইহার যথার্থ মূল্য বিচার। তিনি লিখিয়াছেন: এই গানের মধ্যে যেমন পবিত্র আদেশ ও করুণ মিনতি নিহিত আছে, তেমনই বাঙ্গালার চিরন্তণ শাকান্ন ও মোটা কাপড়ের গরিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে; আর ইহার ভাব ও ভাষা অতি সহজ ও সরল, তাই পণ্ডিত-মূর্খ, বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী-ইতর-ভদ্র—বাঙ্গালার সকলেই প্রাণে প্রাণে ইহার প্রকৃত মর্ম অনুভব করিল। বাঙ্গালীর প্রাণ জুড়াইল,

তাহার মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী মনের আশা শুনিতে পাইল। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় রজনীকান্ত বাঙ্গালীকে তাহার ঘরের খাঁটি জিনিষটি দেখাইয়া দিলেন।'

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি স্বদেশী যুগের একটি জনপ্রিয় গান। এটি রচিত হয় বঙ্গভঙ্গের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে। জগদীশচন্দ্র বসু 'মেবার পাহাড়' গানটি শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন 'আমি যদি মেবারের লোক হতেম তাহা হলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত'। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা—বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী বলেন এই মাতৃ বন্দনাটি গয়ায় রচিত হয়। কবি তখন গয়ায় অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সেখানে জেলা জজ তখন লোকেন পালিত। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেন এই গানটি প্রথম প্রকাশ্য ভাবে গীত হয় বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তির পর Evening Club-এর এক অভ্যর্থনা সভায়। দ্বিজেন্দ্রলালের অপর জনপ্রিয় গান 'ধন-ধান্যে পুষ্প-ভরা' সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন 'এই গানকে ইংরাজীতে অনুবাদ কর, ইংরাজ তাহাতে ভুলিবে, আমাদের দেশমাতাকে পরের মা বলিয়া ঘৃণা করিবে না।'

দেশ বন্দনার মধ্যে অতুল প্রসাদের 'উঠগো ভারত লক্ষ্মী, উঠ আদি জগত-জন পূজ্যা' এবং 'বল, বল, বল সবে শত বীণা বেণু রবে' গান দুইটি উল্লেখযোগ্য। অতুল প্রসাদের স্বদেশী গানে আত্মগ্লানি বা জাতিবৈরের ভাব নাই বলিলেই চলে। তাহার প্রত্যেক গানেই দেখি এক গভীর বিশ্বাস ও আশা। যেমনঃ

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়।

সরলা দেবীর অতিত গৌরব কাহিনি মর্ম্মবানি !
গাহ আজি হিন্দুস্থান
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠা,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতনি

বন্দনার সঙ্গে ঐক্যের আদর্শ মিলাইয়া সর্বভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে রচিত হইয়াছিল। 'জনগনমন' গানের পূর্বে এই ভাবের গান আর একটিও রচিত হয় নাই।

কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের স্বদেশী গানগুলি শুধু গানই ; সুন্দর কবিতা হিসাবে উহা আজকাল কেহ বড় পড়েনা। কিন্তু সে যুগে তাহার গান জনচিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার,

মাগো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
"বন্দেমাতরম" বলে ॥

এই গানটি তখন বাউলের সুরে গাওয়া হইত। এই গানটির কয়েকটি পদ অবশ্যি আজও অনেকে স্মরণ করেন যেমন,

আমায়—বেত মেরে কি "মা" ভোলাবে ?
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?

বিশারদের অনেক গান স্বদেশ সঙ্গীতে সন্নিবেশিত। ভবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায়ের গায়কদল এই গানগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলে।

বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গের পর রচিত বিশারদের গানটি বোধ হয় এখনও কেহ কেহ স্মরণ করিয়া থাকেনঃ

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির বায়—
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায় (বন্দেমাতরম্ বলে)
... ...
আছে দিব্য চক্ষু যার, খোল ভবিষ্যতের দ্বার,
সময় হলে পশুবলের দেখ্‌বে প্রতিকার—
হবে, ম্যাঞ্চেষ্টারে অন্ন কষ্ট, হাহাকার সার পেটের দায়।

বিশারদের স্বদেশী গানের এই Militant সুর আবার পাই পূর্ব্ববঙ্গের কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্যের গানে। সে গানের কথা বিদ্রোহের কথাঃ

অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারী মুরারি
....
এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসিধারী
এস ভারত-পাপ নাশকারী

মনে হয় কামিনীকুমার এই ভাবের আরও গান রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু রাজরোষের প্রকোপে তাহা প্রচার করিতে পারেন নাই। তাহার আর একটি গানে আছেঃ

শাসন-সংযত কণ্ঠ, জননী। গাহিতে পারি না গান।
তাই মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বার বার,—
'সুখী কেবা ভবে মোদের সমান ?'

বরিশালে সে সময় যে সমস্ত স্বদেশী গান প্রচলিত ছিল তাহা আজ প্রায় বিস্মৃত। ঐ সকল গানের সাহিত্য মূল্য নাই বলিয়া উহা এখন আর আলোচিতও হয় না। কামিনীকুমারের গানে যে নির্ভয়তা মুকুন্দ দাসের গানেও দেখি সেই নির্ভয়তা। বরিশালের প্রধান জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মুকুন্দ দাসকে স্বদেশী যাত্রা রচনা করিতে উৎসাহ দেন। এই যাত্রার একটি গানে বিদেশীকে লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দদাস লিখিলেনঃ

আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন ত স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধ্‌বে পা বাঁধ্‌বে ধ'রে না হয় জেলে দেবে,
মন কি ফিরাতে পারবে এমন শক্তিময় ?

মুকুন্দ দাসের যাত্রার অনেক গান অশ্বিনীকুমার দত্তেরই রচিত। সে সব গানের নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করা এখন বোধ হয় দুসাধ্য।

হিন্দু মেলা ও স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয় সঙ্গীতগুলির কয়েকটি আজ আমরা কবিতা হিসাবেই মনে রাখিয়াছি। যে ভাব হইতে এ গান মিশ্রিত তাহা আজ আমাদের বোঝা শক্ত। স্বাধীন ভারত বোধ হয় স্বদেশী বুঝিবে না। আমার দেশ, আমার ভাই এ সব কথা আজ আর তেমন আমাদের চিত্তকে অস্থির করিয়া তোলে না। আমাদের দেশ বড় হইয়া আমাদের স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে। দেশকে এখন আর গান করিয়া আদর করিতে হয় না।

সমালোচনা সাহিত্য

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

আমাদের বিষয় যদি সমালোচনা সাহিত্য না হইয়া সাহিত্য সমালোচনা হইত তাহা হইলে উক্ত বস্তুর এক নাতিদীর্ঘ বিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়া সহজেই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতাম। কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যের হিসাব নিকাশ কষ্ট সাধ্য। কোন গ্রন্থের আলোচনা বা কোন গ্রন্থকারের সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তির আলোচনা বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় সর্ব্বরকমের বিচার বিশ্লেষণকে সমালোচনা বলা যায়। কিন্তু সমালোচনা মাত্রেই সাহিত্য এমন বলিতে পারিনা। প্রতিবেশীর বা সরকারের নিন্দাও এক-প্রকারের সমালোচনা। কিন্তু উহা ছাপাইলে সাহিত্য হইবে না। সেরূপ কোনও লেখা বা লেখকের নিন্দা বা প্রশংসা ছাপাইলে তাহাকে সমালোচনা বলিতে পারি কিন্তু তাহা সাহিত্য পদবাচ্য নাও হইতে পারে। সাহিত্যের যে সমালোচনা নিজেও যথার্থ সাহিত্য হইয়া উঠে, মাত্র তাহাকেই সমালোচনা সাহিত্য বলিব। অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারক নিজেও একশ্রেণীর সাহিত্যকার। সমালোচকের এই প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্ব্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন গ্রহণ করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে। এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন— স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য'।[১] অর্থাৎ যে সমালোচনা সাহিত্যের মর্য্যাদা পাইলনা তাহা খাঁটি সমালোচনা হইলনা। Oscar Wilde এরও এই কথা: 'criticism is itself an art. And just as artistic creation implies the working of the critical faculty.... so criticism is really creative in the highest sense of the world'.[২] অবশ্যই সমালোচনা সাহিত্যধর্মী না বিজ্ঞানধর্মী ইহা লইয়া তর্কের অন্ত নাই। এবং সে প্রসঙ্গ এখানে উপস্থিত করিতে চাহিনা। এখানেও রবীন্দ্রনাথের একটি সহজ কথা মানিয়া লইলে আমাদের আলোচনার পথ সহজ হইতে পারে। সাহিত্য-বিচার নামে এক প্রবন্ধে তিনি দুইশ্রেণীর সমালোচনার কথা বলিয়াছেন। এক শ্রেণীর সমালোচনা সাহিত্যের ব্যাখ্যা, আরেক শ্রেণীর সমালোচনা সাহিত্যের বিশ্লেষণ। প্রথম নম্বরের সমালোচনা সাহিত্য. দ্বিতীয় নম্বরের সমালোচনা শাস্ত্র। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার করা যেতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই'।

যে সমালোচনা নিজেই সাহিত্য অর্থাৎ যাহাকে আমরা যথার্থ সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহার বড় অভাব। এই দৈন্য অস্বীকার করিলে আমরা মিথ্যা আত্মশ্লাঘার অপরোধে অপরাধী হইব। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সমালোচনা সাহিত্য নামে এক প্রবন্ধে

১ 'সাহিত্যের বিচারক', 'সাহিত্য সমালোচনা' আধ্যায়, **বঙ্গদর্শন** আশ্বিন, ১৩১০; **সাহিত্য** ১৩৫২, পৃ ২৭।

২ 'The critic as Artist', *Intentions*, 1891, sixteenth edition, p. 137

এই দৈন্য লইয়া যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য: 'বাংলা ভাষায় সমালোচনা সাহিত্য যেমন বিরল তেমনি দুর্বল'। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বাংলা সমালোচনার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আজও অতীত কাহিনীতে পরিণত হয় নাই। তাহার সেই স্পষ্ট কথা কয়টি আপনাদের শুনাইতে চাহি। 'কিছুকাল হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই কেমন একটা বেতরভাব বিদ্যমান। লেখক, সমালোচক, সম্পাদক, এখন আমাদিগের যাহারা, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি বোধহয় স্ব স্ব কার্য্যে উপযুক্ত নহেন। নতুবা আমাদের সাহিত্যে চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের এমন অভাব হইতেছে কেন? আমাদের সংবাদ ও সাময়িক পত্রে সাহিত্য ও তদানুষঙ্গীক বিষয়ের আলোচনা খুব কমই হয়, যাহা এক আধটু হয়, তাহা আমাদের প্রশংসা ও গৌরবের বিষয় নহে তাহা আশু উপাদেয়ও নয়, ভবিষ্যতেও তদ্দ্বারা আমাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই।... "নবপ্রণালী" অনুকারী কাব্য ও কবিতা সমালোচকও মধ্যে মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে ও পত্রে দেখা দিতেছেন; নব-প্রণালী-অনুকারী আমরা লিখিলাম বটে কিন্তু কথাটা ঠিক হইলনা। কারণ ইহারা প্রকৃত কোন প্রণালীর অনুকরণ করেন, স্থির করা কঠিন। কেননা, ইহাদের রচনায় বা সমালোচনায় আদৌ প্রণালীর অভাব। ইহারা বিশ্লেষক বা বিচারক কি উপাসক কি ভাবুক কি নিন্দুক, কি এই সমুদয়ের সব, অথবা কিছুই নয় তাহা তাহারা বোধকরি নিজে নিজেই জানেন না!" ঠাকুরদাসের বাংলা সমালোচনা সম্বন্ধে এই বিচার ও এই রায় নির্ভীক, কিঞ্চিৎ নির্দয় কিন্তু ইহাকে অসার বা অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। এর পর প্রায় তিরিশ বৎসর পার হইবার পরও দেখি প্রমথ চৌধুরী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন: 'সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে বইএর ভাল রকম কাট্‌তি হয় সেই উপায়েই সাহিত্যেও বাজারে বিক্রী করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে একই কারবারের অংশীদার।' এও বড় নিষ্ঠুর কথা কিন্তু ইহাও বোধ হয় একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিনা। আবার অতি আধুনিককালের পণ্ডিতও দেখি এই একই নালিশ উপস্থিত করিতেছেন। 'সমালোচকের সমস্যা' নামে এক প্রবন্ধে শ্রীসরোজ আচার্য্য বলিয়াছেন 'সাম্প্রতিক কালে সমালোচনার দায়িত্ব যেভাবে পালন করা হচ্ছে তাতে গৌরব বোধ করা যায় না।· দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে যেসব সমালোচনা বার হয় তা অধিকাংশই মামুলী ধরণের বিজ্ঞপ্তি এবং স্তুতি-মূলক।...কতকটা সঙ্কোচ এবং ভীরুতা, অনেক সময় বন্ধু প্রীতি এবং গোষ্ঠীর আনুগত্য—এই সব কারণ মিলিয়ে সমালোচকের স্বাধীন সাহসিক কর্ত্তব্য পালনে গুরুতর বাধা রয়েছে'। বাংলা সমালোচনা সম্বন্ধে এই তিন জনের উক্তি একই অভিমত প্রকাশ করিতেছে, ইহাদের সার কথা এই যে বাংলা সমালোচনা যথার্থ সমালোচনা সাহিত্যে পরিণত হইতেছে না।

এই অবস্থার কারণ নির্ণয় করা আমার অসাধ্য। অনুমান করি পণ্ডিতদের পক্ষেও ইহা বহুলাংশে দুঃসাধ্য। তবে সাধারণ পাঠক হিসাবে দুএকটি কথা বলিতে পারি। মনে হয় যেকালে সাহিত্য দুর্বল সেকালে সমালোচনাও দুর্বল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কয়েকখানি মহৎ উপন্যাস রচিত হইয়াছে, উচ্চ কোটীর বহু ছোট গল্প আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, দুচারজন সুকবিও যে আমাদের নাই এমন কথা বলিতে পারি না। অবশ্য নাটকে আমরা এখন প্রতি বৎসরই শূন্য পাইয়া থাকি। দর্শনের গন্থ যদি সাহিত্য পদবাচ্য বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রেও আমাদের কৃতিত্ব বোধ হয় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। আজকাল বাংলা দেশে দার্শনিক নাই

বলিলে ঠিক সত্যকথা বলা হইবে না। কিন্তু মহৎ দার্শনিক গদ্য কোথায়? মননশীলতার একান্ত অভাব সাহস করিয়া বলিতে পারি না আর তাহা বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু গভীর মননশীলতা এখন পর্য্যন্ত উচ্চাঙ্গের গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করে নাই। তেমনি আবার আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু দেখি না। এখানে স্বমতের অধিক বিস্তার না করিয়া একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের অনুরূপমত আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। 'রাজনীতির সাহিত্য' নামে এক প্রবন্ধে শ্রীসরোজ আচার্য্য মন্তব্য করিয়াছেন: 'জীবনের কঠিন ও রূঢ় বিষয়গুলিকে, এর জটিল জিজ্ঞাসাগুলিকে হয় আমরা পরিহার করছি, না হয় কয়েকটি সহজ "মেডইজি" ধরনে ফর্মুলায় পর্যবসিত করতে চাইছি। আমাদের সাহিত্যও তাই মননশীলতা, চিন্তাশীলতা, দার্শনিকতার শ্রমসাধ্য পথ এড়িয়ে স্বতস্ফূর্ত ভাবাবেগ প্রকাশের মধ্যেই মোটামুটি নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলেছে। তাই আমরা সভা সমিতিতে ভাষন-পটু, কিন্তু প্রবন্ধ রচনায় ব্যর্থ।' সমালোচনা সাহিত্য মননশীলতার সাহিত্য। আমাদের যদি মননশীলতার অভাব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের সমালোচনা সাহিত্যেরও অভাব ঘটিবে। আর আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যখন শৃঙ্খলার অভাব, বিচারশীলতার অভাব, সুষ্টুতার অভাব তখন আমরা আর মহৎ সুন্দর গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিব কিসের অবলম্বনে?

অন্যদিকে আবার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আধুনিক কালে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টির পথে বহু বাধা। প্রথম কথা আমরা বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ—প্রমথ চৌধুরী সৃষ্ট সার্থক সমালোচনা সাহিত্য হইতে সহসা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। একটা নতুন ধারা প্রবর্ত্তন করিবার শক্তি লাভের পূর্বেই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধারাকে বিদায় দিয়াছি। দ্বিতীয়ত আমাদের সমালোচক চিত্ত এখন নানাবিধ মতবাদের তাড়নায় কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্ত। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্যশাস্ত্র, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সমালোচনা সূত্র, আধুনিক কালের বিদেশী সমালোচনার বিভিন্ন রীতি, সর্বোপরি মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি সব কিছুই আমাদের সাহিত্য বিচারে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু কোন তত্ত্বই একাধিক তত্ত্বের সার্থক সমন্বয়ে একটি বিশিষ্ট সমালোচনার রীতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এখন পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অবশ্য এ কাজ অতি দুরূহ কাজ। গত শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্যে যখন নতুন সমালোচনা রীতির পত্তন হইল তখন কার্য্যটি ঠিক এত কঠিন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজ সমালোচকের হাতে একটি মোটামুটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিভাষা ছিল। Aristotle হইতে সুরু করিয়া বহু শতাব্দীর বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সেই পরিভাষা উনবিংশ শতাব্দীতে একটি সুস্পষ্ট বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই পরিভাষা আবার কতখানি সংশোধনের অপেক্ষা রাখে তাহাও সমালোচক বুঝিতে সক্ষম। পরন্তু আমাদের সমালোচনার পরিভাষা অস্পষ্ট। সংস্কৃত অলংকারের শব্দসমূহ এখনও আমাদের ধাতস্থ হয় নাই। আবার ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের বহু শব্দের তর্জমা করিয়া আমাদের সাহিত্য বিচারে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার উপর আবার মার্ক্সীয় সাহিত্য তত্ত্বের নানাবুলি গ্রহণ করিতেও বাধ্য হই। কখন কখনও এক পাতা সমালোচনা পড়িয়া মনে হইবে

তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥

মনে হয় আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটু বেশী লিখিয়া ফেলিয়াছি এবং আমাদের বিদ্যা আমাদের বোঝা হইয়া দাড়াইয়াছে।

তৃতীয়ত বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী যুগের পর আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে এমন একজন সমালোচকের আবির্ভাব হয় নাই যাহার প্রতিভায় অন্যের চিন্তার পথ সুগম হয়। আমাদের সাহিত্যগুরু কৈ? আমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহারও

হইতে ছোট নয় এবং সকলেই সকলের চাইতে বড়। শরৎচন্দ্র তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন 'আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।' আমরা মনে করিতে পারি আমাদের গোটা সাহিত্য সমাজ এক বিরাট সদ্‌গুরুর কুম্ভমেলা। এখানে কেবল গুরুর ভীড়, শিষ্য নাই।

চতুর্থত আমাদের সাহিত্য সমালোচনা এখন এক বিশেষ অর্থে পেশাদারী কর্ম হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সাহিত্য সমালোচনাই কাহারও একমাত্র বা মুখ্য পেশা সেখানে অবশ্য পেশাদারী সমালোচক সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ সমালোচক। তাঁহা দ্বারা সমালোচনা সাহিত্যের পুষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে সমালোচনা শিক্ষকতা বৃত্তিতে উন্নতি লাভের জন্য লিখিত এবং প্রকাশিত হয় তাহা সর্বক্ষেত্রে সার্থক সমালোচনা নাও হইতে পারে। নির্জলা সাহিত্য প্রীতির অনুপ্রেরণায়ই যে সার্থক সমালোচনা সম্ভব এমন কথা বলি না। অনেক মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে ছোট খাট উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আসিয়া পড়ে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বৃত্তি মুখিতার তাগিদে আমরা সাহিত্য সমালোচনার মধ্যে কিছু আবর্জনা আনিয়া ফেলি। বিশেষ মর্য্যাদা লোভের তাড়নায় বড় তাড়াহুড়ার মধ্যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এমন কিছু সৃষ্টি করি যাহা অসৃষ্ট থাকিলে সাহিত্যের লোকসান বড় হইতনা। বরং তাহা কখন কখনও এক প্রকারের অনাসৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে। আজকাল বাংলা সাহিত্যে গবেষনার বড় প্রসার। এই গবেষনার পথে আমরা আমাদের সাহিত্য সমালোচনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, কোনও বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছি কিনা, আমাদের রচনার ভঙ্গীতে কোনও বিশেষগুণের আবির্ভাব হইল কিনা তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের শ্রমলব্ধ বিদ্যা কতখানি আমাদের সমালোচনায় কাজে লাগিতেছে তাহা বুঝিতে হইবে। সাহিত্য শাস্ত্র বা সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি পারঙ্গম তিনি সেই কারণে আদর্শ সমালোচক নাও হইতে পারেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে literary scholarship-এর সঙ্গে literary criticism এর সম্পর্ক নিবিড়। T.S. Eliot Matthew Arnold কে academic critic বলিয়া একটু খাট করিতে চহিয়াছেন। মনে হয় academic method সমালোচনার সাহিত্য মূল্য নষ্ট না করিয়াও তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে পারে বাংলা সমালোচনায় এখন পর্য্যন্ত এই সমৃদ্ধি ঘটে নাই।

পঞ্চমত বাংলা সমালোচনা একান্ত ভাবে পণ্ডিত সমাজের সামগ্রী। ইহার স্রষ্টা পণ্ডিত, ইহার ভোক্তা পণ্ডিত। সাধারণ পাঠকের রুচির সঙ্গে সমালোচকের সংযোগ অতি ক্ষীণ বা নাই বলিলেই চলে। অথচ এই সংযোগের অভাবে একটি সার্থক সমালোচনা সাহিত্য গড়িয়া তোলা বোধহয় অসম্ভব। সাহিত্য সহৃদয় সমাজের বস্তু। যদি সমালোচনাও সাহিত্য হয় তবে তাহারও এক সহৃদয় সমাজ প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ পাঠক অর্থাৎ নভেল পাঠক সমালোচনার ধার ধারেন না। তিনি তাঁহার রুচি বোধকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করিবার জন্য সমালোচকের সহায়তা আকাঙ্খা করেন না। অথবা তাঁহার মনের কথাই সমালোচক সরস ও উজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত করিলেন কিনা দেখিবার জন্য তিনি বড় উৎসুক নন। বস্তুতঃ তাঁহার নিজেরই সমালোচনী মন বলিতে বিশেষ কিছুনাই। গত শতাব্দীতে আমরা কথকথা বা তর্জা সমালোচকের মন লইয়া শুনিতাম না। আজকাল বাংলা দেশে নভেল কথকথা বা তর্জার স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা উপভোগ করিতে কোন শিক্ষালব্ধ রুচি বোধের প্রয়োজন হয় না। virginia woolf একস্থানে বলিয়াছেন যে common reader-এর মতামত নানা পথ দিয়া এবং নানাস্তরে শোধিত হইয়া মুদ্রিত সাহিত্য সমালোচনায় প্রবেশ করে। কিন্তু আমাদের পাঠক সমাজে সাহিত্যমত ঠিক কতখানি শক্তিমান এবং সাহিত্য ব্যাপারে তাহা কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতেছে

বোঝা কঠিন। Arnold Bennett সাধারণ পাঠককে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন : 'the one primary essential to literary taste is a hot interest in literature'. বাঙ্গালীর hot interest in literature নাই একথা তাহার পরম শত্রুও বলিবে না। আমরা সকলেই কম বেশী সাহিত্যিক ধরনের মানুষ। আমরা নভেল পড়িয়া অস্থির হই, গান শুনিয়া পাগল হই। কিন্তু চিত্তের এই দুই অবস্থায় রুচি বোধের উন্মেষ এবং সেই পথে সমালোচনা সাহিত্যের পুষ্টি নাও হইতে পারে।

এতক্ষণ শুধু আমাদের ঘাটতির কথাই বলিলাম এবং এই প্রসঙ্গে কেবল অপ্রশংসাই করিলাম। মনে হয় আমাদের এখন কঠিন আত্ম বিশ্লেষণের সময় আসিয়াছে আমাদের সব কিছুই ভাল, সব কিছুই সুন্দর, আমরা অনেকের চাইতে উন্নত ইহা ভাবিয়া উর্দ্ধবাহু নৃত্য করিলে আহ্লাদ হইবে আর কোন লাভ হইবেনা। আর আত্ম বিশ্লেষণ আমাদের বলিষ্ঠ চিত্তের পরিচয় দিবে। আত্ম-গ্লানি অপরাধ, আত্মবিশ্লেষণ কল্যাণ কর। যাহা হোক এখন আধুনিক বাংলা সমালোচনা দু একটি ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্বে বলিয়াছি বাঙ্গালী সমালোচকের এক প্রধান কাজ সংস্কৃত অলঙ্কারের সঙ্গে একটি বোঝা পড়া করিয়া লওয়া, হয় উহাকে বর্জন করা বা উহাকে গ্রহণ করা বা উহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিয়া আধুনিক সমালোচনার উপযোগী করিয়া লওয়া এই তিনের কোন একটি আমাদের এখন করিতে হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারকে একেবারে বর্জন করার প্রশ্ন বোধ হয় আর তুলিতে পারি না। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত একথা বলিতেছি না। সংস্কৃত অলঙ্কারের সূত্র সমূহ অল্পবিস্তর আমাদের সমালোচনায় প্রবেশ করিয়াছে। উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাই বোধ হয় এক শুভ প্রচেষ্টা হইবে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা যে কত কঠিন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাংলা সমালোচনার সৃষ্টি হইল তখন অলঙ্কার শাস্ত্রের যুগ বিগত। দেশী-বিদেশী পণ্ডিত এই শাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর। কিন্তু নতুন সমালোচক গোষ্ঠী তাহাদের সমালোচনা রীতি অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজিলেন না। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে বলিলেন 'এদেশীয় প্রাচীন অলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ্ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল।··· সুতরাং এবম্বিদ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমবা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—অলঙ্কারিকদের প্রণাম করি।' বঙ্কিমের এই প্রবন্ধের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৩ খৃঃ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কারের বহু উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আলঙ্কারিকদের দৃশ্য কাব্যে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিতে মনে হয় তিনি এই শাস্ত্রের বড় গোঁড়া ছিলেন না। হেমচন্দ্র কথিত এই 'ইংরিজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিসে অলঙ্কার বড় আদৃত ব্যঞ্জন নয়। যখন স্মরণ করি সংস্কৃতে কাব্য তত্ত্ব আছে কিন্তু কাব্য বিচার নাই, poetics আছে কিন্তু criticism নাই তখন বুঝিতে পারি যে আধুনিক বাংলা সমালোচনায় প্রাচীন সাহিত্য শাস্ত্রের সার্থক প্রয়োগ বড় সোজা কাজ ছিল না। এযুগে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সমালোচকের নিকট সংস্কৃত অলঙ্কারের কয়েকটি মূল সূত্র ও তাহার তাৎপর্য্য যখন উপস্থিত করিলেন তখন মনে হইয়াছিল আমাদের সমালোচনায় বোধ হয় এতদিনে এক নতুন রীতির প্রবর্ত্তন হইল। সে গ্রন্থে আবার ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বের সার্থক তুলনার এমন কয়েকটি নির্দ্দেশ ছিল যাহা এক নতুন সমালোচনার পথ সুগম করিতে পারিত। অন্যদিকে ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের

Sanskrit Poetics নামক বৃহৎ গ্রন্থ সংস্কৃত অলঙ্কারের এক আনুপূর্বিক পূর্ণ পরিচয় দিয়া ঐ শাস্ত্রের দিকে পণ্ডিত ও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় ইহাতে নতুন ফল ফলিল না। সংস্কৃত অলঙ্কারের চর্চা নুতন উৎসাহ পাইল কিন্তু সে চর্চা আমাদের সমালোচনার নতুন পথ আনিল না। ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ডাঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিতগণ নানা দিক দিয়া অলঙ্কারের আলোচনা করিলেন, কিন্তু সে আলোচনা আমাদের সমালোচকের তেমন কাজে লাগিল কৈ? পূর্ব্বপুরুষেরা ঝাড়লণ্ঠণের ন্যায় এ অলঙ্কার আমরা ফেলিতেও পারি না আবার ব্যবহারও করিতে পারি না।

ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্ব বা সমালোচনা রীতিইবা আমরা কতখানি সার্থকভাবে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছি? তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংস্কৃত অলঙ্কার বা ইউরোপীয় Poetics ও Criticismএর অনুসরণ করিবার এমন কি প্রয়োজন? সমালোচনার মূলে রুচি বোধ এবং এই রুচিবোধের যখন উন্মেষ হয় তখন বিচারশীল মন যথার্থ সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করিবে। প্রাচীন কালের মাপকাঠি বা বিদেশের মাপকাঠি লইয়া ব্যস্ত হইব কেন? আমাদের সাহিত্য আমরা আমাদের মাপকাঠি দিয়াই বিচার করিব। সাহিত্য বা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু একথা বলে না। ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যে একটি ঐতিহ্য পরিষ্কার দেখিতে পারি। যেখানে প্রাচীন মতের খণ্ডন হইতেছে সেখানে বুঝিতে পারি ঠিক কি হইল কি ঘটিল; যেখানে প্রাচীন মতের সংশোধন হইতেছে সেখানেও বুঝিতে পারি কেন তাহা হইল। অর্থাৎ ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যে পথ, বিপথ, নতুন পথ কোনটি কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রুচি সংস্কার ও শিক্ষা সেখানে সমভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস ভিন্ন, এবং ইহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মূল কারণ এই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাইব। গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিচার তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার ফল। কোন রীতি বা তত্ত্বের আশ্রয়ে এই সমালোচনা লালিত পালিত হয় নাই। 'জয়দেব বসন্ত ও বিদ্যাপতি বর্ষা' এই সুক্ষ্ম সুন্দর বিচার কোন রীতি বা তত্ত্বের অপেক্ষা রাখে না। ইহা অসাধারণ প্রতিভার কথা। অথবা যখন বঙ্কিম বলিলেন 'শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন' তখন বুঝিলাম এমন পরিচ্ছদ এমন সরল অথচ উজ্জ্বল কথা এক মাত্র তাহার কলমেই সম্ভব। এ ভাষা অন্যে বলিতে পারিবে না।

যে কথা বঙ্কিম সম্বন্ধে বলিলাম সেই কথাই আবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা একান্তভাবে creative artist-এর সমালোচনা। ইহা আমাদের উদ্দীপ্ত করে কিন্তু হাতে কলমে সমালোচনা করিতে শিখায় না। সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের গুরু নাই, শিষ্যও নাই। এক্ষেত্রে তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর। সে মহিমার ভাগ অন্যে পাইল না। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কথায় 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।······পাগল ছাড়া এর অনুকরণের কথা লেখক কল্পনা করে না'।

প্রমথ চৌধুরী যে রুচিবোধ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া সাহিত্য সমালোচকের কলম ধরিলেন তাহার অসাধারণত্ব স্বীকার করিয়াও বুঝিতে পারি যে এই দুই গুণ অর্জন করা নিতান্ত অসাধ্য নয়। প্রমথ চৌধুরীর রুচি মার্জিত রুচি, তাহার মন শিক্ষিত মন। তিনি বহু সাহিত্যের সমালোচনা রীতির সঙ্গে পরিচিত এবং তিনি সুবিদ্বান। অর্থাৎ সমালোচকের প্রধান গুণসমূহ তিনি যত্নে অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার style অবশ্য তাহার নিজস্ব এবং সেই কারণে অননুকরণীয়, কিন্তু তাঁহার সমালোচনা রীতি অপরকে শিখাইতে পারে। বস্তুত বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখে যখন সবুজ পত্রের

প্রকাশ আরম্ভ হয় তখন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক নতুন যুগের আরম্ভ হইল ঐতিহাসিক একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলিতে পারেন। কিন্তু সবুজ পত্রের সমালোচনা এমন এক সমালোচক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে পারে নাই যাঁহারা ইচ্ছা করিলে বাংলার সমালোচনার এক পাকা সড়ক নির্মাণ করিতে পারিতেন। ফলতঃ বাংলা সমালোচনার বিশৃঙ্খলা দূর হইল না। সর্বত্রই এক এলোমেলো ভাব এবং যেখানে বিশৃঙ্খলা সেখানে স্বৈরাচার এবং যেখানে স্বৈরাচার সেখানে নানা রীতি ও মতবাদের তাণ্ডব। সেখানে যাঁহার যাহা মুখে আসে তিনি তাহাই বলেন, বোধ হয় যাহা ঠিক মুখে আসে না একটা কিছু বলিবার আগ্রহে তাহাও বলিয়া ফেলেন। সাহিত্যের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক রুচি বোধের অভাবে তখন বহু প্রকারের অতি আধুনিক বিদেশী সাহিত্যতত্ত্ব সমালোচককে ভর করিতে আরম্ভ করে। সমালোচনার এই দুরবস্থার কথা বহু উদাহরণ দিয়া বলিতে চাহিনা। আজকাল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠককে কি সমালোচনা পড়িতে হয় তাহার একটি নিদর্শন দিতে পারি। আমরা যারা অকবি হইয়াও অল্পবিস্তর কাব্য আস্বাদন করিতে পারি বলিয়া মনে করি, আমরা যারা মাইকেল বলিতে অজ্ঞান না হইলেও কিছুটা আত্মগৌরবে অস্থির, তাহারা সুকবি, সুপণ্ডিত সমালোচকের মুখে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র কবি সম্বন্ধে শুনিবেন: 'সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাঁকে পৌছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে, যেখানে মহত্ত্ব নিতান্তই ধ'রে নেয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থা কবির পক্ষে সুখের নয় পাঠকের পক্ষে মারাত্মক।......(মেঘনাদ বধ কাব্য) দোকানের জানালার শোভা, ড্রয়িংরুমের অলংকরণ; কিন্তু অন্তপুরে অনধিকারী; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুই চারটির বেশী খুঁজে পাওয়া যায় না, যা পড়ে মনে হয় কবি শুধু নিয়ম মাফিক চলতে চাননি, কিছু বলতে চেয়েছেন।' যাঁহারা এতকাল কাব্যখানিকে তাহাদের অমার্জিত রুচির অনুরোধে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিলেন তাঁহারা এই কথা শুনিয়া সেটিকে একটি বর্ণাঢ্য টিয়া পাখী মনে করিয়া বহিবাটীর জানালায় ঝুলাইয়া রাখিবেন কিনা জানিনা। একুশ বৎসর বয়সে রচিত রবীন্দ্রনাথের মাইকেল-সমালোচনা পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক 'মেঘনাদ বধ কাব্য' খানিতে দূরে নিক্ষেপ করেন নাই। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঘাট স্বীকার করিলেন এবং সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধে মাইকেলের কাব্যখানির অপূর্বতা প্রকট করিলেন। কিন্তু আধুনিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্ত্তিত মত সম্বন্ধে বলিলেন 'রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই জানতেন না যে তার এই মন্তব্যে যথার্থ্য নেই, আছে শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি'। সমালোচক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জানিয়া শুনিয়া অযথার্থ কথা বলিবেন, চলতি মতের পুনরুক্তি করিবেন এমন অসম্ভব কথাও বলা চলে, কিন্তু মাইকেল অপাঠ্য নাও হইতে পারে একথা যেন এই সমালোচক মহাশয়ের কাছে একান্ত অবিশ্বাস্য।

অলমতি বিস্তারেণ।

অন্যদিকে বিদেশী মতবাদের তাণ্ডবও বড় কম নয়। মার্কস্‌বাদী সাহিত্য সমালোচনা যত্ন করিয়া পড়িয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না আর মার্কসবাদ সম্বন্ধে আমি একান্ত অজ্ঞ। কিন্তু উক্ত বাদ বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় কি কাণ্ড বাঁধাইয়াছে তাহা বোধ হয় একটু আধটু বুঝিয়াছি। এখানেও মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিয়া সহজে কাজ সারিতে চাই। 'সাহিত্য বীক্ষা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদ' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় বলিলেন '১৯২৯ এর পর হইতে সমাজবাদী চেতনা বাংলা দেশে বীজরূপে উপ্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বোধহয় সেই বয়সে তাহা কাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।' রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই তাহা বোধহয়

বুঝিলাম না। তবে সাধারণ রবীন্দ্রচর্চার পথে এইটুকু বুঝিয়াছি যে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য বাঙ্গালী জীবনের পূর্ণাঙ্গ মহাভারত। বাঙ্গালীর কোন সমস্যা বা তাহার অন্তর্জীবনের কোন কথা সেখানে অনুক্ত এমন জানিনা। এ একেবারে বোধহয় অন্ধ উপাসকের মত কথা বলিলাম কিন্তু অন্ধত্বের অপবাদ এড়াইবার জন্য অসত্য বলিতে চাহিনা। সাহিত্য বিচারে এই নতুন দণ্ডীদের কাব্যাদর্শ বুঝিতে হইলে বণিকের মানদণ্ড, শাসকের রাজদণ্ড প্রভৃতি বহু ব্যাপার বুঝিতে হইবে। অত বুঝিয়া অত পড়িয়া কাব্যপাঠে ও কাব্য বিচারে আমরা এখনও অনভ্যস্ত। যদি বাংলা সাহিত্যে এমন কোন মহান সমালোচকের আবির্ভাব হয় যিনি এই মার্কসীয় সাহিত্য-দৃষ্টিকে সাধারণ পাঠকের সহজ সরল সাহিত্য দৃষ্টিতে পরিণত করিতে পারেন তাহাকে আমরা অবশ্যই সাদরে অভ্যর্থনা করিব। কিন্তু এইরূপ যুগন্ধর সমালোচকের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে পারি 'রাশিয়া বা আর কোন পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেয়, লাল টুপী পড়ে বা যে কোন উগ্র সাজেই হোক তবে আমাদের দেশের স্কুল মাষ্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শ্বাশুড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শ্বাশুড়ি হয়ে উঠে নিজের বধুর 'পরে শাসন জারি ক'রে যেমন আনন্দ পান এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্কুল বয় ব'লে ভাব্‌তে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপরওয়ালা রাশিয়ান হেডমাষ্টারদের কড়া বিধান জারি ক'রে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেডমাষ্টারের গদ্‌গদ্ ভাষার অর্থ কী ও তার কারণ কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাস নেই, কেননা সেই হোলো আধুনিক কালের আপ্ত বাক্য।

অথচ বাংলা সমালোচনায় বিদেশী রীতি বা মতবাদের প্রবেশ এই প্রথম নয়। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'ভারতচন্দ্র রায় গুনাকরের জীবন বৃতান্ত' বোধহয় বাঙ্গালী কবি রচিত প্রথম বাঙ্গালী কবির আলোচনা। এ গ্রন্থে অবশ্য মতবাদের বালাই নাই। কিন্তু যে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে আমরা প্রথম মুদ্রিত বাংলা সমালোচনা গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি সেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' (১৮৫২ খৃঃ প্রকাশিত) দেখি সাহিত্যের সামাজিক পটভূমিকার সম্বন্ধে মন্তব্য রহিয়াছে। রঙ্গলাল লিখিয়াছেন 'ইউরোপীয় জ্ঞানীকর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে যে দেশ কালপাত্রভেদে কবিতা সতী ভিন্ন ভিন্ন বেশে উদিতা হইয়া থাকেন .....সুতরাং পৃথিবীর উত্তর খণ্ডস্থ কবিতার সহিত দক্ষিণ খণ্ডের কবিতার কিরূপ পার্থক্য সম্ভব, তাহা সুবোধবর্গের অবোধের বিষয় কি?' বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় দেখি এই সূত্রটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে বঙ্কিম যে *Taine* লিখিত *History* of *English of literature* ভূমিকা ও Buckle-এর *History of English civilization* দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছেন তাহা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের সমালোচনায় এই বিদেশী মত কোন রুচি বিকার বা উগ্র মৌলিকতা ঘটায় নাই। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম বলিলেন 'কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকার ভেদ, সমাজ বিপ্লবের প্রকার ভেদ, ধর্ম্ম বিপ্লবের প্রকার ভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকার ভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই নতুন মত বঙ্কিম গ্রহণ করিলেন, রামায়ণ, মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনায়, জয়দেবের কাব্য বিচারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অতি সহজভাবে ইহা প্রয়োগও করিলেন। কিন্তু নবত্বের বড়াই নাই, ফ্যাসানের দৌরাত্ম নাই। এবং কোথাও সাহিত্য সমালোচনা সমাজতত্ত্বে ডুবিয়া যায় নাই।

তবে আমাদের কালের যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা কোথায় খুঁজিব? এ বিষয়ে আমাদের দৈন্যের কথা এই সামান্য আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি। কিন্তু দৈন্য বলিতে বলিনা যে সুন্দর সমালোচনা আমাদের একেবারেই নাই। তবে হয়ত একথা বলিতে বাধ্য হইব যে যেখানে সমালোচনা সার্থক সমালোচনা হইয়া উঠিয়াছে যেখানে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, পাণ্ডিত্য আছে এমনকি রসবোধও আছে সেখানে সমালোচনা মাত্রেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয় নাই। অর্থাৎ খুব কম ক্ষেত্রেই আধুনিক বিশুদ্ধ সমালোচনা বিশুদ্ধ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। এখানে ব্যক্তি বিশেষের স্তুতিবাদ করিতে অবশ্য সঙ্কোচ বোধ করি। কোন সমালোচক খাঁটি সমালোচক এবং কোন সমালোচক আবার সমালোচনার পথে খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে বিচারের ভার লইতেও আমি অক্ষম। আর আমার সে বিচার অভ্রান্ত হইবে তাহাও মনে করিনা। তবে সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বা ভয় হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার পথে আজকাল যে রাশি রাশি গ্রন্থ লেখা হইতেছে তাহা অধিকাংশকে আমি অপাঠ্য মনে করি একথা আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি। তবে সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করি যে বাংলা সমালোচনার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে এসকল গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয় না। আবার একথাও সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপকদের পরিশ্রমেই আধুনিক বাংলা সমালোচনা টিঁকিয়া আছে। গভীর পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ন বিশ্লেষণ শক্তি, সহজ রসবোধ থাকিলে যে শ্রেণীর সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে তাহা আমাদের অধ্যাপক সমাজের কয়েকজন যে সৃষ্টি করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবে। ভাষার চারুত্বে ইহারা বোধ হয় সমভাবে বিচার্য্য নন। বলেন্দ্রনাথের বা প্রিয়নাথ সেনের একপৃষ্টা সমালোচনা পড়িয়া যে আনন্দ পাই তাহা বোধ হয় ইহারা সকলেই আমাদের দিতে পারেন না। মনে হয় এই ভাষার চারুতার অভাবেই অনেক অন্যদিক দিয়া সার্থক সমালোচনা সাধারণ পাঠক সমাজে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে চাহিদা এবং চল ছাত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই বেশী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখি সমালোচনা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও এম.এ.-এর ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী করিয়াই লিখিত হইয়া থাকে। এত কথার পর যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তাহা হইলে কাহার সমালোচনা পড়িব এবং পড়িয়া আনন্দ লাভ করিব, আমি যে কি উত্তর দিব জানিনা। আর সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত প্রচার বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের কালের কোন কোন গ্রন্থ খাঁটি সমালোচনা সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে সে বিচারের ভার আপনাদের উপর দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়া আমার এই সামান্য বক্তব্য শেষ করিলাম।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অজিত কুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে হাস্যরস বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা দরকার। মানুষ সুখে হাসে, মনে খুব আনন্দ হলেও মানুষ হাসে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু একটা মজার দৃশ্য দেখে, একটা মজার কথা শুনে কিংবা অন্য কোন কারণে কৌতুক বোধ করে যে মানুষ হাসে, তার কারণ কী? একজন মোটা লোক একটা হাল্কা চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ার ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলে, অথবা কেউ বেশ একটু নাকাল হলে সকলেই হেসে ওঠে। আবার কারুর কোনো দৈহিক বা মানসিক বিকৃতি দেখেও মানুষ হাসে, যেমন খোজা, তোৎলা, খোঁড়া বা পাগল মানুষও অনেক সময় আমাদের হাসি জোগায়। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় কথা না বলে কেউ যদি অপ্রচলিত, অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলে তাহলেও আমাদের হাসি পায়। বাংলা সাহিত্যে বাঙাল উড়ে ও বিকৃত হিন্দুস্থানী ভাষা নিয়ে অনেক রসিকতা আছে। এই হাসির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন কোন দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত বলেছেন, যে মানুষ হাসে নিজের তুলনায় অপরের কিছুটা দুর্গতি দেখে, অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা উপলব্ধি করে। এই কথাই বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন (অবশ্য অন্যের—অ.দ.) আমাদের চেতনার উপরে আঘাত করে ব'লে আমরা কিছুটা সুখ অনুভব করি," রবীন্দ্রনাথের মতে এই সুখটাই হচ্ছে কৌতুকহাস্য। তিনি বলেছেন "সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণ দুঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে।" তিনি আরও বলেছেন, "কৌতুক মনের মধ্যে আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভব ক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন, অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসর ঘরে কর্ণমর্দ্দন এবং অন্যান্য পীড়ন নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,

> তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল,
> তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল॥

কবিতাটি শুনে আমাদের হাসি পায় বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি তৃষ্ণায় এক গেলাস জলের পরিবর্তে এক ঘটি জল পেতে চায় তাকে আধখানা বেল এনে দেওয়া ঘোরতর নিপীড়ন ব'লে সকলেই স্বীকার করবেন।

ছোটখাটো অসামঞ্জস্য এবং অসঙ্গতিও অনেক সময় কৌতুকের উপাদান হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —"পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে; কারণ তাহা অনিবার্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করিনা, কারণ সে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন লোক—সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে, ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। ......অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে...অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে দুঃখ বোধ হয়।"

হাস্যরসের উপাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যগুলি অতি প্রাঞ্জল ও সুন্দর হ'লেও এরূপ সংজ্ঞা নির্ণয়ে বোধহয় কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। কারণ ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ, অর্থসঙ্গতিহীন কথা, ভাঁড়ামি, কৌতুক, ব্যঙ্গ, তামাসা, রসিকতা অনেক কিছুই আমাদের হাসি উৎপাদন করে বটে। কিন্তু সব হাসিই

তবে আমাদের কালের যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা কোথায় খুঁজিব? এ বিষয়ে আমাদের দৈন্যের কথা এই সামান্য আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি। কিন্তু দৈন্য বলিতে বলিনা যে সুন্দর সমালোচনা আমাদের একেবারেই নাই। তবে হয়ত একথা বলিতে বাধ্য হইব যে যেখানে সমালোচনা সার্থক সমালোচনা হইয়া উঠিয়াছে যেখানে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, পাণ্ডিত্য আছে এমনকি রসবোধও আছে সেখানে সমালোচনা মাত্রেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয় নাই। অর্থাৎ খুব কম ক্ষেত্রেই আধুনিক বিশুদ্ধ সমালোচনা বিশুদ্ধ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। এখানে ব্যক্তি বিশেষের স্তুতিবাদ করিতে অবশ্য সঙ্কোচ বোধ করি। কোন সমালোচক খাঁটি সমালোচক এবং কোন সমালোচক আবার সমালোচনার পথে খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে বিচারের ভার লইতেও আমি অক্ষম। আর আমার সে বিচার অভ্রান্ত হইবে তাহাও মনে করিনা। তবে সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বা ভয় হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার পথে আজকাল যে রাশি রাশি গ্রন্থ লেখা হইতেছে তাহা অধিকাংশকে আমি অপাঠ্য মনে করি একথা আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি। তবে সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করি যে বাংলা সমালোচনার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে এসকল গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয় না। আবার একথাও সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপকদের পরিশ্রমেই আধুনিক বাংলা সমালোচনা টিঁকিয়া আছে। গভীর পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, সহজ রসবোধ থাকিলে যে শ্রেণীর সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে তাহা আমাদের অধ্যাপক সমাজের কয়েকজন যে সৃষ্টি করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবে। ভাষার চারুত্বে ইহারা বোধ হয় সমভাবে বিচার্য্য নন। বলেন্দ্রনাথের বা প্রিয়নাথ সেনের একপৃষ্ঠা সমালোচনা পড়িয়া যে আনন্দ পাই তাহা বোধ হয় ইহারা সকলেই আমাদের দিতে পারেন না। মনে হয় এই ভাষার চারুতার অভাবেই অনেক অন্যদিক দিয়া সার্থক সমালোচনা সাধারণ পাঠক সমাজে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে চাহিদা এবং চল ছাত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই বেশী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখি সমালোচনা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও এম.এ.-এর ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী করিয়াই লিখিত হইয়া থাকে। এত কথার পর যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তাহা হইলে কাহার সমালোচনা পড়িব এবং পড়িয়া আনন্দ লাভ করিব, আমি যে কি উত্তর দিব জানিনা। আর সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত প্রচার বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের কালের কোন কোন গ্রন্থ খাঁটি সমালোচনা সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে সে বিচারের ভার আপনাদের উপর দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়া আমার এই সামান্য বক্তব্য শেষ করিলাম।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অজিত কুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে হাস্যরস বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা দরকার। মানুষ সুখে হাসে, মনে খুব আনন্দ হলেও মানুষ হাসে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু একটা মজার দৃশ্য দেখে, একটা মজার কথা শুনে কিংবা অন্য কোন কারণে কৌতুক বোধ করে যে মানুষ হাসে, তার কারণ কী? একজন মোটা লোক একটা হাল্কা চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ার ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলে, অথবা কেউ বেশ একটু নাকাল হলে সকলেই হেসে ওঠে। আবার কারুর কোনো দৈহিক বা মানসিক বিকৃতি দেখেও মানুষ হাসে, যেমন খোজা, তোৎলা, খোঁড়া বা পাগল মানুষও অনেক সময় আমাদের হাসি জোগায়। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় কথা না বলে কেউ যদি অপ্রচলিত, অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলে তাহলেও আমাদের হাসি পায়। বাংলা সাহিত্যে বাঙাল উড়ে ও বিকৃত হিন্দুস্থানী ভাষা নিয়ে অনেক রসিকতা আছে। এই হাসির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন কোন দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত বলেছেন, যে মানুষ হাসে নিজের তুলনায় অপরের কিছুটা দুর্গতি দেখে, অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা উপলব্ধি করে। এই কথাই বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন (অবশ্য অন্যের—অ.দ.) আমাদের চেতনার উপরে আঘাত করে ব'লে আমরা কিছুটা সুখ অনুভব করি," রবীন্দ্রনাথের মতে এই সুখটাই হচ্ছে কৌতুকহাস্য। তিনি বলেছেন "সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণ দুঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে।" তিনি আরও বলেছেন, "কৌতুক মনের মধ্যে আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভব ক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন, অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসর ঘরে কর্ণমর্দ্দন এবং অন্যান্য পীড়ন নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,

> তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল,
> তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল॥

কবিতাটি শুনে আমাদের হাসি পায় বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি তৃষ্ণায় এক গেলাস জলের পরিবর্তে এক ঘটি জল পেতে চায় তাকে আধখানা বেল এনে দেওয়া ঘোরতর নিপীড়ন ব'লে সকলেই স্বীকার করবেন।

ছোটখাটো অসামঞ্জস্য এবং অসঙ্গতিও অনেক সময় কৌতুকের উপাদান হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —"পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে; কারণ তাহা অনিবার্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করিনা, কারণ সে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন লোক—সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে, ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। ……অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে…অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে দুঃখ বোধ হয়।"

হাস্যরসের উপাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যগুলি অতি প্রাঞ্জল ও সুন্দর হ'লেও এরূপ সংজ্ঞা নির্ণয়ে বোধহয় কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। কারণ ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ, অর্থসঙ্গতিহীন কথা, ভাঁড়ামি, কৌতুক, ব্যঙ্গ, তামাসা, রসিকতা অনেক কিছুই আমাদের হাসি উৎপাদন করে বটে। কিন্তু সব হাসিই

এক জাতের নয়। বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গে অনেক সময় আমাদের হাসি পেলেও তাকে ইংরেজীতে যাকে humour বলে এবং বর্তমান কালে হাস্যরস বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক সেই শ্রেণীভুক্ত করা চলেনা। Voltaire, Anatole France বা Bernard Shaw বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেও তাঁদের হাস্যরসিক লেখক বলে অভিহিত করা শক্ত। কারণ Satire জাতীয় রচনা বিদ্রূপ প্রসূত না হ'য়ে পারে না, এবং তার আঘাত অতি প্রচণ্ড। তবে এ বিদ্বেষ ব্যক্তিগত নয়; কোন প্রথা, মত, মনুষ্য সমাজ, এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রিক আইন কানুনকে লক্ষ্য করেই সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর Satire বা বিদ্রূপাত্মক রচনা তৈরি হয়। ব্যঙ্গ—বিদ্রূপের সার্থক রচয়িতা হাস্যরসের সাহায্য নেন, কিন্তু কখনো আঘাত করতে বিরত হন না। এ যেন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুনের বাণ নিক্ষেপ তাই Ronald knox বলেছেন, "Satire borrows its weapons from the humourists. Yet the laughter which Satire provokes has malice in it always!" বস্তুতঃ, বিদ্রূপাত্মক রচনায় হাস্যরস বা humour অপেক্ষা Wit বা রসিকতার ব্যবহারই বেশী প্রয়োজন হয়। ইংরেজী Wit শব্দটির মৌলিক অর্থ বুদ্ধি। সাহিত্যে এই শব্দটির ব্যবহার তখনই হয় যখন রচয়িতা বিভিন্ন জাগতিক বিষয় বা বস্তুর মধ্যে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর অথচ বুদ্ধির আনন্দ—বিধায়ক কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে Wit শব্দটির ব্যবহার মাত্র সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত হয়েছে। সেখানে Davenport এবং Hobbes থেকে Pope ও Addison প্রমুখ লেখকেরা খাঁটি Wit এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। আমাদের সাহিত্যে এই Wit, রসিকতা বা বুদ্ধিগ্রাহ্য চমকপ্রদ সাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যের পূর্বে বিশেষ দেখা যায়নি। হাস্যরস যেমন সর্বসাধারণের উপভোগ্য Wit তা নয়; Wit-এর আবেদন প্রধানত শিক্ষিত সংস্কৃতি পরায়ণ লোকের কাছে। Wit এবং humour এর পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে একজন সমালোচক অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বলেছেন "Wit is of the mind, neat, nice, intellectual, sharp and gay ; humour is of the body ; loose, broad, emotional, cheerful and jolly." (অর্থাৎ Wit হচ্ছে মনের—তা হচ্ছে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, বুদ্ধি গ্রাহ্য, তীক্ষ্ণ এবং আনন্দময়, আর humour বা খাঁটি হাস্যরস হচ্ছে শরীরের—তা শিথিল, স্থূল, আবেগময়, আর ফুর্তিতে ভরপুর।) বস্তুতঃ হাস্যরসের প্রধান কথাই হল এই যে তা আমাদের আবেগকে আন্দোলিত করে, বুদ্ধি কে নয়। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "উহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমনকি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই।...সুখে আমরা স্মিত হাস্য করি, কৌতুকে আমরা উচ্চ হাস্য হাসিয়া উঠি।" এই উচ্চ হাস্যেই হাস্যরসের প্রকৃত পরিচয়, Satire বা Wits জাতীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য হাসি মৃদুহাস্য মাত্র।

প্রাচীন পণ্ডিতদের অনেকে মনে করতেন যে হাস্যরস কাউকে না কাউকে কিছু না কিছু পরিমাণে আঘাত দেয়। তাই প্লেটো বলেছেন যে কমেডিতে কেউ দুঃখ ও কেউ আনন্দ পায়। আরিস্টটল বলেছিলেন যে, কোনোরূপ বিকৃতি বা কুশ্রীতা—যা বেদনাদায়ক নয়, তাই হাসি উৎপাদন করে। এ কথা মানলে ধরে নিতে হয় যে এমন কাউকে লক্ষ্য করে আমাদের হাসি আসে যে আমাদের চেয়ে কোনো না কোনো বিষয়ে হীন বা নিকৃষ্ট। Hobbes এই কথাটাকেই আর একটু সংশোধিত করে বলেছেন যে হঠাৎ নিজের মহিমা উপলব্ধি করে মানুষ হাসে। "Sudden glory is the passion which maketh those, grimaces called laughter." কথাটির তাৎপর্য এই যে যখন সহসা এমন কিছু ঘটে যাতে আমরা উপলব্ধি করি যে আমার তুলনায় অপরে কিছুটা নিকৃষ্ট, অথবা কোনো ব্যাপারে অন্য কেউ যখন কিছুটা জব্দ হয়, কিন্তু আমরা হই না, তখনই আমাদের হাসি আসে। পরবর্তী অনেক দার্শনিক, যথা দেকার্তে, লামাই (Lammais), মেরেডিথ, গ্রুস ও বার্গস্ প্রভৃতি, মোটামুটি ভাবে এই মত সমর্থন করেছেন। কাউকে ঠাট্টা করলে কিংবা কেউ নাকাল হলে, যে সকলেই হেসে উঠি তাতেই এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু

তবু এইরূপ আত্মমহিমা উপলব্ধিকেই হাস্যরসের একমাত্র উপাদান বলে মেনে নেওয়া শক্ত। ঠাট্টা পরিহাস ছাড়াও হাস্যরস উৎপন্ন হতে পারে, অতএব হাস্যরসের আরো ব্যাপক সংজ্ঞা প্রয়োজন। সেইজন্য volataire স্বয়ং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের রাজা হয়েও বলেছেন যে "Laughter always arises from a gaiety of disposition, absolutely incompatiable with contempt and indignation." Kant বলেছেন যে আমাদের হাসি আসে "from the sudden transformation of a strained expectation into nothing", শুধুমাত্র আমাদের স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তিতে নয়। বস্তুতঃ প্রকৃত হাস্যরসে কোনো খোঁচা বা আঘাত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, আর যদিও তা থাকে, তবে হাস্যরসিককে স্বয়ং সে খোঁচার কিছুটা ভাগ নেওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন তাই ঈশ্বরগুপ্তের রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত।...হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা বিদ্বেষপূর্ণ, ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গে লেশমাত্র বিদ্বেষ নাই"।

উপরে হাস্যরস সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হল, তা দ্বারা বোঝা যাবে যে হাস্যরস নানাবিধ উপকরণ থেকে তৈরি হতে পারে, এবং নানা ধরণের হতে পারে। ঠাট্টা বিদ্রূপ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুক, রসিকতা, আবোল তাবোল, হাস্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে এসবই আলোচনা করা প্রয়োজন হলেও, বিশুদ্ধ হাস্যরস তাকেই বলা চলে যা অসূয়া ও বিদ্বেষবর্জিত, যার মধ্যে অশ্লীলতা বা ইতরতা নেই, যা পরিচ্ছন্ন, এবং যেখানে হাসির বিষয়টিও হাস্যরসিকের সহানুভূতি বঞ্চিত নয়। বস্তত মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঞ্ছনায় সহানুভূতি সম্পন্ন না হলে খাঁটি হাস্যরসিক হওয়া যায় না। এ বিষয়ে Thackeray-র উক্তি স্মরণীয়, "A literary man of the humouristic turn is pretty sure to be of philanthropic nature; to have a great sensibility to be easily moved to pain or pleasure, keenly to appreciate the varieties of temper of people round about him and sympathise in their laughter, love, amusement, tears...the best humour is that which is flavoured throughout with tenderness and kindness." উপরের আলোচনায় যাকে খাঁটি হাস্যরস বলে বর্ণনা করা হল আমাদের বর্তমান আলোচনা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে ইদানীন্তন কাল পর্যন্ত রচিত সকল প্রকার হাসির রচনা নিয়েই আমি আলোচনা করবো।

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সহিত্যে এমন কোন সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায় না, যাঁকে প্রধানতঃ হাস্যরসিক লেখক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এমন কোনো রচনাও পাওয়া যায় না যা পুরোপুরি হাস্য-রসাশ্রিত। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের এই বিরলতার দরুণ বাঙালী হাসতে জানে না এই অপবাদ প্রচলিত হয়েছে। বাঙালী-জাতি সম্বন্ধে এ নিন্দা প্রযোজ্য কিনা সুধীজনের বিচার্য, তবে এ কথা মানতে হবে যে বাংলা সাহিত্যে কান্নার যত ছড়াছড়ি হাসি তার শতাংশও নেই। যাই হোক, মধ্যযুগের সাহিত্যে হাস্যরস কয়েকটি বাঁধাধরা বিষয়কে অবলম্বন করেই পরিবেশন করা হোত। যথা; ভোজন, বাসর ঘরে নারীগণের হাস্যপরিহাস, বাঙাল কথা, ইত্যাদি। তবে কোনো কোনো প্রতিভাশালী কবির রচনায় হাস্যরসের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন মেলে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে দেখতে পাই দেবী চণ্ডী কালকেতুকে একটা পুরাতন কূপে সাত ঘরা ধনের সন্ধান দিয়েছেন। এই সাত ঘড়ার মধ্যে চার ঘড়া কালকেতু ঘরে তুলে এনেছে, বাকী তিন ঘড়া সে আর সঙ্গে নিতে পারছে না। তার অসুবিধা দেখে দেবী নিজেই একঘড়া কাঁখে তুলে নিয়ে কালকেতুর পিছে পিছে চললেন। কিন্তু কালকেতুর মনে শান্তি নেই।

"মনে মনে কালকেতু করিল যুকতি।
ধন ঘড়া লৈয়া পাছে পালায় পার্বতী॥"

এ ভিন্ন কবিকঙ্কণের মুরারি শীল হাস্যরসের একটি মূর্তিমান উদাহরণ। দেবী চণ্ডীর কাছ থেকে মূল্যবান অঙ্গুরী পেয়ে কালকেতু সেটি ভাঙাতে মুরারি শীলের বাড়ি গেছে। মুরারী ধনী বেণে হলেও কৃপণের একশেষ, গিন্নিটিও তথৈবচ। কালকেতুর কাছ থেকে ধারে এরা মাংস কিনেছে, এখনো দাম দেয়নি। তাই কালকেতুর সাড়া পেয়েই মুরারি শীল ঘরে লুকিয়েছে, আর গিন্নি এসে বলছে, কর্তা তো বাড়ি নেই, কাল

এসো টাকা পাবে। কালকেতু বলল, "আচ্ছা নমস্কার।" কালই টাকা দেবেন। তবে আমার একটা আংটি বিক্রি করার ছিল, তাই এসেছিলাম। মুরারি শীল লুকিয়ে সবই শুনছে। শুনেই সে ভাব্‌ল, আংটি ভাঙালে তো কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে। অমনি খিড়কির দরজা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে,

"বান্যা বলে ভাইপোত্র ইবে নাহি দেখি তোত্র
এ তোর কেমন ব্যবহার।"

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় উপখ্যানে ধনপতির দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা। সেখানে দেখি, স্বামীর ভালোবাসা বেশী পাবার জন্য লহনা নানা রকম বশীকরণ ঔষধের ব্যবস্থা করেছে। কবিকঙ্কণ এই সব ঔষধের একটি পুর্ণ তালিকা দিয়েছেন। এখন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীরও দুই স্ত্রী ছিল, এবং দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার করার অভিজ্ঞতাও তাঁর কম ছিল না। তাই, ঔষধের তালিকাটি বিবৃত করে মুকুন্দরাম লিখ্‌ছেন,

"ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ,
বুড়াকে না করে গুণ এসব ঔষধ।"

বাঙাল নিয়ে ঠাট্টা করতেও মুকুন্দরাম ছাড়েন নি। ধনপতির নৌকা যখন ঝড়ে পড়েছে—তখন, "কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।"

মধ্যযুগের অবসান কালে সে কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হাস্যরস পরিবেশনে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে ভারতচন্দ্রের যুগ অবিশ্বাসের যুগ, শ্রদ্ধাহীণতার যুগ। তাই ভারতচন্দ্রের হাস্যরস ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি প্রধান, অনেক সময় তা বুদ্ধি গ্রাহ্য, Wit শ্রেণীর। অন্নদার সরতী বেশে ব্যাস ছলনার কাহিনী বর্ণনায়, হীরা মালিণীর চরিত্রে ও তার কার্যকলাপে যথেষ্ট হাসির খোরাক আছে। সুন্দরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মালিণী বাজার করে এনে তার হিসাব দিচ্ছে :

"পাছে বল, বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
কটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি টেঁাটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু' কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥" ইত্যাদি

ভূমিকার পর চার আনার জিনিসে এক টাকার হিসাব দিয়ে মালিণী বলছে :

"লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী ঘায়াইল কড়ি॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥

ভারতচন্দ্রের রচনায় wit জাতীয় রসিকতার প্রাধান্য হেতু তাঁর রচিত অনেক পংক্তি epigram বা প্রবাদ রূপে প্রচলিত হয়েছে। যেমন,

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"
"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"
"আছিল বিস্তর রস প্রথম বয়সে
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।"
"যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে॥"
ইত্যাদি।

এ ছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্য হাস্যরসের কিছু কিছু উদাহরণ মেলে। শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালদের খেপিয়ে আমোদ পেতেন, সহপাঠী বন্ধু বান্ধবও তাঁর পরিহাস থেকে রেহাই পেতেন না। এ সব বর্ণনা চৈতন্য জীবনী কারেরা লিপিবদ্ধ করেছেন। ভোজন নিয়েও মধ্যযুগের সাহিত্যে কিছু কিছু হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের-রামপ্রসাদের পর ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত যাঁরা প্রধানতঃ বাংলা কবিতার আসর দখল করেছিলেন, তারা কবিওয়ালা। এঁরা মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে গান করতেন এবং খেউড় অংশে চাপান ও উতোর এর মধ্য দিয়ে পরস্পরকে বাক্‌যুদ্ধে জব্দ করবার চেষ্টা করতেন। এই ছন্দোবদ্ধে উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যে অনেকটাই অবশ্য গালাগালি, কিন্তু এতে যথেষ্ট ready wit বা উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন হোত, এবং খুব পরিচ্ছন্ন না হলেও একজাতের হাস্যরসও তার মধ্যে থাক্‌তো। যেমন কবিওয়ালা ঠাকুর দাস সিং একবার কবিওয়ালা এণ্টনি ফিরিঙ্গিকে বলেছিলেন,

"শোন হে এণ্টুনি, আমি একটি কথা জানতে চাই

এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই?" এণ্টুনি তৎক্ষণাৎ এর জবাব দিলেন,

"এসে বাঙ্গালায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুরে সিংএর বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥"

কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুর তাঁর বড় ভাই নীলু ঠাকুরের দলে ছিলেন এবং নীলুর সঙ্গে কবি-গান গাইতেন। নীলুর মৃত্যুর পর রামপ্রসাদই কবির দলটি রেখেছিলেন। একবার রাম বসুর সঙ্গে রামপ্রসাদের কবির লড়াইয়ে রামপ্রসাদকে গান দিয়ে বলেন,

"নেইকো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরষ।"

এর জবাবে রাম বসু বলেন,

"এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ এক্‌টীন।
যেমন ঢাকের পীটে বাঁয়া থাকে বাজে নাকো একটি দিন॥
কর্মে অকর্মা ঐ রামপ্রসাদ শর্মা......
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্মা
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন॥"

এ যুগের লৌকিক গান ও কবিতায় আরও কিছু কিছু কৌতুকের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন পল্লী-কবি : 'নাড়া" রামানন্দের গান :

'মা মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই।
উঠি অতি নিশি ভোরে হুঁকাটি লইয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।
কয়্যা যাব তনয়েরে মৈলে যখন শ্রাদ্ধ করে
কুশ পট্যো টৈন্যা ফেল্যা কোঁচড়ে তামাকু গুড় দিয়া
পিণ্ডি দেয় তাই।"

দ্বিজে রামানন্দে ভনে স্থান দিও শ্রীচরণে
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা যাই॥

এরপর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসিক হিসাবে আমরা পাই ঈশ্বরগুপ্তকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন, "নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।......এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্বনে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও। তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। মুল কথা ঈশ্বর গুপ্ত realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়........ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নাই।"

ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টিই ছিল কৌতুক সন্ধানী। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।" নীলকরদের প্রসঙ্গে মহারাণীর ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে লেখা গানটি ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ :—

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বেকানো,
কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস॥
যেন রাঙা আম্‌লা তুলে মাম্‌লা,
গাম্‌লা ভাঙে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি
ঘুসি খেলে বাঁচবো না॥"

আহার্য দ্রব্য নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাসের কোনো অন্ত নেই। পাঁঠা সম্বন্ধে তাঁর কবিতায় তিনি বলেছেন—

"মহাদাতা অহা তোর কি গাহিব মন।
যত চুষি তত খুশী হাড়ে হাড়ে রস॥
সাধ্যকার এক মুখে মাহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়কাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাং।
মেমময় বাদ্য হয় ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং॥
এমন পাঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
একা সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা॥

এছাড়া এণ্ডাওয়ালা তোপসে মাছ, যার
কষিত-কনক কান্তি কমনীয় কায়।
গাল ভরা গোঁপ দাঁড়ি তপস্বীর প্রায়॥

অথবা, পৌষ পার্বনের পিঠে-যাতে
লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে গুলি ফোটে॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুষি।
গৃহিণীর অনুরাগে শুদ্ধ তাই চুষি॥

কিংবা আনারস যার—
ফেলিয়া পোনের আনা এক আনা রাখে,
এই হেতু আনা রস লোকে বলে তাকে।

অরসিকে নাহি করে রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোলআনা না জানে বিশেষ॥"

এইসব কবিতা শোনাতে গিয়ে একটা কথা মনে হচ্ছে ...সেটা এই যে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন বাংলা সাহিত্যের হাস্তরসাত্মক রচনার একটা বড় অংশই খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। চৈতন্য ভাগবত থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আমসত্ব দুধে ফেলি ইত্যাদি), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায় (খাই খাই), রাজশেখর বসু এঁরা কেউই খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়েন নি।

ঈশ্বর গুপ্তের পরে বাংলায় নবযুগের সূচনায় বাংলা সাহিত্য ত্রিধা বিভক্তি হয়ে যায়—এই তিন ভাগ হচ্ছে গদ্য, পদ্য আর নাটক। গদ্য সাহিত্যের সূচনা থেকেই বাংলায় হাস্তরসাত্মক রচনার আবির্ভাব হতে থাকে। তখন একদিকে লোকে সামাজিক নানাপ্রকার গলদ সম্বন্ধে সচেতন হতে আরম্ভ করে এবং অন্যদিকে নব্য বাবুদের সাহেবীর নকল ও উচ্ছৃঙ্খলতা বাঙালী লেখকদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। কলিকাতা কমলালয়, নব বাবু বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৪৮) তাঁর বাবুর উপখ্যানে—বাবুর এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

"সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন। বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ এই সকল দাতারের নৃত্য কিনা বিবেচনা করিবেন। এর পর গদ্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য হাস্তরসিক আমরা আলালের ঘরের দুলাল রচয়িতা টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রকে পাই (১৮১৪—১৮৮৩) টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল", মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায় প্রভৃতি নক্সাগুলি ব্যঙ্গ জাতীয় হাস্তরসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "আলালের ঘরের দুলালের" অবিস্মরণীয় চরিত্র "ঠক্‌চাচা" মুকুন্দরামের "ভাঁড়ু দত্ত" ও "মুরারি শীল", ভারতচন্দ্রের "হীরা মালিনী" প্রভৃতি চরিত্রের সগোত্র।

এরপর উল্লেখযোগ্য হাস্তরসাত্মক রচনা "হুঁতোম প্যাচার নক্সা"। খাঁটি কলকাতিয়া ভাষায় লেখা কালীপ্রসন্ন সিংহের এই ব্যঙ্গাত্মক রচনাটিতে তৎকালীন কলকাতিয়া সমাজের অনেক চিত্র ও সরস বর্ণনা আছে, যদিও এর ভাষা মার্জিত নয়, এবং এতে কোনো কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের প্রতি কটাক্ষ প্রায় ইতরতার স্তরে নেমে এসেছে। হুঁতোমের রচনার একটু পরিচয় দিই :—"প্রেমানন্দ গাড়ীতে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু এখনোও পদার্পণ করতে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে গাড়ীর পেনালের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটির এম্‌নি ঠেস্ মেরে গেছে যে গাড়ীতে প্রবেশ করে পর্য্যন্ত শূণ্যেই রয়েছেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড়্ চড়্ কল্লে এক একবার কারু কাঁধ ও কারুর মাথার উপর অবলম্বন কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু ওতে সাব্যস্ত হয়ে উঠছে না।"

সে যুগে হাস্তরসের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল প্রহসনে। নাটক সে কালের নতুন জিনিস এবং গোড়ার দিকে প্রহসনই ছিল নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ। গদ্য সাহিত্যের মত নাটকেও নক্সা জাতীয় জিনিসই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তৎকালীন নানা কুপ্রথায় আর নব্য বঙ্গীয় বাবুদের হালচাল বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছিল। কিন্তু তখনও—অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব পর্য্যন্ত—বাঙ্গালীর চিন্তা ও ভাব কোনো গভীরতা বা স্থৈর্য্য লাভ করেনি, এক কথায় দানা বাঁধেনি! এই জন্য গদ্য পদ্য প্রহসন সর্বত্রই সাহিত্য ছিল। বিদ্রূপাত্মক ও বর্ণনাবহুল—অর্থাৎ নক্সা জাতীয়। এর পরিচয় আমরা পাই গদ্যে ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুঁতোমের রচনায়, কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখায়, এবং বহু প্রহসনে। প্রহসনে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দেখান রামনারায়ন তর্করত্ন, ইনি নাটুকে রামনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তখনকার নাটকে প্রহসনে সমিল পদ্য যথেষ্ট ব্যবহৃত হত। রামনারায়ণের কুলীন

কুলসর্বস্ব নামে নাটকের থেকে বিবিধ প্রকার ফলারের একটি পদ্য বর্ণনা শোনাচ্ছি :—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাক ভাজা, মতিচূড় বুঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই॥
নিখুঁতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেকরকম মণ্ডা যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই, তত হয় তোলা॥
খুরি ভরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাস হাতে, দক্ষিণা পায়ের সাথে,
উত্তম ফলার তারে কই॥
সরু চিঁড়ে শুকো দই মর্তমান ফাকা খৈ,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণ কবে
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥
গুমো চিঁড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই,
পেটভরা যদি নাহি হয়।
রোদ্দুরেতে মাথা কাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তারে কয়॥"

এর পর প্রহসন রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসন দু'টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন রূপে গণ্য হয়ে থাকে। মাইকেল ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার নীলদর্পন রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রহসন গুলিতে যে হাস্তরস পরিবেশন করেছেন, তার তুলনা বাংলাসাহিত্যে অল্পই মেলে। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" "বিয়ে পাগলা বুড়ো," "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসনগুলি অপরিমিত হাস্তরসে ভরা। সধবার একাদশীতে অটল বলছে :

"অটল। আমি মেঘনাদ বধ কিনেছি। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভালোমন্দ তুমি বুঝবে কি? তুমি পড়েছ দাতা কর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুর্দ্দাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মাণিক"

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল ও দীনবন্ধু সার্থক ও কৌতুকময় প্রহসনের যে ধারাটি প্রবর্তন করেছিলেন, সেটি আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কিঞ্চিৎ জলযোগ," "এমন কর্ম্ম আর করবোনা," "অলীকবাবু" প্রভৃতি অমৃতলাল বসুর "চোরের উপর বাটপাড়ি," "ডিস্‌গিস" "চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে," "তাজ্জব ব্যাপার" প্রভৃতি প্রহসনগুলি হাস্তরসে একেবারে ভরপুর। এরপর এই ধারাটি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (কাজের খতম, চাবুক, ঘুঘু), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কল্কি অবতার, বিরহ, পুনর্জন্ম) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ (গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা) পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু গদ্যে হাস্তরসের পরিচয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাতেও পাওয়া যায়। অনেকেই বোধহয় জানেননা যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেনামীতে পাঁচখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এগুলির নাম "অতি অল্প হইল", "আবার অতি অল্প হইল," "ব্রজবিলাস," "বিনয় পত্রিকা" ও "রত্ন পরীক্ষা"। সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার দরুণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর নানাদিক থেকে যে আক্রমণ এসেছিল, এই বইগুলি তার উত্তর। এগুলিতে বিদ্যাসাগরের পরিহাসপ্রিয়তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে গদ্যে পদ্যে ব্যঙ্গাত্মক রসরচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ইনি গদ্যে "কল্পতরু" ও "ক্ষুদিরাম" নামে নক্সা জাতীয় দুইটি উপন্যাস ও পঞ্চানন্দ নামে ধারাবাহিকভাবে বহু গদ্য রচনা লিখিয়াছিলেন। এর কল্পতরুর সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গলায় প্রধান লেখকদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। রহস্য পটুতায়,—মানুষ চরিত্রের বহুদর্শিতায়—লিপি চাতুর্যে, ইনি টেঁকচাদ ঠাকুর ও হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম

ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, স্থনীতির শক্র এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, স্থনীতির প্রতিপোষক, এবং স্থরুচির বিরোধী নহেন"। পঞ্চানন্দ—যা "পাঁচুঠাকুর" নামে পাঁচখণ্ডে ইন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার থেকে একটু নমুনা শোনাই :—"লেজ! লেজ!! লেজ!!! অতি উৎকৃষ্ট, স্থগোল, স্থদীর্ঘ, স্থগঠন, বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতী কারিকরের তৈয়ারী এবং জাহাজে করিয়া খাস চালান আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে, সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেরাই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি স্থলভ, কিন্তু কেবল রোজগারের পক্ষে।"

পদ্যে ঈশ্বরগুপ্তের পরে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্যরসাত্মক কবিতার ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। 'বাজিমাৎ', 'হায় কি হলো', 'হুতোম প্যাচার গান' (এ কবিতাটিতে হেমচন্দ্র তখনকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন), 'নাকে খৎ', প্রভৃতি কবিতায় হেমচন্দ্রের হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'হুতোম প্যাচার গান' থেকে তখনকার কলকাতা শহর সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি শোনাচ্ছি :

"যার রাস্তা ঘরে সহর ফুঁড়ে কলের পাণি ছোটে,
যার দুধের কেঁড়েয় খাঁটি পাণি তিনপো ছেড়ে ওঠে।
যার দেশের ছেলে মিথ্যাবাদী সাহেব রাজাই সাঁচা,
যার লম্বাটে গোফ চেহারাটা ফজলি আমের চাঁচা;
আহা ভাগীরথীর দুকূলঘেড়া রূপের ছটা যার,
কলির সহর কলকাতা তোর পায়ে নমস্কার।"

ইলবার্ট বিল উপলক্ষে হেমচন্দ্রের 'নেভার নেভার' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্,
ডাক ছাড়ে ব্রানশন্ কেশুয়িক মিলার—
"নেটিবের কাছে খাতা, নেভার নেভার!"
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা"?
বিবিজান্! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না॥"

হেমচন্দ্রের পর কবিতায় হাস্যরসের দৃষ্টান্ত হিসেবে আবার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি গদ্যে যেরূপ ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখেছিলেন, কাব্যেও সেই জাতীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এঁর "ভারত উদ্ধার কাব্য ব্যঙ্গ কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর নায়ক বিপিনকৃষ্ণ···"সত্বর যাহাতে

পরাস্তি ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে হয় ভারত উদ্ধার"...তার উপায়

হিসাবে স্থির করেছে যে লঙ্কার স্তূপে আগুণ জ্বালিয়ে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে, পিচকিরি দ্বারা নূন গোলা জল শত্রুদের চোখে ছিটিয়ে আর ব'টি সম্বল করে যুদ্ধ ক'রে ইংরেজ তাড়াবে। যুদ্ধের সব ব্যবস্থা ক'রে বিপিনকৃষ্ণ তার স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে কেঁদে বলল যে দেশ উদ্ধারের জন্য সে যুদ্ধে যাচ্ছে। পত্নী বললেন :

"বলি প্রাণনাথ,
দেশ তো দেশেই আছে, কি তার উদ্ধার?"

যুদ্ধের কথা সব বুঝিয়ে বলার পর স্ত্রী কিছুতেই যুদ্ধে দিতে রাজি হয় না, শেষে অনেক কথার পর রাজি হয়ে বল্লে :

"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া
খাইয়া যহিবে যুদ্ধে।"

এই সময়ের হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনার নিদর্শন হিসাবে আর একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ প্রয়োজন—সেটি যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর "মডেল ভগিনী।" এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্যসের যে সব পরিচয় পাই তা প্রায় সবই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক। কবিওয়ালাদের খেউড়ে, ঈশ্বর গুপ্ত ও হেমচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের রচনায়, ও বহু প্রহসনে। ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হুতোম, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায়, এতকাল পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ছিল হাস্য রসের একমাত্র উপকরণ। ব্যক্তিগত ও সমাজগত আচার ব্যবহারের আক্রমণই প্রধানতঃ ব্যঙ্গের বিষয় ছিল। এসব রচনার রুচিও যে সব সময়ই খুব উন্নত ছিল এমন বলা যায় না। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই আমরা প্রকৃত নির্মল, বিদ্বেষ-

বর্জিত, সর্বজনের উপভোগ্য বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিচয় পেলাম। তাঁর "লোকরহস্য" "কমলাকান্তের দপ্তর", "মুচিরাম ভড়ের জীবন চরিত" বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের যেন এক নতুন রূপ উৎঘাটন করল। এই সব লঘু গ্রন্থে হাস্য পরিহাসে অনেক স্থলে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অনেক ব্যঙ্গ আছে বটে কিন্তু তার মধ্যে কোনো অসূয়ার জ্বালা নাই, কোনো আঘাত দেবার চেষ্টাও নাই। যেটুকু বা আঘাত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁর পাঠকদের সঙ্গে নিজেও তা ভাগ ক'রে নিয়েছেন। লোক রহস্যের দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন, স্থবর্ণ গোলক, বর্ষ সমালোচন, হনুমদ্বাবু সংবাদ, গ্রাম্য কথা প্রভৃতির মধ্যে বিদ্রূপ যদিও থাকে, বঙ্কিমের রচনা-গুণে তা নির্দোষ কৌতুকে পরিণত হয়েছে। লোক রহস্য থেকে একটু শোনাই : "কাদম্বিনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসী-কক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধীত শাস্ত্র সেই বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ছেলে। বলি, মা!

কাদম্বিনী। কেন বাছা! আহা, ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কান জুড়ায়।

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটা পয়সা দে না মা।

কাদ। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথায় পাব, বাবা?

ছেলে। দিবিনে বেটি? মুখ পুড়ি। হতভাগি! আঁটকুড়ি।

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে!

ছেলে। দিবিনে বেটি! (ইতি প্রহার ও কলসী ধ্বংস) (পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)

বাপ। একি, রে বাঁদর?

ছেলে। কেন বাবা, এ যে আমার মা! মার সঙ্গে যেমন করি ওর সঙ্গেও তেমন করেছি—"মাতৃবৎ পরদারেষু।" "কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলিনে?" বঙ্কিমের কমলাকান্ত চরিত্রে একদিকে আদর্শবাদী অন্যদিকে স্বদেশ প্রেমিক, বুদ্ধিমান, দরদী, কল্পনাবিলাসী অন্যদিকে কৌতুক প্রিয়, হাস্যরসিক যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই বাংলা সাহিত্যে তা অদ্বিতীয়। কমলাকান্তের দপ্তরে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের সকল গুণ বর্তমান, সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যঙ্গ ও কৌতুক একান্ত সহানুভূতিময় অথচ তীব্র। মনুষ্যফল, বিড়াল, ঢেঁকি, কমলাকান্তের জবানবন্দী প্রভৃতি রচনা উদ্দাম হাস্য ও গভীর বেদনার মিশ্রণে এক অপূর্ব উপভোগ এনে দেয়—এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যা আমরা কোথাও পাইনা। বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম ভড়ের জীবনচরিত প্রধানতঃ বিদ্রূপাত্মক রচনা। দীনবন্ধুর ডেপুটি ঘটিরাম সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরামের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্যে নির্মল উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরসের একটি আদর্শ ও একটি উচ্চ মান স্থাপিত করেছিলেন বলেই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পর গদ্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথ একজন উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসিক। এর হাসি নির্মল, পরিচ্ছন্ন, অসূয়াহীন ও মানব সহানুভূতিতে ভরা। ত্রৈলোক্যনাথ বহু দুঃখ জীবনে পেয়েছিলেন, মানুষের অনেক নিষ্ঠুরতা, অনেক দুঃখ তিনি দেখেও ছিলেন। বোধ হয় সেই কারণেই তাঁর হাস্যরস এত পরিচ্ছন্ন, অসূয়াহীন উৎকৃষ্ট humour হয়ে উঠেছে। এখানে পাই প্রকৃতই উচ্চতম হাস্য—যাকে বলে hilarious। তাঁর কঙ্কাবতী অনেকেই পড়েছেন। এর মধ্যে গভীর বেদনার সঙ্গে উচ্চ হাসির কীরূপ অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে তা অনেকেই জানেন। বস্তুতঃ এইটিই বাংলায় প্রথম মৌলিক রচনা Alice in wonderland প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে যার তুলনা চলে। ত্রৈলোক্যনাথের "বিদ্যাধরীর অরুচি" প্রভৃতি গল্পগুলি হাস্যরসে অতুলনীয় তো বটেই, গল্প হিসেবেও এগুলি উৎকৃষ্ট। তাঁর ডমরু চরিত হাস্যরসের অবিস্মরণীয় রচনা এবং tall tales হিসাবে বাংলায় অদ্বিতীয়। ডমরুধর তাঁর

সুন্দরবনের আবাদে একবার কুমীর মেরেছিলেন সেই গল্প করছেন। কুমীরটাকে মারবার কারণ হচ্ছে কুমীরটা এক নৌকা ডুবিয়ে একটি মহিলাকে খেয়েছিল। ডমরু বলছেন : "নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে তাঁহার……সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জান যে কুমীরের পেটে মাংস হজম হয় কিন্তু গহনা হজম হয় না। কুমীর যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল, চিরকাল আমি কপালে পুরুষ, যদি এই কুমীরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া ঐ গহনাগুলি বাহির করিব, অন্ততঃ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।……আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমীর আর একটা মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্বে এক সাঁওতালনী এক ঝুড়ি বেগুন মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে সেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুনের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে।" এরপর ডমরুধর কুমীরটাকে মেরে তার পেট চিরে ফেললেন। তার পরের কথা ডমরুধরের মুখেই শুনুন! "পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম তাহাতেই আমার চক্ষু স্থির। বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখিনা যে, সেই সাওতাল মাগী, পূর্ব দেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটা যে উপুর করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল"।

ত্রৈলোক্যনাথ "ফোক্‌লা দিগম্বর", "পাপের পরিণাম", "ডমরু-চরিত", "বাঙ্গাল নিধিরাম", "কঙ্কাবতী", "মুক্তামালা", "মজার গল্প", প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস, গল্প ও রসরচনার বই লিখেছিলেন এবং এর প্রত্যেকটিই হাস্যরস পরিপূর্ণ ও পরম উপভোগ্য। ইন্দ্রনাথের পর সাঁক্রি শ্রীনেহালচাঁদ" রচিত "বিচিত্র রসকাব্য", "পৌষপার্বন" প্রভৃতি ব্যঙ্গ কাব্য পাওয়া যায়। এর পর উল্লেখযোগ্য হাস্যরস আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় পাই। সরস রচনা হিসাবে তাঁর "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য" উল্লেখযোগ্য একটু নমুনা দিই :-

"মহাজন গোঁপনিষ্ট হইলেন গোঁফাকৃষ্ট
মন্ত্রবলে যেন সর্পধরা
সভ্যতার বাঁধটুটি কহিলেন মুখ ফুটি,
কথাগুলি উপদেশ ভরা॥"
"অমন সুন্দর গোঁপ ওতে না দিলে কলোপ,
ভবে আসি কি তবে করিলে।
তোমার ও গোঁপখানি সামান্য তো নাহি মানি
তপস্যায় কারো ভাগ্যে মিলে॥
ব্যয়মাত্র পাঁচটাকা, একটি না রবে পাকা
ইথে কেন করিছে কার্পণ্য।
নেড়া গির্জ্জে যাবা মাত্র মিলিবে অতি সুপাত্র
গুনী মাঝে যিনি অগ্রগণ্য॥
তাঁর হস্তে তব মোছ, পেয়ে কলপের পোঁচ
অমনি হইবে কালো মিষ।
অনায়াসে হবে ধন্য, যুবা মধ্যে হবে গণ্য
বয়ঃক্রম উনিস কি বিশ॥"

তাঁর সংস্কৃত ছন্দে লেখা ছোট ছোট ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও চমৎকার :

"বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে সে জন্যে গৃহগ-বিহগ প্রাণে দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন বসে কিছু হয় না।
বিনা হ্যাট্‌টা-কোটটা ধুতি পিরহণে মান রয় না॥"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "বিরহ", "পুনর্জন্ম" প্রভৃতি প্রহসনে হাস্যরস পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন একথা আগে বলেছি। ইনি হাসির কবিতা ও গানেও অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন—তাঁর "হাসির গান" নামে সুবিখ্যাত গ্রন্থই তাঁর প্রমাণ। এই হাসির গানগুলি বাংলাদেশে এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর যাচ্ছিল সে ঘোষেদের ঐ ডোবার ধার দিয়ে, বুড়ো

বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকতো, "প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত" ইত্যাদি গানগুলি বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দুঃখের বিষয় দ্বিগেন্দ্রলালের হাসির গানের মধ্যে অনেকগুলিই কোনো না কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিদ্রূপ ক'রে লেখা এবং এ বিদ্রূপ অনেক সময়েই বিদ্বেশ বা অসূয়া বর্জিত নয়। তার ব্যঙ্গাত্মক কবিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ "নন্দলাল" কবিতা :

"নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন—
লিখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ!
খাইতে ধরিল লুচি ও সন্দেস থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল, বাহাবা, বাহাবা নন্দলাল!"

এ সময়ের হাসির কবিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে রজনীকান্ত সেনের খাদ্যাদি বিষয়ের কীর্তনটিরও উল্লেখ করা যায়।

এখন একালের শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ ও কৌতুকবোধ তাঁর গল্প উপন্যাস কবিতা সর্বত্র নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বহু রচনার মধ্যেই একটি প্রচ্ছন্ন মৃদুহাস্যের ধারা প্রবাহিত। খাঁটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা গদ্যে ও পদ্যে—তাও রবীন্দ্রনাথ কম লেখেননি। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতা হিং টিং ছট্‌, জুতা আবিষ্কার প্রভৃতি সর্বজন পরিচিত। তার কৌতুক কবিতাও বহু—এবং তার দুটো ভাগ করা চলে। এক প্রথম জীবনের "লক্ষীর পরীক্ষা" প্রভৃতি কবিতা যার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন moral বা নীতি আছে—আর শেষ জীবনের খাপছাড়া, "প্রহাসিনী" প্রভৃতি হাস্য রসাশ্রিত আবোল তাবল জাতীয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রহসনও লিখেছেন—গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষ রক্ষার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁর "হাস্যকৌতুক" ও "ব্যঙ্গকৌতুক" গল্প দুটিতে ক্ষুদ্র নাট্যাকারে তিনি যে অপরিমেয় হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রে ভিন্ন অন্যত্র তার তুলনা মেলা শক্ত। একটু উদাহরণ দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"অভিভাবক। কেমন রে মেধো, পুরোনো পড়া সব মনে আছে তো?

মধুসূদন। মাষ্টারমশয় যা বলে দিয়েছেন তা সব মনে আছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, উদ্ভিদ্‌ কাকে বলে বল্‌ দেখি।

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

ম। কেঁচো।

মাষ্টার। অ্যাঁ কী বললি।

অভিভাবক। তুমি তো পদ্য পাঠ পড়েছ, আচ্ছা কাননে কী ফোটে বলো দেখি।

ম। কাঁটা।

অ। আচ্ছা সিরাজদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কী বলে?

ম। পোকায়। (মাষ্টার কর্তৃক বেত্রাঘাত) আজ্ঞে মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি—শুধু সিরাজদ্দৌলা কেন সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে। এই দেখুন।"

"খাপছাড়া"য় তিনি nonsense বা আবোল তাবোল জাতীয় যে কৌতুক পরিবেশন করেছেন তার থেকে একটু শোনাই:

"বর এসেছে বিয়ের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আট্‌টা।
পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে
গালেতে গাল পাট্টা।
শালির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠলো জমে
রায় বেশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলো গাট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে
বর হেসে কয় ঠাট্টা।"

তাঁর প্রহাসিনীতে হাস্য অপেক্ষা ব্যঙ্গে ভাগ অধিক। ব্যঙ্গে ও হাস্যে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব মহৎ হলেও আমার মনে হয় যে নিছক খাঁটি হাস্যরসে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের সমকক্ষ নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে গভীর মননশীলতা তাঁর সকল রচনাকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। হাস্যরস রচনাতে তিনি সকল সময় তা উত্তীর্ণ হয়ে নিছক খাঁটি হাস্যরসের সরলতায় গিয়ে পৌঁছুতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা স্বীকার করে বলেছেন :

"লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয়তো।"

রবীন্দ্রনাথের মণীষা অধিকাংশ সময়ে তাঁর কৌতুকের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তাঁর উৎকৃষ্ট Satire বা ব্যঙ্গাত্মক রচনা এবং Wit-এর বহু পরিচয় পাই। কিন্তু নিছক হাস্যরসের পরিচয় ততটা পাই না Nonsene verse বা আবোল তাবোল জাতীয় রচনায় তিনি সুকুমার রায়কে অতিক্রম করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর "পেটে খেলে পিঠে সয়, কিন্তু পিঠে খেলে পেটে সয়না" উচ্চশ্রেণীর wit-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একজন উৎকৃষ্ট হাস্যরসিক লেখক। তাঁর ভূতপত্রী বা ভূতপত্রীর দেশে একখানি উত্তম হাস্যরসাত্মক phantasy। তার "খাজাঞ্চির খাতা", "বুড়ো আংলা" প্রভৃতি রচনাও হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে অনেকে হাস্যরসিক লেখক বলে মনে করেন। কিন্তু বস্তুত তিনি যথার্থ হাস্যরসিক লেখক ছিলেন না। তাঁর রচনায় ব্যঙ্গ ছিল wit প্রচুর ছিল, কিন্তু খাঁটি হাস্যরসের রসিক তিনি ছিলেন বলে মনে হয় না। একটু দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে। সনেট্ "পঞ্চাশৎ"এ তিনি লিখছেন :

"প্রিয় কবি হতে চাও লিখ ভালবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
এর জন্য চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা।"

প্রমথ চৌধুরীর সকল রচনাই এরূপ তীব্র শ্লেষাত্মক।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের বিশেষ প্রসার ঘটেছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এর অনেক কবিতাই সমসাময়িক কোনো ব্যক্তি বা ঘটনাকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা, সে-হিসেব সাময়িকতা দুষ্ট এবং বিদ্রূপাত্মক। সাহিত্য যাঁরা বাস্তবতার পক্ষপাতী তাঁদের বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছিলেন :

"কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি,
ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর' ফুলকপি।
বস্তু-তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা
ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা।"

কিন্তু নিছক হাস্যরসের কবিতাও সত্যেন্দ্রনাথ অনেক লিখেছিলেন। যেমন তাঁর রাত্রি বর্ণনা :

"ঘড়িতে বারোটা, পথে বরোফ্ বরোফ্ লোপ!
উড়ি উড়ি আরশোলা দেয় তুড়িলাফ সাফ!
পাল্কী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে তুড়ে!
পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ্ খোদ্!
বেতালা মাতালগুলা খায় হালফিল্ কিল্!
তন্দ্রাবলে তক্তাপোশে প্রচণ্ড পণ্ডিত চিৎ!
যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুত ভূত!
আচরি' সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে দন্তে!
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক নাক্!

এসময়ে হাস্যরসাত্মক গদ্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর "কোষ্ঠীর ফলাফল" "অ্যাই হাজ" প্রভৃতি গল্প হাস্যরসের

দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর এ যুগে আমরা যে দুজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিককে পেয়েছি, সে কথা বলেই এ আলোচনা শেষ করবো। এঁরা দুজন হচ্ছেন—সুকুমার রায় ও রাজশেখর বসু। সুকুমার রায় বস্তুতঃ ভারতী গোষ্ঠীর লেখক—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক। কিন্তু "সন্দেশ"—পত্রিকায় তাঁর রচনা ধারাবাহিক ভাবে অনেক কাল ধরে প্রকাশিত হলেও তাঁর "আবোল তাবোল" ও "হযবরল" প্রকাশিত হয়—যতদূর মনে পড়ে—১৩২৮ সালে। "খাই খাই" তো সম্প্রতি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর প্রহসন "চলচিত্তচঞ্চরী" ও অন্য অনেক রচনা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। শিশুপাঠ্য রচনার লেখক হিসেবেই তিনি নিজেকে উপস্থিত করেছেন—কিন্তু তাঁর রচনাগুলি আবাল বৃদ্ধ বণিতার কাছে যে হাস্যরস পরিবেশন করেছে তাতে আমরা তাঁকে Lewis Carrol, Edward Lear প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ, হাস্যরসিক হিসাবে অক্লেশে গ্রহণ করতে পারি। এঁর রচনার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেননা আজকের দিনে এর রচনার সঙ্গে অপরিচিত কোনো বাঙালী আছেন বলে বিশ্বাস করি না।

আধুনিক কালের এইরূপ সর্বোচ্চশ্রেণীর আয়োজন হাস্যরসিক পরশুরাম বা শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু। এর রচনার সঙ্গেও সকলেই পরিচিত। এর "ভূষণ্ডীর মাঠে" "বিরিঞ্চি বাবা," "জাবালি," "কচিসংসদ", "লম্বকর্ণ" প্রভৃতি গল্পগুলি গদ্য সাহিত্যে হাস্যরসের, উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এই সব লেখকের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্য হাস্যরসে হীন একথা আর বলা যায় না—বরং বিশ্বের হাস্যরসাত্মক শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের পরিমাণের দিক থেকে না হলেও গুণের দিক থেকে কিছু কিছু তুলনা চলে বলেই আমার ধারণা।

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত সাধারণের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা)

চন্দ্রে অভিযান

(প্রথম পর্যায়)

শ্রীদেবপ্রসাদ সুরাল

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের প্রথম থেকেই চন্দ্র তাকে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করেছিল। বিস্ময়ের কারণ রাত্রির আকাশে চন্দ্রের সুশৃঙ্খল চলাফেরা, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিয়মিত পুনরাগমণ। আকর্ষণের জন্য জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য অবশ্যই অনেকটা দায়ী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা দিনের আলো শেষ হ'লে একমাত্র চাঁদের আলোই সেই আদিম মানুষকে বন্য জন্তুর গোপন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করত। সমস্ত প্রাচীন জাতির পুরাকাহিনীতে তাই চন্দ্র একটা বিশিষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। রামায়ণে রাবণ রাজার চন্দ্রলোক যাত্রার কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। চন্দ্রলোক জয় করার ইচ্ছা নিয়েই রাবণ সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রথমে শীতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি চন্দ্রলোকের অধিপতি চন্দ্রকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। প্রাচীন গ্রীকরাও চন্দ্রলোকের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করেছেন। খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত বৎসরের মধ্যে যে সব গ্রীক জ্যোতি বিজ্ঞানীদের নাম শোনা যায় তাঁদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে চন্দ্র পৃথিবীর মতই প্রস্তরময় আর এক জগৎ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লুটার্ক চন্দ্র সম্পর্কিত একখানা বই লিখেছিলেন। তিনি পূর্বতন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সবরকম মতামত বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে চন্দ্র পৃথিবীরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। অবশ্য তাঁর ধারণা ছিল যে মৃত ব্যক্তিদের আত্মারা চন্দ্রে বসবাস করেন। প্লুটার্কের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে গ্রীক লেখক লুকিয়ান 'প্রকৃত ইতিহাস' নামে চন্দ্রলোক যাত্রার এক কাহিনী রচনা করেন। এই কাহিনীর নায়কেরা জাহাজে চড়ে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়েছিল। হঠাৎ এক ঘূর্ণিবাত্যায় পড়ে জাহাজখানা সমুদ্র থেকে আকাশে উঠে পড়ে ও বাতাসের ধাক্কায় ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠতে থাকে। সাতদিন সাতরাত্রির পরে নাবিকেরা চন্দ্রলোকে পৌছায়। সেখানের আশ্চর্য সব ঘটনার বিবরণ লুকিয়ান তাঁর বইএ দিয়েছেন।

প্লুটার্ক ও লুকিয়ানের পরে প্রায় চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে চন্দ্রের স্বরূপ নিয়ে লেখা কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা চন্দ্রলোক যাত্রার কোন কল্পিত কাহিনী লেখা হয় নি। এই যুগের ধর্মগুরুরা পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পার্থিব জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিক দিয়ে এই সময়টাকে অনায়াসেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা চলে। আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে ষোরশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস, কেপলার ও গ্যালিলিও এই তিন মহৎ বিজ্ঞাণীর চেষ্টায় মধ্যযুগের অন্ধকার অনেকটা দূরীভূত হয়। পৃথিবীর চারধারে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রেরা ঘুরছে বলে যে মত এতদিন প্রচলিত ছিল কোপার্নিকাস তা খণ্ডন করেন এবং সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে পৃথিবীর আবর্তনের নতুন মতবাদ প্রচার করেন। গ্রহদের গতিপ্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দেন কেপলার। তিনি প্রমাণ করেন যে প্রতিটি গ্রহই সূর্যের চারধারে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সূর্যের খুব কাছে এসে পড়লে তার গতি দ্রুততর হয় এবং সূর্যথেকে দূরে চলে গেলে গতি মন্থর হয়ে আসে। গ্যালিলিও তাঁর নিজের তৈরী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র ও গ্রহগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সাধারণ দৃষ্টিতে শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহকে ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর মত দেখায়। দূরবীক্ষণের ভেতর

দিয়ে তাদেরকে ছোট ছোট থালার আকারে দেখা গেল। চন্দ্রোলোক অন্তর্গত পাহার পর্বতগুলিও- গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণে ধরা পড়ল। সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহরা প্রত্যেকেই যে পৃথিবীর মত আলাদা আলাদা জগৎ এই মত ক্রমেই স্বীকৃত হ'তে লাগল।

কিন্তু এই সময়ের যন্ত্রপাতি তেমন উন্নত ছিল না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিংশ শতকীর উন্নতির অনেকখানিই তখন কল্পনার বাইরে। এখনকার বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত জানেন যে সৌরজগতের অধিকাংশ গ্রহ উপগ্রহের আবহাওয়া জীবনের প্রতি অনুকূল নয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের কাছে এ সত্য প্রতীয়মান হয় নি। তাঁরা অন্য গ্রহ উপগ্রহ গুলিতে জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই গ্রহান্তর যাত্রার আকাঙ্খা মানুষকে আবার নতুন করে চঞ্চল করে তুলল। নবযুগের আকাঙ্খার প্রথম প্রকাশ দেখতে পাই কেপলারের নিজের লেখা 'নিদ্রা' উপন্যাসে। পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রের ওপর পড়ে তখন সেই অস্থায়ী ছায়াসেতুর মাধ্যমে দৈত্যদের সাহায্যে 'নিদ্রা'র নায়ক চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌছেছিল। কেপলারের উপন্যাসে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের তৎকালীন জ্ঞানের সঙ্গে রূপক ও কল্পনার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। এরপর ইংরেজ বিশপ গড্‌উইনের লেখা 'চন্দ্রে মানুষ' নামে একখানা বইএর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা এই বইটিতে কেপলারের উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে বলে সন্দেহ করেন। পরবর্তী যুগে চন্দ্রলোক যাত্রা সম্পকিত কাহিনীর লেখকেরা গড্‌উইনের বই থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে নিউটন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করেন। জ্যোতিবিজ্ঞানের পক্ষে এটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহদের পরস্পর আকর্ষণের প্রকৃতি এবার সঠিকভাবে বোঝা গেল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হ'ল। এই বিপুল দূরত্বের প্রায় সবটাই যে বাতাসহীন মহাশূন্য এ বিষয়ে কারও মনে আর সন্দেহ রইল না। গ্রহান্তর যাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য বিজ্ঞানীদের কাছে ক্রমেই পরিষ্কার হ'তে লাগল। মাধ্যাকর্ষণের দৃঢ়বন্ধন, পৃথিবী থেকে যে কোন গ্রহ বা উপগ্রহের লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব, বায়ুহীন মহাশূন্যে যাতায়াতের উপযোগী ব্যোমযানের অভাব, গ্রহান্তর যাত্রার এইসব অসুবিধেগুলি প্রকট হয়ে উঠল।

বিজ্ঞানীরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে এই অসুবিধেগুলি দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী অথচ বিজ্ঞান-অবলম্বী গল্প উপন্যাস লেখা ও পড়ার দিকে মানুষের ঝোক বাড়ল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এই ধরণের বই অনেক লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা জুলে ভার্ণের 'পৃথিবী থেকে চন্দ্রে' ও 'চন্দ্রের চারপাশে' এবং বিংশ শতাব্দীতে লেখা ওয়েল্‌সের 'চন্দ্রে প্রথম মানুষ' ও সিওল্‌কোভস্কির 'পৃথিবীর বাইরে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান যুগে রাশিয়ান ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের সৃষ্ট কৃত্রিম গ্রহ উপগ্রহদের সূর্য ও পৃথিবীর চারধারে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের কাহিনীর জনপ্রিয়তা খুবই বেড়েগেছে।

বাস্তবিকপক্ষে গ্রহান্তর যাত্রা বা চন্দ্রে অভিযানের সম্ভাবনা আজ আর কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিজ্ঞানীর কৃতিত্বে বর্তমান যুগের মানুষ প্রত্যাশায় কাঁপছে, এই পুরুষের মধ্যেই হয়তো প্রথম মানুষ চন্দ্রে পদার্পণ করবে। চন্দ্রের পর মঙ্গল, শুক্র এবং আস্তে আস্তে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের আহ্বানও সে উপেক্ষা করবে না। দূর ভবিষ্যতে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে নক্ষত্রের রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার কথাও সে নিশ্চয় চিন্তা করবে।

গ্রহান্তরযাত্রা বা চন্দ্রে অভিযানের প্রশ্নটি আজকের বিজ্ঞানীরা যেভাবে দেখছেন, সে সম্বন্ধে মূল কয়েকটি তথ্য পেশ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে আমরা সৌরজগতে পৃথিবীর প্রতিবেশী অন্য গ্রহ

উপগ্রহদের আয়তন ও পারস্পরিক দুরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

সৌরজগতের মধ্যমণি হ'ল একটি মাঝারি আয়তনের নক্ষত্র, অতি প্রাচীন কাল থেকে যার নাম আমরা সূর্য দিয়ে রেখেছি। সূর্য আসলে জলন্ত গ্যাসের একটা বিরাট গোলাকৃতি পিণ্ড। এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ আর এর অভ্যন্তরের উত্তাপ প্রায় দু কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্। সূর্যের অমোঘ শাসনে পৃথিবী ও অন্য গ্রহেরা তার চারধারে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। গ্রহদের অনেকেরই চারধারে আবার এক বা একাধিক উপগ্রহ উপবৃত্তের পথে ঘুরছে। নটি গ্রহ, একত্রিশটি উপগ্রহ, অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রহ (এদের নাম দেওয়া হয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ) এবং অসংখ্য ধূমকেতু ও উল্কা নিয়ে সূর্যের রাজত্ব। মনুষ্য সৃষ্ট সাম্প্রতিক উপগ্রহ ও গ্রহগুলিও সৌররাজ্যের নতুন প্রজা হিসেবে নিজেদের দাবী করতে পারে।

সৌরজগতে নটি বড় গ্রহের কক্ষপথ ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। সূর্যের তুলনায় গ্রহগুলি ও চন্দ্র আকারে কত ছোট সেটা ২নং চিত্র দেখলে বোঝা যাবে। সূর্যের বিরাট আয়তন এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের থেকে তার কোটি কোটি মাইল দুরত্ব আমাদের সীমিত ধারণা শক্তির মধ্যে আনবার জন্য বৃটিশ বিজ্ঞানী প্যাট্রিক মুর একটা বেশ সুন্দর উদাহারণ দিয়েছেন। দু'ফুট ব্যাসের একটা গোলককে যদি সূর্য মনে করা যায় তা হ'লে সেই মান অনুসারে অন্য গ্রহদের আয়তন ও সূর্য থেকে দুরত্ব কি ধরণের হবে সেই পরবর্তী তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে।

গ্রহ	দু'ফুট ব্যাসের সূর্য থেকে দুরত্ব	আয়তন	উপগ্রহের সংখ্যা
বুধ	৮৩ ফুট	সরষের দানার মত	০
শুক্র	১৫৬ ফুট	কড়াই শুটির দানার মত	০
পৃথিবী	২১৫ ফুট	কড়াই শুটির দানার মত	১
মঙ্গল	৩২৮ ফুট	গোলমরিচের মত	২
বৃহস্পতি	৩৫২ গজ	কমলালেবুর মত	১২
শনি	৭০৪ গজ	ছোট কমলা-লেবুর মত	৯
ইউরেনিয়াস	১৪০৮ গজ	সুপুরির মত	৫
নেপচুন	সোয়া মাইল	বড় সুপুরির মত	২
প্লুটো	দু' মাইল	বড় এলাচের দানার মত	—

এই মান অনুযায়ী চন্দ্রকে পৃথিবী থেকে সাড়ে ছয় ইঞ্চি দূরে ঘূর্ণায়মান একটি সরষের দানার মত দেখাবে। ওপরের তালিকায় দু' ফুট ব্যাসের সূর্যের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ২১৫ ফুট দেখানো হয়েছে। এই দুরত্বের প্রকৃত মান হচ্ছে ন কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। (পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে তখন তার দুরত্ব হ'ল ন কোটি পনেরো লক্ষ মাইল আর সবচেয়ে দুরে থাকার সময় তার দুরত্ব হয় ন কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মাইল)।

সৌরজগতের অন্য গ্রহ উপগ্রহদের কথা বাদ দিয়ে এবার পৃথিবী ও চন্দ্রের আয়তন ও পারস্পরিক দূরত্বের আলোচনায় আশা যাক। আমরা ছোট থেকেই জানি যে পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল কিন্তু উত্তর দক্ষিণে কিছুটা চাপা। পৃথিবীর গড় ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর চারধারে একটা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব মোটামুটি ২৩৮৮০০ মাইল ধরা যেতে পারে। পৃথিবীর আয়তনের তিরিশটা গোলক পর পর সাজালে চন্দ্র পর্যন্ত পৌছাবে। বর্তমানে চন্দ্র পৃথিবীর মত প্রস্তরময় কঠিন এক জগৎ। পৃথিবীর চারপাশে সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরে আসতে এর প্রায় ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে সে নিজের চারদিকেও একপাক ঘুরে নেয়। ফলে পৃথিবী থেকে আমরা চন্দ্রের একটা গোলার্ধই দেখতে পাই। চন্দ্রের বাকী অংশটা চিরদিনের জন্য আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। মানুষ চন্দ্রলোকে পৌছালে বা চন্দ্রের চারপাশে রকেট ঘুরিয়ে লুকোন দিকের ছবি নিয়ে এলে তবেই সে পাশে কি আছে জানতে পারা যাবে। চন্দ্রের আকার অনেকটা ডিমের মত, এর যে অর্ধাংশ পৃথিবীর দিকে মুখ করে রয়েছে সে দিকটা বিরাট এক আবের মত ফুলে আছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, অতীতে চন্দ্রের অর্ধতরল অবস্থায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড টানেই এই আবের উৎপত্তি। আয়তনে ও ভরে চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে বেশ খানিকটা খাটো। চন্দ্রের গড় ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ; এর ভর পৃথিবীর ভরের একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র। চন্দ্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিচার মুলতুবী রেখে এরপর আমরা চন্দ্রে বা অন্যান্য গ্রহে অভিযানের পথে প্রধান বাধা কি ও কি করে সেটিকে দূর করা যায় তার আলোচনায় আসব।

চন্দ্রে অভিযানের পথে প্রধান কণ্টক হ'ল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। আর শুধু পৃথিবী বলে নয় বিশ্বের যে কোন বস্তু অন্য যে কোন বস্তুকে তার নিজের দিকে টানছে। এই আকর্ষণের ক্ষমতা একটা পিঁপড়ে থেকে আরম্ভ করে অতিকায় নক্ষত্র পর্যন্ত সকলেরই রয়েছে। মহাবিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে ছোট্ট একটি সূত্রাকারে লেখেন। দেখা গেছে দুটো জিনিষের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের টান মাত্র তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে,—জিনিষ দুটোর ভর ও তাদের মধ্যেকার দূরত্ব। ভর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণও বেড়ে চলে। প্রথম বস্তুটির ভর দ্বিগুণ করলে আকর্ষণের পরিমাণও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এরপর যদি দ্বিতীয় বস্তুটির ভর তিনগুণ বাড়ানো যায় তাহ'লে আকর্ষণের পরিমাণ মোট ছ গুণ বাড়বে। জিনিষ দুটোর মধ্যেকার দূরত্ব বাড়তে থাকলে তাদের পরস্পরের প্রতি টান কমে যায়। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়লে আকর্ষণ কমে চার ভাগের একভাগ হয়ে যায় আর তিনগুণ বাড়লে আকর্ষণ হয় ন ভাগের একভাগ মাত্র। নিউটনের সূত্র অনুযায়ী পৃথিবী আমাদের সবাইকে টানছে। আমরাও অবশ্যই পৃথিবীকে টানছি কিন্তু পৃথিবীব ভর অত্যন্ত বেশী হওয়ায় আমাদের টানের কোন প্রভাব তার ওপর দেখতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমাদের ওপর পৃথিবীর টান আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি। ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে একটু অসাবধান হ'লেই অমনি পপাত ধরণীতলে। আপেলফল কেন মাটিতে পড়ে

এ বিষয়ে নিউটনের গবেষণার গল্প তো সর্বজনবিদিত।

বস্তুত মাধ্যাকর্ষণের আইনের অমোঘ বিধানেই সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহেরা এমন সুশৃঙ্খল ভাবে চলাফেরা করছে। আমরা যে পৃথিবী থেকে ছিটকে বাইরে মহাশূন্যে গিয়ে পড়ছি না সেটাও মাধ্যাকর্ষণের টানের ফলে সম্ভব হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে আমাদের সবাই মিলে একসঙ্গে এইভাবে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত। যূথবদ্ধ জীবজগৎ বা সমাজবদ্ধ মানুষের কোন অস্তিত্বই থাকত না।

কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়ে বাইরে যাবার কথা চিন্তা করলেই মাধ্যাকর্ষণ আপত্তি জানাবে। বেলুন বা এরোপ্লেনের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর টান এড়িয়ে আকাশে উড়তে পারি। কিন্তু ওড়ার জন্য এরা সকলেই বাতাসের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবী চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহদের মাঝখানে যে মহাশূন্য সেখানে বাতাসের ছিটেফোঁটাও নেই। বেলুন বা এরোপ্লেন জাতীয় যান সেখানে সম্পূর্ণ অচল।

মাধ্যাকর্ষণকে পরাজিত করে চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তর যাত্রার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল প্রচণ্ড গতিবেগের সাহায্য নেওয়া। একটা পাথরকে সোজা ওপরদিকে ছুঁড়ে দিলে দেখা যায় যে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার গতিবেগ ক্রমশঃ কমে আসছে। বাতাসের ঘর্ষণের কথা বাদদিলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানই পাথরটার গতিবেগ কমে আসার একমাত্র কারণ। কমতে কমতে একসময় গতিবেগ শূন্য হয়ে যাবে আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে পৃথিবীর টানে পাথরটা নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করবে। গতিবেগ শূন্য হয়ে যাওয়ার সময় সে কতটা উঁচুতে উঠবে সেটা ছোঁড়ার সময় তার প্রাথমিক বেগের ওপর নির্ভর করে। প্রাথমিক বেগ যত বেশী হবে পাথরটা তত বেশী উঁচুতে উঠ্‌বে। সোজা ওপরদিকে না ছুঁড়ে একটুখানি কাৎ করে পাথরটা ছুঁড়লে তার গতিপথটা একটা উপবৃত্তের আকার ধারণ করবে। প্রাথমিক বেগ খুব বেশী হ'লে উপবৃত্তের একটা প্রান্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে চলে যাবে।

এখন প্রাথমিক বেগ বাড়াতে বাড়াতে যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইল (ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল) করতে পারা যায় তা হ'লে পাথরটা আর কোনদিনই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। সে ক্রমাগত পৃথিবী থেকে দূরে চলে যেতে থাকবে। এই গতিবেগকে বলা হয় পৃথিবী পৃষ্ঠে নিষ্ক্রমণ বেগ। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাথরটা যেখানেই থাক না কেন পৃথিবীর আকর্ষণ তার ওপর ঠিকই কাজ করবে। পৃথিবী থেকে যত দূরে যাওয়া যায় তার আকর্ষণ ততই কমে আসে, বহু দূরে গেলে তার প্রভাব অত্যন্ত কম হয়ে পড়ে কিন্তু কোন জায়গাতেই তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় না। পাথরটার প্রাথমিক বেগ নিষ্ক্রমণ বেগের চেয়ে সামান্য কম হ'লেই তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে (অন্য গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণ এখানে ধরা হচ্ছে না। অধিকতর শক্তিশালী কোন আকর্ষণের কবলে পড়লে পাথরটা অবশ্যই ফিরতে পারবে না)। আর প্রাথমিক বেগ নিষ্ক্রমণ বেগের চেয়ে বেশী হ'লেও পাথরটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। তবে এক্ষেত্রে বাড়তি গতিবেগটুকু অপ্রয়োজনে নষ্ট হ'ল।

এতক্ষণ আমরা শুধু পৃথিবীর আকর্ষণের কথাই ধরেছি। পাথরটাকে চন্দ্রে পাঠাতে হ'লে আমাদের চন্দ্রের আকর্ষণের কথাও খেয়াল রাখতে হবে। সূর্যের আকর্ষণের হিসেবটা আমরা আপাততঃ বাদ দিতে পারি কেননা পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব, সূর্য থেকে তাদের দূরত্বের তুলনায় এত কম যে পৃথিবী থেকে চন্দ্রে যাওয়ার পথে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ প্রায় অপরিবর্তিতই থাকবে। পাথরটার চলার পথে যে কোন সময় তার ওপর পৃথিবী ও চন্দ্র দুইএরই আকর্ষণ কাজ করবে। যতই সে চন্দ্রের দিকে এগোবে, তার ওপর পৃথিবীর টান ততই কমবে আর চন্দ্রের টান বাড়তে থাকবে। পৃথিবী থেকে

চন্দ্রের দূরত্বের দশভাগের নভাগ পথ গেলে পাথরটা এমন এক জায়গায় এসে পৌছাবে যেখানে পৃথিবী আর চন্দ্রের টান সমান অথচ বিপরীতমুখী হয়ে রয়েছে। এই জায়গায় তার ওপর কোন আকর্ষণই থাকবে না। মনে করা যাক পৃথিবী থেকে ছোঁড়ার সময় প্রাথমিক বেগ এরকম দেওয়া গেল যে পাথরটার উপবৃত্তাকার পথের অপর প্রান্তটা এই জায়গায় পৌছাতে সমর্থ হ'ল। সেক্ষেত্রে পাথরটা চন্দ্রের আকর্ষণের ক্ষেত্রে পড়ে যাবে এবং আর একটা উপবৃত্তের পথ ধরে চন্দ্রে গিয়ে পৌছাবে অবশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠে পড়ার সময় তার গতিবেগ সেকেণ্ডে দেড় মাইলের মত হওয়ায় পাথরটা সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ৪নং চিত্রে একটা উঁচু পর্বতের চূড়ায় পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে একটা কামান বসানো রয়েছে ও তার থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। প্রাথমিক বেগ কম হ'লে গোলাটা কিছু-দূর গিয়েই পৃথিবীর ওপর পড়বে। এর পথটা একটা উপবৃত্তের অংশ মাত্র। প্রাথমিক বেগ বাড়ালে গোলাটা আরও কিছু বেশী দূর যাবে, ওর পথের বাঁকটাও কিছুটা কমে আসবে। গোলাটার গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে একসময় তার গতিপথের বাঁক পৃথিবী পৃষ্ঠের বাঁকের সমান করে ফেলা যেতে পারে। এই অবস্থায় সে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে একটি বৃহত্তর পথে ঘুরতে থাকবে। কামানের পেছন দিকে যদি একটা ফুটো করে দেওয়া যায় তা হ'লে গোলাটা সেই দিক দিয়ে কামানের নলের ভেতর ঢুকে আবার সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসবে। বাতাসের ঘর্ষণের কথা হিসেবের মধ্যে না নিলে গোলাটা অনন্তকাল ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলবে। যে প্রাথমিক বেগ দিতে পারলে পৃথিবী পৃষ্ঠের ঠিক ওপরে গোলাটা এইভাবে বৃত্তের পথে ঘুরতে সমর্থ হয় তাকে বলা হয় চক্রবেগ বা প্রথম নভোচারণ বেগ। এর মান হ'ল সেকেণ্ডে প্রায় ৫ মাইল (ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০০ মাইল)। পৃথিবীকে সম্পূর্ণ এক পাক দিতে গোলাটার সময় লাগবে প্রায় একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট।

প্রাথমিক বেগ আরও বাড়ালে গোলাটা আবার একটা উপবৃত্তের পথ ধরবে কিন্তু এবার আর সে পৃথিবীতে পড়ে যাবে না। পৃথিবীর চারপাশে অনন্তকাল ধরে সে এই উপবৃত্তটির পথে ঘুরতে বাধ্য হবে। বর্তমানে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ছাড়া হয়েছে তারা সকলেই এই রকম উপবৃত্তের পথে পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে। অবশ্য তারা পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে তারপর পৃথিবীর সমান্তরালভাবে চলতে আরম্ভ করেছে। তা ছাড়া বাতাসের ঘর্ষণের জন্য তারা ক্রমেই নীচে নেমে আসছে ও শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এইখানেই না থেমে প্রাথমিক বেগ আরও বাড়িয়ে চললে উপবৃত্তটি ক্রমেই লম্বা হ'তে থাকবে। অবশেষে প্রাথমিক বেগ যখন নিষ্ক্রমণের বেগ সেকেণ্ডে সাত মাইলের সমান হবে তখন গোলাটা মুখ খোলা অধিবৃত্তাকার পথে ছুটবে। আর কোনদিন সে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। নিষ্ক্রমণবেগকে তাই অধিবৃত্ত বেগও বলা হয়। এর আর একটা নাম হ'ল দ্বিতীয় নভোচারণ বেগ। প্রাথমিক বেগ সেকেণ্ডে ৭ মাইলের চেয়ে বেশী হ'লে গোলাটার গতিপথের মুখটা আরও বেশী খুলে যাবে এবং সে একটা পরাবৃত্তের পথে চলতে থাকবে।

তাহ'লে দেখা গেল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে পরাজিত করে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করতে হ'লে বা চন্দ্রলোকে পৌছাতে হ'লে প্রথমে দরকার প্রথম ও দ্বিতীয় নভোচারণ বেগের মত প্রচণ্ড বেগের সৃষ্টি করা। প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রচণ্ড গতিবেগ কি করে সৃষ্টি করা সম্ভব? যুদ্ধে যে সব দূরপাল্লার কামান ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে অনায়াসেই সেকেণ্ডে একমাইলেরও বেশী বেগে গোলা ছোঁড়া যায়। স্বভাবতঃ আমরা ভাবতে পারি যে খুব বড় আর ভালো কামান তৈরী করতে পারলে

সেকেণ্ডে ৭ মাইল বেগে গোলা ছোঁড়া যাবে আর তার সাহায্যে মনুষ্যবাহী যান চন্দ্রে পৌছাতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে এরকম কামান তৈরী করা সম্ভব নয়। সম্ভব হ'লেও কামানের নলের ও বাইরের বাতাসের ঘর্ষণে গোলাটার গতিবেগ দারুণ মন্দীভুত হয়ে যাবে। তাছাড়া মনুষ্যবাহী কোন যানকে গোলার মত চন্দ্রের ওপর নিয়ে আছড়ে পড়তে দেওয়া চলে না। গোলা একবার ছোঁড়া হয়ে গেলে তার গতিপথ অদল বদল করা যাবে না। অথচ গ্রহান্তর যাত্রীবাহী যানটির পথ ও গতিবেগ মাঝে মাঝে বদলানোর দরকার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ সব ছাড়া আরও বড় কারণ রয়েছে যার জন্য মনুষ্যবাহী যানকে কামানের সাহায্যে গতিবেগ দিয়ে চন্দ্রে পাঠানো চলতেই পারে না। কামানের সাহায্য নিলে খুব অল্পসময়ের মধ্যে যানটির গতিবেগ অনেক বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় যানটির ত্বরণ খুব বেশী হবে। ত্বরণ অর্থ আর কিছুই নয় গতিবেগ বেড়ে যাওয়ার হার। ত্বরণ বেশী হওয়া আমরা মোটেই সহ্য করতে পারি না। ট্রাম বা বাস দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বেগে চলতে আরম্ভ করলে আমরা পেছন দিকে হেলে পড়ি। কেউ যেন আমাদের পেছন দিকে ঠেলে ধরেছে। ত্বরণ যত বেশী হবে অর্থাৎ ট্রাম বা বাসটা যত অল্পসময়ের মধ্যে যত বেশী বেগ নিতে পারবে আমাদের ওপর চাপের পরিমাণ ততই বেশী হবে। কামানের সাহায্য নিয়ে চন্দ্রে যেতে হ'লে ত্বরণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হবে এবং ফলে যাত্রীদের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। তারা নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে আর যানটিও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শুধু গতিবেগ বেশী হ'লেই চলবে না, সেই গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে যাতে ত্বরণ সব সময় কম থাকে। যানটির গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়ানো আরও একটা কারণে দরকার। পৃথিবীর ওপরে কয়েক শ মাইল বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল রয়েছে। পৃথিবীর ঠিক ওপরের বিশ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত বায়ুস্তরের ঘনত্বই সব চেয়ে বেশী। এই ঘন বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে চলতে গেলে যানটি খুবই বাধা পাবে। বাতাসের ঘর্ষণে তার গতিবেগ কমে আসবে এবং যানটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বায়ুস্তরের বাধা যানটির গতিবেগের ওপর নির্ভর করে। গতিবেগ যত বেশী হয় বাধাও সেই মত বেড়ে চলে। কিন্তু গোড়ার দিকে গতিবেগ কম রাখলে বাতাসের বাধা ও ঘর্ষণ জনিত উত্তাপ কম হবে। ঘন বায়ুস্তর ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই বাতাস পাতলা হয়ে আসবে ; তখন তার বাধা আপনা থেকেই কমে যাবে কাজেই সেখানে গতিবেগ বেশী হ'লে আর কোন অসুবিধে থাকবে না।

মহাশূন্যে অভিযানের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো এবার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। প্রথমতঃ দরকার প্রচণ্ড গতিবেগের। দ্বিতীয়তঃ এই প্রচণ্ড গতিবেগ অল্পসময়ের মধ্যে এনে দিলে চলবে না। মহাশূন্যযাত্রী-বাহী যানটির গতিবেগ আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে। পৃথিবীর ওপরে বিশত্রিশ মাইল ঘন বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যানটির গতিবেগ খুবই কম হওয়া দরকার। তৃতীয়তঃ চলার পথে প্রয়োজন মত যানটির গতিপথ ও গতিবেগ অদলবদল করতে পারা দরকার। চলার পথের বেশীর ভাগটাই বাতাসহীন মহাশূন্য কাজেই সেখানে এরোপ্লেন বা বেলুনের কোন কলা কৌশল ব্যবহার করার সুযোগ নেই। অথচ গতিবেগ বাড়ানো বা পথ বদলানোর উপায় যানটির ভেতরেই থাকতে হবে। আর সবশেষে খেয়াল রাখতে হবে যে গন্তব্যস্থানে নামবার সময় যান ও যাত্রীরা যেন কোনরকম আঘাত না পায়, যানটি যেন ধীরে ধীরে উদ্দিষ্ট গ্রহ বা উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশে পৌছাতে পারে।

এই সবকটি প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা মানুষের আয়ত্তে এসে গেছে। প্রমাণ হয়েছে একমাত্র রকেট বা হাউইওর সাহায্যেই মানুষ গ্রহান্তর যাত্রার আয়োজন করতে পারে। রকেট চলার মূলনীতি ও কি ভাবে রকেট এইসব সমস্যার সমাধান করেছে তার

আলোচনার পূর্বে কিছুটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা অনুসন্ধান করা যাক।

যতদূর জানা গেছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনদেশে রকেটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উৎসবের হাউই বাজী হিসেবে এবং যুদ্ধে এর ব্যবহারের কথা চীন সম্পর্কিত বই পত্রে উল্লিখিত আছে। মধ্যযুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ১২৩২ খৃষ্টাব্দে চীনের কাই-ফুং-ফু শহরের ওপর মোঙ্গলদের আক্রমণের সময় চীনেরা শহররক্ষার জন্য ফি-ই-হো-সিয়াং বা উড়ন্ত অগ্নিবাণ নামে একরকম অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। উড়ন্ত অগ্নিবাণ ছোঁড়ার জন্য কোনরকম ধনুকের প্রয়োজন হ'ত না। তীরের সঙ্গে লাগানো মোটা কাগজের একমুখ খোলা একটা নল বারুদ ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থে ঠাসা থাকত। আগুন ধরিয়ে দিলেই খোলামুখ দিয়ে উত্তপ্ত গ্যাস বেগে বেরিয়ে আসত এবং তীরটা হঠাৎ ছুটে গিয়ে শত্রুপক্ষের মধ্যে পড়ত। দাহ্য পদার্থগুলো জ্বলন্ত অবস্থায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে শত্রুশিবিরের সমূহ ক্ষতিসাধন করত। ভারতবর্ষ সম্ভবতঃ চীনদেশ থেকে রকেটের ব্যবহার শেখে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হায়দার আলি ও পরে তাঁর ছেলে টিপু সুলতান ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেছেন। এঁরা দুজনেই রকেট অস্ত্র ব্যবহারের জন্য আলাদা সৈন্যবাহিনী রেখেছিলেন। হায়দার আলির রকেট বাহিনীতে প্রায় ১২০০ এবং টিপু সুলতানের বাহিনীতে প্রায় ৫০০০ সৈন্য ছিল। হায়দার আলির রকেটে লোহার নল ব্যবহার করা হ'ত এবং এক একটার ওজন ছিল তিন থেকে ছয় সেরের মত। এক থেকে দেড় মাইল পাল্লার এই রকেটগুলি বৃটিশ ঘোড়সোওয়ার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ভারতীয় রকেটবাহিনীর সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে ইংরেজরা নিজেরাও রকেট চালিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করায় মন দেয়। ইংরেজদের কাছ থেকে এর ব্যবহার সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী শতকে অবশ্য দূরপাল্লার কামানের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রকেটের সামরিক মূল্য কমে আসে। বিংশ শতাব্দীতে আবার রকেটচালিত ক্ষেপণাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মানীর ভি-২ রকেটের কথা সকলেই জানেন। আর আজকাল তো আমরা রোজই খবরের কাগজে আন্ত মহাদলীয় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা পড়ছি। বস্তুতঃ হাইড্রোজেন বোমাবাহী এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিই বর্তমান যুগের ব্রহ্মাস্ত্র।

যুদ্ধের কথা বাদ দিলে বরাবরই বাজী হিসেবে রকেট বা হাউই জনপ্রিয়। আমাদের দেশী কালীপূজা ও অন্যান্য উৎসবে হাউইএর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তো প্রায়ই ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

মহাশূন্যে ভ্রমণের জন্য রকেট বা ঐ জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা যাঁরা প্রথম বলেন তাঁদের মধ্যে জার্মানীর গান্সভিণ্ড্ ও রাশিয়ার সিওল্কোভস্কির নামই প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রহান্তরযাত্রী ব্যোমযানটি কিরকম হবে, তার রকেটটি কোনধরণের জ্বালানি ব্যবহার করবে, রকেটমোটরটি কি করে উন্নততর করে তোলা যায়, পথের বিপদ আপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে এই ধরণের খুটিনাটি গবেষণার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকে রাশিয়ার সিওল্কোভস্কি, ফ্রান্সের এস্‌নো-পেলতেরি, আমেরিকার গডার্ড, জার্মানীর ওবেট ও ফন্‌ব্রাউন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের দান অপরিসীম। এঁদের এবং পরবর্তী অন্যান্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আজকের রকেট গবেষণা যে উন্নত স্তরে এসে পৌছেছে তারই ফলে কৃত্রিম গ্রহ উপগ্রহগুলি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এবং মনুষ্যবাহী যানের শীঘ্রমধ্যেই মহাকাল যাত্রার কথা আমরা চিন্তা করতে পারছি।

রকেট চলার মূলনীতিটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। বাঁদিকের ছবিতে দেখানো পাত্রটি খুব উচ্চ-চাপের গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা রয়েছে। পাত্রটি চারদিকেই বন্ধ। ভেতরের গ্যাস এর সব কটি দেওয়ালের ওপর সমানভাবে চাপ দেবে। এখন হঠাৎ করে পাত্রের

নীচে একটা ফুটো হয়ে গেলে তা দিয়ে গ্যাস বেগে বেরিয়ে আসবে। নীচের দেওয়ালে কোন চাপ থাকবে না অথচ ওপরের দেওয়ালে চাপ ঠিকই থাকবে। কাজে কাজেই পাত্রটি সোজা ওপর দিকে উঠে যেতে চাইবে। বারুদরকেটও একই নিয়মে চলে তবে সেখানে নলটা আগে থেকেই উচ্চচাপের গ্যাস দিয়ে ভরা নেই, তার বদলে বারুদ দিয়ে ঠাসা রয়েছে। আগুণ ধরিয়ে দিলেই বারুদ পুড়ে প্রচুর পরিমাণে উচ্চচাপের গ্যাস তৈরী হয়। নীচের খোলা মুখ দিয়ে গ্যাসটা বেগে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রকেটটা ওপরে উঠে অনেক দুর চলে যাবে। আমরা যে হাউই বাজীর কথা আগে বলেছি সেগুলি এই বারুদ রকেট ছাড়া আর কিছুই নয়। ৫নং চিত্রে দেখানো পাত্রের নীচের ফুটো দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসার জন্য তার উপরে ওঠে যাওয়ার মত আশ্চর্য্য ঘটনা যে সত্যই হ'তে পারে সেটা বোঝবার জন্য আমরা দুটো অতি সাধারণ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। একটা বেলুন বেশকরে ফুলিয়ে হঠাৎ যদি মুখটা খুলে দেওয়া হয় তা'হলে সেটা চুপসে তো যাবেই, হাতে ধরা না থাকলে, মুখটা যে দিকে রয়েছে তার উল্টোদিকে খানিকটা চলে যাবে। রাস্তা ধোওয়ার জন্য কর্পোরেশনের লোকেরা এক রকম লম্বা নল ব্যবহার করে এতো সকলেই দেখেছেন। নলটা দিয়ে জোড়ে জল বেরিয়ে আসে, সেই সময় নলটার ওপর পেছন দিকে যে ধাক্কা পরে সেটা সামলাবার জন্য বেশ কায়দা করে নলটা ধরে থাকতে হয়।

গ্যাসভরা পাত্র, বারুদ রকেট, রাস্তা ধোওয়ার হোসপাইপ এই সব ক্ষেত্রেই যে জিনিষটা হচ্ছে, নিউটন তার নাম দিয়েছেন প্রতিক্রিয়া জনিত বল। বন্দুক চালানোর সময় সাবধান না হ'লে বন্দুকের ধাক্কা খেয়ে নিজেকেই পড়ে যেতে হয়। এর কারণ হ'ল বুলেটটাকে বন্দুকটা যত জোরে সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে বুলেটটাও বন্দুকের ওপর পেছন দিকে তত জোরেই ধাক্কা দেবে। বুলেটটা হালকা হওয়ায় তার গতিবেগ খুব বেশী হয়। বন্দুকটা ভারী বলে তার গতিবেগ অনেক কম হবে। এ সত্ত্বেও বন্দুকের ওপর ধাক্কাটা বেশ বুঝতে পারা যায়। বুলেটটার ওপর বন্দুকের ধাক্কার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রিয়া এবং বন্দুকের ওপর বুলেটটার ধাক্কার নাম দেওয়া হয়েছে প্রতিক্রিয়া। নিউটনের মতে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে। বন্দুকের গতিটাকে আমরা প্রতিক্রিয়া জনিতগতি বলব। আরও কয়েকটা উদাহরণের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াজনিত গতি ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করা যাক কোন দীঘির স্থির জলে একটা নৌকো ভাসছে আর তার ওপরে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা হঠাৎ যদি লাফিয়ে নৌকো ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়ে তা হ'লে নৌকোটাও সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে খানিকটা চলে যাবে। এখানে আমরা লোকটার লাফিয়ে শুধু বাহিরে যাওয়ার কথাই বলেছি, মাটিতে বা জলে পড়ার কথা বলি নি। মনে রাখতে হবে যে নৌকোর উল্টো দিকে চলাটা লোকটার মাটি বা জলের ওপর কোন রকম ঠেলা দেওয়ার জন্য হচ্ছে না, শুধু তার লাফিয়ে পড়ার জন্যই হচ্ছে। ওপরে একটি বিশেষ ধরণের নৌকো দেখানো হয়েছে। নৌকোটা জলে ভাসছে না, চাকার সাহায্যে দুটো অনুভূমিক রেল লাইনের ওপর চলবে। এর মাঝে নৌকোটা পাথর দিয়ে বোঝাই করে রেখেছে আর নৌকোর পেছনের দিকে মুখ করে একটার পর একটা পাথর লাইনের সমান্তরাল ভাবে ছুঁড়ে চলেছে। প্রতিটি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা সামনের দিকে চলতে থাকবে। প্রথম কিছুটা সময় অবশ্য গতিবেগ খুবই কম হবে, কিন্তু ক্রমেই নৌকাটা হালকা হয়ে যাবে আর (অবশ্য লোকটি যদি ক্লান্ত না হয়ে পড়ে) তার বেগ দ্রুততর হবে। বাইরের জলবাতাস বা ডাঙার কোন সাহায্য না নিয়েই এই নৌকোর চলা সম্ভব হয়েছে। ঠিক একই মূলনীতি অনুসরণ করে মহাশূন্য যাত্রী ব্যোমযানটিকে চলতে হবে। তার রকেট

মোটরের ভেতর থেকে প্রচণ্ডবেগে গ্যাস বেরিয়ে আসবে আর তারই প্রতিক্রিয়ার ঠেলায় ব্যোমজানটি ওপরের দিকে উঠতে থাকবে। বাইরের বাতাস বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর না করেই ব্যোমজানটি চলতে পারবে।

মহাশূন্য যাত্রী ব্যোমযানটিতে কিন্তু বারুদের রকেট মোটর ব্যবহার করা চলবে না। বারুদ পুড়ে যে গ্যাস তৈরী হয় তার চাপ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় রকেটটি খুব মজবুত ভাবে তৈরী করতে হবে আর ফলে রকেটটি ভারী হয়ে যাবে। তাছাড়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বারুদটা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে এবং এই পোড়ার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। মহাকালে যাত্রার জন্য রকেট মোটরটি অনেক সময় ধরে চালু থাকতে সমর্থ হওয়া এবং প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ, বন্ধ বা চালু করতে পারা দরকার। এই সবের জন্য মহাশূন্য যাত্রী রকেটে আজকাল তরল জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। চিত্রে একটা তরল জ্বালানির রকেট দেখানো হয়েছে। ওপর থেকে আরম্ভ করলে প্রথমেই যে অংশটি দেখানো হয়েছে সেখানে যাত্রীরা ও তাদের মালপত্র থাকবে। কোন একটা বিশেষ দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হ'লে এই অংশটির ওজনের ওপরেই সমস্ত রকেটটির ওজন, আয়তন ও গঠন এবং জ্বালানির পরিমাণ নির্ভর করে। এর পরের অংশটি রকেটের চলার ও অন্যান্য প্রয়োজনের যন্ত্রপাতি রাখার জন্য নির্দিষ্ট। রকেটের ভেতরকার অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে দুটি আধার। এদের একটির ভেতর তরল অক্সিজেন বা অন্য কোন অক্সিজেনের যোগানদার (যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড্, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড্ ইত্যাদি) এবং আর একটির ভেতর গ্যাসোলিন, অ্যাল্‌কোহল, হাইড্রোজিন, ডাইবোরেন জাতীয় কোন একটা জ্বালানি থাকবে। এই আধারগুলি থেকে দুটি পাম্পের সাহায্যে ভাল্‌ভের ভেতর দিয়ে তরল পদার্থ দুটি উচ্চচাপে দহণ কামরায় নিয়ে যাওয়া হবে। পাম্প দুটি টারবাইনের সাহায্যে চলবে। সোডিয়াম পারমঙ্গানেটের সহায়তায় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড্ থেকে অত্যুত্তপ্ত বাষ্প ও অক্সিজেন তৈরী করে তা দিয়েই টারবাইনটি ঘোরানো হয়। ছবিতে মাত্র চারটি ভাল্‌ভ্ দেখানো হয়েছে। আসলে কিন্তু তরল জ্বালানি ও অক্সিজেনের দহন কামরায় আসার পথে, বাষ্প ও অক্সিজেনের টারবাইনে ঢোকার পথে ও অন্যান্য বহু জায়গায় অনেকগুলি ভাল্‌ভ্ থাকে আর এদেরই সাহায্যে দহন কামরায় জ্বালানির যোগান বন্ধ করা, ধীরে বা দ্রুত জ্বালানির যোগান দেওয়া ইত্যাদি কাজ করা যায়। পাম্পের পর থেকে দহন কামরায় যাবার পথে কতকগুলি ইঞ্জেক্টার রয়েছে। এরা তরল পদার্থ দুটিকে স্প্রে করে দহন কামরায় ছড়িয়ে দেয়। সেখানে তারা মিশ্রিত হয় এবং আগুন জ্বালানোর একটা কোন ব্যবস্থার সাহায্যে তরল জ্বালানি পুড়তে আরম্ভ করে। পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ চাপের গ্যাস তৈরী হয় ও তা প্রচণ্ডবেগে নীচের খোলা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। নিউটন কথিত প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় রকেটটা এবার ওপর দিকে উঠতে থাকবে। (দহন কামরার ভেতরে উৎপন্ন গ্যাসের তাপ ও চাপ খুবই বেশী হওয়ায় কামরাটি ফেটে ও গলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য কামরাটি ঠাণ্ডা করার বহুবিধ আয়োজন রাখতে হয়।)

তরল জ্বালানির রকেটের বর্ণনা থেকে একটা জিনিষ বোঝা গেল যে প্রয়োজন মত দহন কামরায় জ্বালানির যোগান বাড়ানো কমানো বা বন্ধ করা চলবে। ফলে মহাশূন্যে চলার পথে রকেটের গতিবেগ বাড়ানো কমানো বা তার মোটরটি বন্ধ করা সম্ভব হবে। দরকার মত রকেটের গতিপথ বদলানোর জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। রকেটের নীচের খোলামুখ দিয়ে যেখানে বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসছে সেখানে স্বয়ংক্রিয় হাল লাগিয়ে রকেটের গতিমুখ ফেরানোর ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায়।

রকেটে গ্যাসোলিন জাতীয় যে সব তরল জ্বালানি ব্যবহার করার কথা বলেছি সেগুলি পুড়লে উত্তপ্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। পোড়ানোর জন্য যে অক্সিজেন দরকার সেটি তরল অক্সিজেন, নাইট্রিক অ্যাসিড্ প্রভৃতি জিনিষ থেকে পাওয়া যাবে। উত্তপ্ত গ্যাস দহন কামরা থেকে যে বেগে বেরিয়ে আসে তার নাম দেওয়া যেতে পারে নির্গম বেগ। এই নির্গম বেগ যত বেশী হবে রকেটের বেগ ততই বেশী করা সম্ভব হবে। এখন পর্যন্ত যে সব তরল জ্বালানি ও অক্সিজেনের যোগানদার ব্যবহৃত হয়েছে তাতে করে সেকেণ্ডে প্রায় দেড় মাইলের মত নির্গম বেগ পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে ইহা বাড়ানো গেলেও সেকেণ্ডে তিন মাইলের বেশী করা যাবে বলে মনে হয় না (বর্তমানে রাশিয়ান ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত রকেট মহাশূন্যে পাঠিয়েছেন তাতে কি ধরণের জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে এবং নির্গম বেগ কি রকম পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমরা এখনও পাই নি)। পরমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারলে অবশ্য নির্গম বেগ অনেক বেশী বাড়ানো যাবে। তবে এই প্রবন্ধে আমরা পরমাণবিক শক্তি চালিত রকেটের আলোচনা বাদ দিচ্ছি।

পরের চিত্রে একটি একধাপের রকেটের চলার পথ দেখানো হয়েছে। মোটর চালু হওয়ার পর রকেটটি গোড়ায় সোজা ওপর দিকে উঠবে। ক পর্যন্ত ওঠার পর রকেটের গতিমুখ স্বয়ংক্রিয় হালের সাহায্যে একটুখানি বেঁকে যাবে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে কুড়ি মাইল উঁচুতে অবস্থিত খ চিহ্নিত স্থানে এসে রকেটের মোটরটি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে রকেটটি প্রচণ্ড গতিবেগ সংগ্রহ করেছে। আমরা আগে পাথর ছোঁড়ার উদাহরণে যে প্রাথমিক বেগের কথা উল্লেখ করেছি, খ থেকে রকেটের বাকী পথটুকু সেই প্রাথমিক বেগ সম্পন্ন নিক্ষিপ্ত বস্তুর পথের মত হবে। এই ছবির রকেটটি প্রায় পঞ্চাশ মাইল উঁচুতে উঠেছে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরাল দিকে ১৪০ মাইলেরও বেশী দূরে গিয়ে পড়বে। এই রকেটটি খুব কম উঁচুতে উঠলেও এর চলার পথটি বিশ্লেষণ করে দেখলে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হবে। রকেটটি চলার সময় গোড়ার দিকে অল্প সময়ের জন্যই মোটরটি চালু রাখার দরকার হয়। সেই সময়ের মধ্যেই সে প্রচণ্ড গতিবেগ অর্জন করে (এক্ষেত্রে ত্বরণ কিন্তু কামান থেকে নিক্ষিপ্ত যানের তুলনায় অনেক কম) এবং বাকী পথটা এই গতিবেগের সাহায্যে চলতে থাকে (পথে হঠাৎ কোন প্রয়োজন হ'লে একটুক্ষণের জন্য মোটরটি চালু করা যেতে পারে)। মাধ্যাকর্ষণের মাশুল দিতে দিতে অবশ্য গতিবেগ ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসবে। মাধ্যাকর্ষণের মাশুল সব দিয়েও রকেটটা যদি চন্দ্রের আকর্ষণের ক্ষেত্রে পড়ে তবেই সেটা চন্দ্রে পৌছাতে পারবে। মনুষ্যবাহী যান হ'লে কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণের তীব্রতা এড়াইবার জন্য রকেটের মোটরটি আবার উল্টো দিকে চালু করতে হবে।

একটা রকেট কত উঁচুতে উঠবে সেটা নির্ভর করছে মোটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় তার বেগ কত ছিল তার ওপর। মাধ্যাকর্ষণ ও বাতাসের ঘর্ষণের কথা বাদ দিলে এই বেগ আবার দুটো জিনিষের ওপর নির্ভর করে। প্রথম হ'ল দহন কামরায় উৎপন্ন গ্যাসের নির্গম বেগ আর দ্বিতীয়টি হ'ল সমস্ত রকেটের গোড়াকার ভর আর মোটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় তার ভরের অনুপাত। একটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। মনে করা যাক একটা রকেটের গোড়ার ভর ছিল ১২ টন। মোটর যতক্ষণ চালু থাকবে ততক্ষণ অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বালানি পুড়ে গ্যাস হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ রকেটের ভর কমে যেতে থাকবে। ধরা যাক মোটর বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত ৯ টন জ্বালানি ও তরল অক্সিজেন খরচ হওয়ায় রকেটটির ভর কমে গিয়ে ৩ টনে দাঁড়ালো। ১২ আর ৩ এর অনুপাত চারকেই এক্ষেত্রে রকেটের ভরানুপাত বলব। মোটরে উৎপন্ন গ্যাসের নির্গম বেগ সেকেণ্ডে ৮০০০ ফুট (দেড় মাইল) হ'লে মোটর বন্ধ হওয়ার পর রকেটটির গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ১১০৯০ ফুট (দু' মাইলের কিছু বেশী)। এই বেগ পৃথিবী পৃষ্ঠের চক্রবেগ বা নিষ্ক্রমণ বেগের তুলনায় অনেক কম কাজেই

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি বা চন্দ্রে পৌছানো এ দুইটার কোন কাজই এ দিয়ে হবে না। রকেটের গতিবেগ বাড়াতে হ'লে আমরা দু'ভাবে চেষ্টা করতে পারি। প্রথমতঃ ভরানুপাত বাড়িয়ে। রকেটের ভর যদি গোড়ায় ১৮ টন থাকে এবং মোটর বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত যদি ১৫ টন জ্বালানি ও তরল অক্সিজেন ব্যয়িত হয় তা হ'লেও শেষ সময় রকেটের ভর ৩ টনই রইলো। কিন্তু এবার ভরানুপাত বেড়ে হ'ল ছয়। নির্গম বেগ আগের মত সেকেণ্ডে ৮০০০ ফুট থাকলেও বেশী জ্বালানি পোড়ার জন্য এবার মোটর বন্ধ হওয়ার সময় রকেটের গতিবেগ বেড়ে সেকেণ্ডে ১৪৩৩৪ ফুট (প্রায় তিন মাইল) হবে। এই ভাবে ভরানুপাত বাড়িয়ে রকেটের গতিবেগ বাড়ানো যেতে পারে। ভরানুপাত অপরিবর্তিত রেখে নির্গম বেগ বাড়িয়েও রকেটের গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব। আমাদের চার ভরানুপাতের রকেটটির মোটরে উৎপন্ন গ্যাসের নির্গম বেগ যদি সেকেণ্ডে ১০০০০ ফুট (প্রায় দু'মাইল) হয় তা হ'লে মোটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় তার গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ১৩৮৬৩ ফুট (আড়াই মাইলের কিছু বেশী)।

আগেই বলা হয়েছে যে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করলে নির্গমবেগ সেকেণ্ডে তিনমাইলের বেশী করার আশা করা যায় না। রকেটটি ও তার বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় কলাকৌশল বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন একটি মাত্র রকেটের ক্ষেত্রে দশের বেশী ভরানুপাত করা সম্ভব নয়। দশ ভরানুপাত ও সেকেণ্ডে তিন মাইল নির্গম বেগের একটি রকেটের মোটর বন্ধ হওয়ার সময় গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ৬·৯ মাইল। মাধ্যাকর্ষণ ও বাতাসের বাধার কথা হিসেবের মধ্যে আনলে এর প্রকৃত গতিবেগ আরও কম হবে। এই গতিবেগ চক্রবেগকে ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু নিষ্ক্রমণ-বেগের চেয়ে এ খানিকটা কম কাজেই চন্দ্রলোক যাত্রা বা গ্রহান্তরে ভ্রমণ এরকম রকেটের দ্বারা সম্ভব নয়।

এই অসুবিধের প্রতিকার তিনভাবে হ'তে পারে। প্রথম, পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার যার সাহায্যে নির্গম-বেগ অনেকগুণ বাড়ানো যায়। দ্বিতীয়, রকেট চলার পথে কোন উপায়ে নতুন করে জ্বালানি ও তরল অক্সিজেন ভরে নেওয়া আর তৃতীয় হ'ল বহুধাপ রকেটের সাহায্য নেওয়া। এই প্রবন্ধে আমরা বহুধাপ-রকেটের বিষয়টিই আলোচনা করব। উইলিনের দেওয়া একটি উদাহরণের সাহায্যে বহুধাপ-রকেটের মূল নীতিটি পরিষ্কারভাবে বোঝানো যেতে পারে। মনে করা যাক আমরা এমন একটি রকেট তৈরী করেছি যার মোটভর ১০০০ পাউণ্ড। এর মধ্যে ৯০০ পাউণ্ড হ'ল জ্বালানি (এর পর থেকে আমরা জ্বালানি বলতে প্রকৃত জ্বালানি ও অক্সিজেনের যোগানদার দুটো তরল পদার্থকেই বুঝব) এবং ১০০ পাউণ্ড রকেটের খোলস, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ভর। জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে রকেটের মোটরটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। দশ ভরানুপাতের এই রকেটটির নির্গম-বেগ ধরা যাক সেকেণ্ডে ১০০০০ ফুট (প্রায় দু' মাইল)। এরকম রকেটের মোটরটি বন্ধ হয়ে গেলে তার গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ২৩০২৬ ফুট (প্রায় সারে চার মাইল)। এবার একটি রকেটের বদলে পরস্পর জোড় দেওয়া দুটি রকেটের কথা চিন্তা করি। প্রথমটির ভর ৮০০ পাউণ্ড এবং এতে ৭২০ পাউণ্ড জ্বালানি রয়েছে; দ্বিতীয়টির মোট ভর ও জ্বালানির ভর হ'ল যথাক্রমে ২০০ ও ১৮০ পাউণ্ড। দুটি রকেট এক সঙ্গে ধরলে সেই ভর ও জ্বালানির ভর আগের মত ১০০০ পাউণ্ড ও ৯০০ পাউণ্ডই রইলো। রকেট দুটির মধ্যে বড়টি নীচে থাকবে এবং তার মোটরটিই প্রথমে চালু করা হবে। এই রকেটটিকে জ্বালানি ছাড়া নিজের ৮০ পাউণ্ড ও ছোট রকেটটির ২০০ পাউণ্ড, মোট ২৮০ পাউণ্ড বাড়তি জিনিষ বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভরানুপাত দাঁড়াচ্ছে ১০০০ : ২৮০ = ২৫ : ৭। ৭২০ পাউণ্ড জ্বালানি পোড়ার পর রকেটটির গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ১২৭২৯ ফুট (আড়াই মাইলের কিছু কম)। এই গতিবেগ আগের রকেটের শেষ গতিবেগের থেকে

স্বভাবতঃই কম। এখন প্রথম রকেটের জ্বালানি সবটা পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তার খোলসটা ও যন্ত্রপাতি (যাদের ভর ৮০ পাউণ্ড) দ্বিতীয় রকেট থেকে খসে যায় এবং দ্বিতীয় রকেটটির মোটর যদি সঙ্গে সঙ্গে চালু হয় তাহ'লে গতিবেগ মোট কতটা বাড়বে? দ্বিতীয় রকেটটির ভরানুপাত হ'ল দশ কাজেই এর ১৮০ পাউণ্ড জ্বালানি পুড়ে গেলে পর এর গতিবেগ সেকেণ্ডে ২৩০২৬ ফুট বেড়ে যাবে, দ্বিতীয় রকেটটি চালু হওয়ার সময় তার গতিবেগ ছিল ১২৭২৯ ফুট। অতএব রকেটটির মোটর বন্ধ হওয়ার সময় তার গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ২৩০২৬+১২৭২৯=৩৫৭৫৫ ফুট (প্রায় সাত মাইল)। দেখা যাচ্ছে রকেটের ধাপ বাড়িয়ে তার গতিবেগ অনেকখানি বাড়ানো যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সেকেণ্ডে ১০০০০ ফুট নির্গম বেগের একটিমাত্র রকেটের পক্ষে এতখানি গতিবেগ সংগ্রহ করতে হলে ভরানুপাত তেত্রিশেরও বেশী হ'তে হ'ত। এত বেশী ভরানুপাতের রকেট নির্মাণ করা অসম্ভব।

দুইধাপ রকেটের দুটি ধাপেরই নিজস্ব জ্বালানি ও তরল অক্সিজেনের আধার এবং মোটর রয়েছে। অবশ্য মাল ও যাত্রীর আস্তানা হবে ওপরের দ্বিতীয় ধাপটিতে। আগেই বলেছি এরকম রকেট ছাড়ার সময় প্রথমে নীচের প্রথম ধাপটির মোটর চালু করা হয়। রকেটটা উঁচুতে উঠতে থাকে এবং তার গতিবেগও বাড়তে থাকে। প্রথম ধাপটির জ্বালানি সব শেষ হয়ে গেলে এটি খসে যায় এবং প্যারাশুটের সাহায্যে মাটিতে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেটের মোটরটি চালু হয়। প্রথম রকেটটির খোলস ও যন্ত্রপাতির অপ্রয়োজনীয় ভরের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এর বেগ দ্রুত বেড়ে চলে এবং গোড়াতেই খানিকটা বেগ থাকার দরুণ জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার সময় তার গতিবেগ অনেক বেশী হয়ে যায়। চিত্রটি দেখলে একটি দুইধাপ রকেট কিভাবে চলে তা বোঝা যাবে।

রকেটের ধাপ আরও বাড়িয়ে তার গতিবেগ অনেক বেশী বাড়ানো যেতে পারে। গঠনকার্য্যের নানাবিধ অসুবিধের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত রকেটগুলিতে তিনের বেশী ধাপ করা যায় নি। অবশ্য এই তিনধাপের রকেটের সাহায্যেই কৃত্রিম উপগ্রহ-গ্রহগুলি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে ধাপের সংখ্যা বাড়িয়ে ও নির্গম বেগ বাড়িয়ে রকেটের গতিবেগ অনেক উন্নত করার আশা বিজ্ঞানীরা করেন।

মহাশূন্যে অভিযানের যে প্রাথমিক সমস্যাগুলোর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম তাদের সব কটিরই সমাধান তরল জ্বালানির রকেটের সাহায্যে করা যাবে। বহুধাপ-রকেট, উন্নততর নির্গম বেগ, পরিমাণবিক শক্তির ব্যবহার, পথিমধ্যে নতুন করে জ্বালানি ভরে নেওয়া এই সব পদ্ধতির সহায়তায় নিষ্ক্রমণ বেগ বা তার চেয়ে অনেক বেশী গতিবেগ মহাশূন্য যাত্রী যানটি সংগ্রহ করতে পারবে। রকেটের গতিবেগ আস্তে আস্তে বাড়বে কাজেই যাত্রীদের ওপর চাপ অপেক্ষাকৃত কম পড়বে। নীচের ঘন বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় রকেটটির বেগ কম থাকার দরুণ বাতাসের বাধা ও ঘর্ষণ জনিত উত্তাপও বেশী হ'তে পারবে না। দহন কামরায় তরল জ্বালানির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে রকেটের গতিবেগ বাড়ানো কমানো চলবে। নির্গত গ্যাসের মাঝখানে স্বয়ংক্রিয় হাল লাগিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে যানটির গতিপথ বদলানো যাবে। চন্দ্রে বা গ্রহান্তরে পৌছাবার সময় রকেটের মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মোটর আবার চালু করে দেওয়া হবে। তা হ'লেই যানটি ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারবে, মাধ্যাকর্ষণের টানে গিয়ে আছড়ে পড়ার ভয় থাকবে না।

চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তর যাত্রা তথা মহাশূন্যে অভিযানের প্রশ্নটির মধ্যে বিজ্ঞানের যে মূলনীতিগুলি জড়িত রয়েছে সেগুলি খুবই সরল। কিন্তু বহুধাপ রকেট ও মহাশূন্যযাত্রী ব্যোমযান নির্মাণের ব্যবহারিক দিকটা অপেক্ষাকৃত জটিল। বর্তমানে একমাত্র প্রভূত সম্পদশালী ও কারিগরি বিদ্যায় নিপুণ দেশগুলিই এ দিকটা আয়ত্ত করতে পেরেছে। ভরসা করি ভারতবর্ষও শীঘ্রই তা আয়ত্ত করবে এবং বিজ্ঞানের এই সর্বাধুনিক ফসলকে মানবকল্যানে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবে।

চন্দ্রে অভিযান

(২য় পর্য্যায়)

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

আজ থেকে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক্ নিউটন্ একদিন সন্ধ্যাবেলায় আপেল ফলকে মাটিতে পড়তে দেখে চিন্তা করতে লাগলেন—ফলটি মাটিতেই পড়ল কেন? নিশ্চয়ই পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করছে। পৃথিবীই যদি আকর্ষণ করে তবে অপর বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে নাই বা কেন? এই থেকে "মহাকর্ষ" আবিষ্কার হ'ল। বিজ্ঞানীরা শুধু কাল্পনিক চিন্তাধারার পক্ষপাতী নন, তাঁরা বাস্তববাদী। তাই বাস্তবক্ষেত্রে এই আকর্ষণের পরিমাণ তাঁরা মাপ্‌লেন। এর পরিমাণ উপলব্ধি করবার জন্যে একটা উদাহরণ গ্রহণ করা যাক্। দুটো ছোট ছোট নয়া পয়সা এক সেন্টিমিটার দূরে রাখা হ'ল। এবার নয়া পয়সা দুটি পরস্পরকে কত জোরে আকর্ষণ করবে জানেন? পৃথিবী এদের যত জোরে আকর্ষণ করছে তার একশো'কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ।

মহাকর্ষ-জনিত পৃথিবীর আকর্ষণকে "অভিকর্ষ-বল" আখ্যা দেওয়া হয়। যদি কোন বস্তুতে বলপ্রয়োগ করা হয় তবে তার গতিবেগের পরিবর্ত্তন ঘটে। অথবা, বিতরীতভাবে বলা যায় যে গতিবেগের পরিবর্ত্তন ঘটলে বোঝা যায় বস্তুটি কোন্ বল প্রযুক্ত হ'য়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক্, আমি এই খড়িটিকে টেবিলের উপর নির্দ্দিষ্ট গতিবেগ দিয়ে ছিড়ে দিলাম। খড়িটির গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে শূন্য গতিবেগ হ'য়ে গেল এবং নিশ্চল হ'য়ে গেল অর্থাৎ থেমে গেল। এই গতিবেগ পরিবর্ত্তনে বোঝা গেল নিশ্চয়ই খড়িটির উপর কোন বল প্রযুক্ত হ'য়েছে। খড়িটির, টেবিলের কাঠের সঙ্গে ঘর্ষণ হচ্ছে এবং বাতাসের সঙ্গেও খুব সামান্য ঘর্ষণ হচ্ছে। এই ঘর্ষণ-জনিত বল খড়িটির গতিবেগকে ক্রমশঃ মন্দীভূত করে এনে একেবারে নিশ্চল করে দিচ্ছে। এই গতিবেগের যে হারে পরিবর্ত্তন হয় তাকে ত্বরণ বা acceleration বলে। অভিকর্ষ-বল পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে যে ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাতে যদি কোন বস্তু পড়তে থাকে, তবে প্রতি সেকেণ্ডে তার গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করে। আমাদের চাঁদে পৌছুতে হ'লে পৃথিবীর এই অভিকর্ষ-বল থেকে মুক্তি পেতে হ'বে অর্থাৎ এক কথায় মা বসুমতীর নাড়ীর টানের মায়া কাটাতে হ'বে।

একটা ঢিল সোজা খাড়াই মাটির উপর লম্বভাবে ছুঁড়ে দিলে প্রথমে তার গতিবেগ হ্রাস পেতে থাকে, পরে গতিবেগ একেবারে মানশূন্য হয় এবং পুনরায় পৃথিবীর দিকে ফিরতে থাকে ও গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। গতিবেগ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ—পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের প্রভাব ঢিলটির উপর বিস্তারিত হচ্ছে। কিন্তু ঢিলটিকে কোনাকুনিভাবে ছুঁড়লে তার দু'রকম গতিবেগ হয়—

(১) একটা হ'ল সম্মুখের দিকে সমান্তরাল গতিবেগ।

(২) আর একটা হ'ল খাড়াই লম্ব গতিবেগ।

প্রথম গতিবেগের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না কারণ ঐদিকে কোনো বল প্রযুক্ত হচ্ছে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ খাড়াই লম্ব গতিবেগ পৃথিবীর আকর্ষণে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে একেবারেই শূন্য হ'য়ে যায়; তখন ঢিলটি সমান্তরাল গতিতে চলে। কিন্তু এই অবস্থাতেও ঢিলটি পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল মুক্ত নয়; সেইজন্যে পুনরায় পৃথিবীর দিকে লম্ব গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। এইভাবে দুই গতিবেগের সমন্বয়ে ঢিলটি আবার মাটিতে ফিরে আসে। এখন প্রশ্ন হ'ল আমরা যদি চাঁদে কিছু

পাঠাতে চাই, তবে তাকে পৃথিবীর উপর থেকে সোজা লম্বভাবে ছাড়ব, না কোনাকুনিভাবে ছাড়ব?

এ প্রশ্নের জাবাবত' আপনারই দিতে পারেন। ছোটবেলায় হাই-জাম্প করবার সময় আপনাদের প্রকৃতি কী রকম ছিল? আপনারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ উঁচুদিকে খাড়াই লাফ দিয়ে "পোল" পেরিয়েছিলেন না বেশ খানিকটা দূর থেকে ছুটে এসে কোনাকুনি লাফ দিয়েছিলেন? শেষেরটাই নিশ্চয় করেছিলেন। আজও পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলে আসছে। এই নিয়মে পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষ-বলকে সহজই অনেকটা কাটান যায়। ঐ কারণেই আমরাও যখন পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষ-বল কাটিয়ে চাঁদে অভিযান করব, তখন এই কোনাকুনি পথই বেছে নেব।

কিন্তু এই কোনাকুনি পথ বেছে নেওয়ার একটু অসুবিধা আছে। যিনি ৬ফুট লাফাতে পারেন তিনি সোজা ৬ ফুট উঠে আবার ৬ ফুট নীচে মাটিতে পড়লে মোট ১২ ফুট বা কিছু বেশী ১৩ ফুট বাতাসের সংস্পর্শে থাকবেন। কিন্তু যদি ৩০ ফুট দৌড়ে এসে লাফান তা' হ'লে অন্ততঃ ৩০ ফুট+১৩ ফুট=১৪ ফুট বাতাসের সংস্পর্শে থাকবেন। শেষোক্তবারে তিনি অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত বাতাসের ঘর্ষণজনিত বাধা অনুভব করবেন। এইজন্যে পৃথিবী থেকে কোনাকুনিভাবে যাত্রা করার সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণজনিত বাধা অধিকক্ষণ ধরে স্থায়ী হ'বে এবং তার ফলে গতিবেগ তুলনামূলক-ভাবে অধিক হ্রাস পাবে।

পৃথিবীর উপরে যে বায়ুমণ্ডল আছে তা ১০-১৫ মাইল পর্য্যন্ত ঘন, তারপর বায়ুস্তর বেশ পাতলা হ'তে হ'তে খুব দূরে একেবারেই বায়ুশূন্য হ'য়ে পড়ে। তাই চন্দ্রে অভিযানকালে প্রথম ১০।১৫ মাইল সোজা লম্বভাবে যাত্রা করতে হ'বে। এতে বায়ুর ঘর্ষণ-জনিত বাধা অল্প হ'বে। এতে জ্বালানীর সাশ্রয় ঘটবে কারণ সমান্তরাল গতি অব্যাহত থাকবে। শুধু পৃথিবীর আকর্ষণের ঝুঁকি কাটিয়ে উপরে উঠতে হ'বে।

একটু পূর্ব্বেই আমরা চাঁদে যাওয়ার পথের কথা আলোচনা করেছি, এখন দেখা যাক্ যাওয়া যায় কিসে করে? এ প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন—রকেটে করে। এই রকেট একটি, দুইটি করে বহু পর্য্যায়ের হ'তে পারে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের দ্বারা তিনি রকেট চলার মূলনীতিও ব্যাখ্যা করেছেন। নিউটনের তৃতীয় সূত্র হ'ল—"প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার একটা সরল উপায় আছে। আপনারা যে বেঞ্চে যেখানে বসে আছেন সেখানেই সোজা হাঁটু-ভাঙ্গা "দ"এর মতন বসুন যেন পিঠ ঊরুর সঙ্গে লম্বভাবে থাকে এবং পা দুখানিও ঊরু দুখানির সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। এবার উঠবার চেষ্টা করুন কিন্তু উঠতে পারবেন না। আপনি যতই চাপ দিন না কেন, সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া তাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। উঠতে গেলে হয় আপনাকে পিঠ বাঁকাতে হ'বে না হয় হাঁটুর সঙ্গে পা বাঁকাতে হ'বে। রকেটের মধ্যে যে দহন-কামরা থাকে তার নীচের দিকে একটা ছিদ্র থাকে, অন্য সব দিকই বন্ধ। কাজেই দহন কামরা থেকে দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থ যখন প্রচণ্ডবেগে ঐ ছিদ্র-পথ দিয়ে নির্গত হ'তে থাকে তখন বিপরীত দিকে তার সমান প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। হাউই-এর খোলে যেমন ছিদ্রটা নীচের দিকে থাকে বলে হাউই খাড়াই উপরদিকে উঠে। রকেটেরও ঠিক ঐ একই অবস্থা। তবে সোরা, গন্ধক, কয়লার পরিবর্ত্তে তরল জ্বালানী ব্যবহার করা হয়।

রকেটের প্রধান অংশ হ'ল রকেট মোটর। রকেট মোটরের-আবার প্রধান অংশ হইল দহন কামরা, এই দহন কামরায় জ্বালানীর দুটি অংশকে (যেমন অ্যালকোহল ও তরল অক্সিজেন) নিয়মিত হারে প্রবেশ করিয়ে দহন করা হয়। দহনের ফলে অসম্ভব উত্তপ্ত হ'য়ে উঠে। ফলে তরল অক্সিজেনের সিলিণ্ডার বা খোল ফেটে যেতে পারে। যদি খুব উষ্ণ হ'য়ে তরল অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়, তবে সেই গ্যাসকে একটি সেফ্‌টি ভাল্‌ভের মধ্যে দিয়ে বার করে দিয়ে বিস্ফোরণ বন্ধ করা হয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও বিস্ফোরণ হ'তে দেখা গেছে। কাজেই রকেট মোটরকে ঠাণ্ডা রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। রকেট মোটরকে ঠাণ্ডা রাখার মোটামুটিভাবে দু'রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১) মটর গাড়ীর ইন্‌জিনকে রেডিয়েটারের মধ্যে জল দিয়ে যে ভাবে ঠাণ্ডা রাখা হয় সেই পদ্ধতিতে এক জাতীয় রকেট মোটরকে ঠাণ্ডা করা হয়।

(২) আর এক ধরণের মোটরের ব্যবহার আছে, তার নাম রিজেনারেটিভ মোটর। এতে তরল জ্বালানী মোটরের দেওয়ালের গা দিয়ে চালিত করা হয়। ফলে মোটরের দহন কামরা ঠাণ্ডা থাকে এবং জ্বালানীও অল্প অল্প করে গ্যাসে পরিণত হয়।

আমি আপনাদের আর একটা ছবি দেখাচ্ছি এটা হ'ল একটি বিশেষ ধরণের রকেট। এতে কি ভাবে বিস্ফোরণ বন্ধ করা হ'য়েছে তা' দেখতে পাবেন। তরল অক্সিজেনের উষ্ণতা হ'ল—১৮৩° সেন্টিগ্রেড্। এইজন্যে উপরের দিকে কুয়াসার মত অল্প অল্প বরফ জমতে দেখা যাচ্ছে। নীচের দিকে অত্যাধিক উত্তাপে সেফ্‌টি ভাল্‌ভের মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন বহির্গত হ'তে দেখা যাচ্ছে।

পরিষ্কার রাত্রে অনেক সময় আমরা একটা তারাকে স্থানচ্যুত হ'য়ে আকাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যেতে দেখি, তারপর সেটা মিলিয়ে যায়। কিন্তু যতদূর পর্য্যন্ত যায় ততদূর পর্য্যন্ত একটা সাদা ধোঁয়ার মত পথের অস্তিত্ব রেখে যায়। এদের আমরা "উল্কাপাত" বলি। পৃথিবীর আকর্ষণে যে সব পদার্থ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তারা বাতাসের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। সেইজন্যে রকেটের খোলও এমন সকল ধাতু সহযোগে প্রস্তুত করা হয় যাতে বায়ুর ঘর্ষণে উত্তপ্ত হ'য়ে গলে না পড়ে।

এখন দেখা যাক্ কৃত্রিম উপগ্রহ কি করে তার কক্ষে স্থাপন করা যায়। প্রথমে বহু পর্য্যায়ের রকেটের মাথায় কৃত্রিম উপগ্রহটিকে রাখা হয়। রকেটের প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলিকে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে কোন খুঁত আছে কিনা দেখা হয়। নিখুঁত প্রমাণিত হ'লে ছাড়বার পূর্ব্বেই তরল জ্বালানী ও তরল অক্সিজেন ভরে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে দহন-ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়। প্রচণ্ডবেগে দহন-কামড়া থেকে গ্যাস নিষ্ক্রামিত হ'বে এবং সঙ্গে সঙ্গেই রকেট প্রচণ্ড গতিবেগ লাভ করবে। ১০।১৫ মাইল খাড়াই লম্বভাবে উঠবার পর কোনাকুনি গতিতে রকেটটিকে চালিত করা হয় এবং উহা ক্রমশঃ বক্রপথ অবলম্বন করে। ইতিমধ্যে একটির পর একটি করে প্রথম, দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রকেটগুলো খসে প্যারাসুটের সাহায্যে নামতে থাকবে। যখন নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে পৌছায় তখন শেষ পর্য্যায়ের রকেটটি সমান্তরাল গতিবেগ অর্জ্জন করে। এই অবস্থায় অভ্যন্তরের উপগ্রহটিকে ঠেলে বার করে দেয় এবং উপগ্রহটিকে প্রথম নভোচারণ বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৫ মাইল বা ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে চক্রাকারে বা উপবৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক যে পৃথিবী যে দিকে আবর্ত্তন করে রকেটটিও সেইদিকে হেলে চলে। এতে পৃথিবীর গতিবেগ রকেটটির গতিবেগকে সেকেণ্ডে ০·৩ মাইল হারে বর্দ্ধিত করে দেয়।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে গাড়ীর চাকা যখন আবর্ত্তন করে তখন তার থেকে কাদা ছিট্‌কে বহির্ভাগে পড়ে। যে বলের সাহায্যে বাহিরে ছিট্‌কে যায় তাকে আমরা "অপকেন্দ্র-বল" বলি। বাসে বা মোটরে আরোহণ করে যখন কোন রাস্তার মোড় ঘুরি তখন আমাদের দেহটাঅন্যদিকে ঝুঁকে পড়ে। এই ঝুঁকে পড়ার কারণ হ'ল "অপকেন্দ্র বল"। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে উপগ্রহের আবর্ত্তনের ফলে যে অপকেন্দ্র বলের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ঠিক পৃথিবীর টান বা অভিকর্ষ-বলের সমান। কাজেই এই দুইটি বল সমান ও বিপরীতধর্ম্মী হওয়ায় উপগ্রহের উপর কার্য্যকরী হয় না। কেবল অনন্তকালের জন্যে আবর্ত্তন করতে থাকে, অবশ্য যদি বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধা না থাকে। উপগ্রহের এই গতি সূতায় বাঁধা ঢিলের ঘুরপাক খাওয়ার

মতই। ঢিলের উপর অপকেন্দ্র বল সুতার টান নিষ্ক্রিয় করছে। ঠিক তেমনি উপগ্রহের অপকেন্দ্র বল পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষ-বলকে নিষ্ক্রিয় করছে। এইভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা হয়।

মহাশূণ্যে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে তার মোট সংখ্যা হইল ছয়টি। আপনাদের নিকট আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিচ্ছি—

(১)	প্রথম	কৃত্রিম উপগ্রহ	**রাশিয়ানরা**	নিক্ষেপ	করেন	১০ই অক্টোবর, ১৯৫৭।
(২)	দ্বিতীয়	,, ,,	,,	,,	,,	৩রা নভেম্বর, ১৯৫৭।
(৩)	তৃতীয়	,, ,,	**আমেরিকানরা**	,,	,,	৩১ জানুয়ারী, ১৯৫৮।
(৪)	চতুর্থ	,, ,,	,,	,,	,,	১৭ই মার্চ্চ, ১৯৫৮।
(৫)	পঞ্চম	,, ,,	,,	,,	,,	২৬শে মার্চ্চ, ১৯৫৮।
(৬)	ষষ্ঠ	,, ,,	**রাশিয়ানরা**	,,	,,	১৫ই মে, ১৯৫৮।

মহাশূণ্যের যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের জন্য উপরোক্ত কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রেরণ করা হ'য়েছিল।

এ ছাড়া আরও দুটি কৃত্রিম গ্রহ সাফল্যের সঙ্গে ছাড়া হ'য়েছে, এরা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে। একটি ছেড়েছেন রাশিয়ানরা, অপরটি ছেড়েছেন আমেরিকানরা। সর্ব্বসমেত আটটি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন সরাসরি এক ধাপে চন্দ্রে ভ্রমণ না করে মাঝ-পথে একটা ষ্টেশন করা হ'বে। সেখানে সমস্ত মালপত্র, সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখা হ'বে অর্থাৎ এক কথায় সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর এক বিরাট ল্যাবরেটারী নির্ম্মাণ করা হ'বে। এর নাম দেওয়া হ'য়েছে space station. সেখান থেকে জ্বালানী ভর্ত্তি করে আকাশ-যানে করে আমরা চন্দ্রে পাড়ি দেব।

যদি কৃত্রিম উপগ্রহে কোন প্রাণী থাকে তবে তার ভার বা ওজন কি হ'বে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। আমাদের দেহটা যখন কোন কিছুতে বাধা পায় তখনই আমরা দেহের ভার বোধ করি। মাটির উপর যখন আমরা দাঁড়াই পৃথিবী তখন আমাদের আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্ষণকে এড়াবার জন্যে আমরা বাধা দিই। এই বাধা দেওয়ার ফলেই আমরা দেহের ওজন উপলব্ধি করি। আপনারা ত' সকলেই লিফ্‌টে চড়েছেন। নামবার সময় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মনে হয় যেন ওজন বা ভার কমে গেছে। কারণ লিফ্‌টের পতনশীল অবস্থায় আমরা কম বাধা দিই; তাই কম ওজন অনুভব করি। যদি লিফ্‌টটি এক সেকেণ্ডে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফিট এই ত্বরণে বা acceleration এ অবাধে নামতে থাকে, তবে লিফ্‌টের অভ্যন্তরের কোন বস্তুর উপর কারোর কোন চাপ পড়বে না এবং প্রত্যেকেই ভার-শূন্য বা ওজন-শূন্য বোধ করবে। এমন কি এই লিফ্‌টের মধ্যে আপনারা যদি হাতের মুঠোর মধ্যে রুমাল নিয়ে বসে থাকেন এবং হঠাৎ যদি মুঠো খোলেন, হাতের রুমাল হাতেই থাকবে, লিফ্‌টের মেঝেতে পড়বে না। এর কারণ রুমালের আর কোন ভার বা ওজন নেই। পাটাতনের উপর থেকে জলে ঝাঁপ দিলে, পতনশীল অবস্থায় আমরা দেহের কোন ভার বোধ করি না। যদি দু' পকেটে দশ সের দশ সের দু'খানা বাটখারা নিয়ে সাঁতারু যদি পাটাতন থেকে লাফ দেয়, তা হ'লে সাঁতারুর পকেটে যে ভারী জিনিষ আছে তা' সে একেবারেই টের পাবে না। বৈমানিক যখন প্যারাসুট নিয়ে লাফ দেয়, প্যারাসুট খুলবার আগে ভারশূন্য বোধ করে। কৃত্রিম উপগ্রহ নিউটনের প্রথম সূত্র জাড্যের নিয়মে নিজস্ব গতিবেগে ক্রমাগত আবর্ত্তন করছে। কাজেই এর মধ্যে কোন মানুষ বা প্রাণী থাকে তবে তার মনে হ'বে তার দেহের কোন ভার নেই।

১৯৫৬ সালে সপ্তম আন্তর্জাতিক নভোচারণ বিদ্যাবিষয়ক অধিবেশনে মার্কিন-বিজ্ঞানী Dr. S. J.

Gerathewohl মানুষের ভার-শূন্য অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। এই ভারশূন্য অবস্থার প্রভাব ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভর করে। কয়েক জনের বমির উদ্রেক হয় এবং কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। তবে রক্ত চলাচলে কোন দোষ থাকে না। মোটের উপর তাঁর মত হ'ল—আরও গবেষণা বা পরীক্ষা না করে কোন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়। এই ভার-শূন্য অবস্থায় ৬০ থেকে ৭০ মাইল উর্দ্ধে ইঁদুর, বাঁদর, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীকে পাঠিয়ে রুশ-বিজ্ঞানী এ ভি প্রকোভ্‌স্কি (A. V. Prokovsky) পরীক্ষা করে দেখেছেন। সকলেরই হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্ত চলাচল সাধারণভাবে হ'তে দেখা গেছে। যদিও ভারশূন্য অবস্থায় বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা' হ'লেও মোটামুটিভাবে ভয়াবহ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আপনারা সকলেই জানেন যে দ্বিতীয় স্ফুটনিকে "লাইকা" নামে একটি কুকুর প্রেরণ করা হ'য়েছিল। এই কুকুরটি যতদিন কৃত্রিম উপগ্রহে ছিল তার ভার-শূন্য অবস্থায় শারীরিক কোন ক্ষতি হয় নি। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে পৃথিবীতে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি।

ভারশূন্য অবস্থায় কঠিন ও তরল বস্তু খাওয়ার কোন অসুবিধা হ'বে না। কারণ মাংসপেশীর সঙ্কোচনের ফলেই আমরা গলাধকরণ করি। পা দুটো উপর দিকে করে মাথাটা নীচে রেখেও তরল বস্তু পান করা যায়, কোন অসুবিধা হয় না। অসুবিধা হ'ল শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারটা নিয়ে। বৈমানিক যখন প্যারাসুট নিয়ে লাফায় তখন তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার একটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি জাগে। কিন্তু মহাশূন্যে যখন অনেকক্ষণ ধরে ভারশূন্য অবস্থায় থাকবে তখন অধিকক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়; কাজেই কৃত্রিম শ্বাস-কার্য্য চালাবার যন্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন হ'তে পারে।

সবচেয়ে বড় অসুবিধা খাওয়া-দাওয়ার খুটিনাটি কয়েকটি ব্যাপারে। যদি কেউ পাত্র থেকে জল ঢালে, এক ফোঁটাও জল পড়বে না। কারণ ভার-শূন্য অবস্থা, অপকেন্দ্র-বল অভিকর্ষ-বলকে নিষ্ক্রিয় করেছে। Syringe বা পাম্পের সাহায্যে জল বের করে নিতে হ'বে। ডিসে পাম্প করে জল ঢাল্‌লেন, পরে উল্টে জল ফেলার চেষ্টা কর্‌লেন; কিন্তু জল পড়বে না, কারণ অভিকর্ষ নেই। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম অভিকর্ষ সৃষ্টি করার এক পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছেন এবং ভবিষ্যতে Space station এ এই কৃত্রিম অভিকর্ষের দ্বারা ভার-শূন্য অবস্থার এই সব অসুবিধা অনেকটা লাঘব হ'বে। এ বিষয়ে আমার পরবর্ত্তী বক্তা আপনাদের কাছে বিষদ্‌ভাবে বুঝিয়ে বল্‌বেন।

এখন দেখা যাক চাঁদে যাওযার আকাশ যান বা Space-ship কি ধরণের হ'বে? প্রথমতঃ যে প্রকোষ্টে মানুষ বা প্রাণী থাকবে তার মধ্যে কৃত্রিম বাতাস থাকা প্রয়োজন, অথবা অক্সিজেন সিলিণ্ডারের সাহায্যে শ্বাস্ব-কার্য্য চালাতে হ'বে। কারণ ভূপৃষ্ঠের ৫০।৬০ মাইল উপরে বাতাস খুবই পাতলা এবং আরও দূরে বাতাস নেই বললেও চলে। এই হেতু শ্বাস-কার্য্যের জন্য এই ব্যবস্থাই চাই।

আকাশ-যান তার যাত্রা আরম্ভ করলে প্রথমে তার গতিবেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এর ফলে যাত্রীদের একটা বাড়তি চাপ সহ্য করতে হ'বে। লিফ্‌টে করে উপরে উঠবার সময় আমরা বাড়তি চাপ অনুভব করি এবং এর ফলে মনে হয় আমাদের ওজন বেড়ে গেছে। ট্রেণে করে যাতায়াতের সময় গতিবেগ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে আমরা চাপ কম বেশী অনুভব করি। ষ্টেশন ছেড়ে যখন ট্রেণের গতিবেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন মনে হয় পেছনের দিকে বা উল্টোদিকে চাপ পড়ছে। আকাশ-যানে এই বাড়তি চাপ কতখানি রাখা চলবে তা নির্ভর করে মানুষের সহ্য-ক্ষমতার উপরে। আকাশ-যানের ত্বরণ বা acceleration যদি পৃথিবীর ত্বরণের ৪।৫ গুণ বেশী হয়, তা হ'লে মহাশূন্যে পাড়ি দেবার বেগ অর্জ্জন করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে এই বড়তি চাপ ৬ থেকে ১০গুণের বেশী করা

কোন সময়েই চলবে না। মানুষের শরীর ত্বরণযুক্ত বেগ কতখানি সহ্য করতে পারে তা' নির্ভর করে মানুষটি কি অবস্থায় আছে, তার উপর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে দাঁড়িয়ে বা বসে না থেকে শুয়ে থাকলে মানুষ অনেক বাড়তি চাপ সহ্য করতে পারে। কাজেই আকাশ-যানে যাত্রাকালে যাত্রীদের শুয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এ ছাড়া মহাশূন্যে আকাশ-যানের একটি গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে—উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষ। উল্কা হ'লো নানা আকারের লোহার বা পাথরের টুকরো। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতিদিন পৃথিবীর উপরে যত উল্কাপাত হচ্ছে তার মোট ওজন হ'বে প্রায় ১০ থেকে ২০ টন। পৃথিবীর বহির্ভাগে এই উল্কা-কণাগুলির গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২ থেকে ৪৪ মাইলের মধ্যে হ'বে। এই প্রচণ্ডবেগে যদি তেমন আকারের একটা উল্কা আকাশ-যানকে আঘাত করে, তবে আকাশ-যান চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। ১৯০৮ সালে ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার জলাভূমিতে একটি বিরাট উল্কাপাত হ'য়েছিল। উল্কাপাতের সময় যে ভীষণ ঝড় উঠেছিল তাতে সাইবেরিয়ার প্রায় আট কোটি গাছ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।

উল্কাপাত সম্বন্ধে ১৯৫৩ সালে একটি পরীক্ষা-কার্য্য চালান হয়। এই পরীক্ষায় ২৫ থেকে ৮৫ মাইল উর্দ্ধে ১৪৪ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে মোট ৬৬টি উল্কাপাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ ছাড়া একটা পালিশ করা ধাতুর পাতকে যদি অনেক উর্দ্ধে প্রেরণ করে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়, তা হ'লে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়া যাবে যে ছোট ছোট উল্কা-কণার ঘায়ে খুব ছোট ছোট গর্ত্ত হ'য়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল উল্কাপাত থেকে আকাশ-যানকে রক্ষা করা যায় কি করে? আমরা জানি উল্কাপাত সকল সময়ে এবং সকল স্থানে একই ভাবে হয় না? এক একটা সময় আসে যখন বৃষ্টির মত উল্কাপাত হয়—এই সময়গুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানতে পেরেছেন। এছাড়া উল্কাগুলো যেসব কক্ষপথে ঝাঁক বেঁধে চলে সেগুলি সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে সন্ধান পেয়েছেন। এই সময়টা বাদ দিয়ে এবং কক্ষ-পথগুলি এড়িয়ে আমাদের আকাশ-যানকে চাঁদে যাত্রা করতে হ'বে।

মহাশূন্যে প্রধানতঃ দু' ধরণের রশ্মি রয়েছে। (১) একটা হ'ল সূর্য্যের অতি বেগুনী রাশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি প্রভৃতি। (২) অপরটিকে বলা হয় প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি। আকাশ-যানের বহিরাবরণ ভেদ করে অতি বেগুনী রশ্মি ও রঞ্জন রশ্মি অন্তর্ভাগে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মিকে কোন আবরণ দিয়ে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া যায় না। মানুষের শরীরে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব সন্ধান করবার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ইয়ুগষ্টার (Eugster) মানব-দেহের এক টুকরো চামড়া রকেটের সাহায্যে বহু উর্দ্ধে পাঠান হয়, সেখানে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে কয়েক মিনিট থাকে। পুনরায় রকেটটি মাটিতে ফিরে এলে চামড়ার টুকরোটিকে অন্য মানব-দেহে প্ল্যাষ্টিক সার্জ্জারীর সাহায্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়। চামড়াটি সহজেই জোড়া লেগে যায়।

আমেরিকায় কয়েকটি কালো ইঁদুরকে এইভাবে ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ২০ মাইল উর্দ্ধে রাখা হয়। পরে ফিরিয়া এনে দেখা যায় এদের গায়ে অনেকস্থানে ধবলের মত ছিটে ফোঁটা ধূসর বর্ণের দাগ পড়েছে। যাই হোক, মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে আরও বেশী গবেষণার প্রয়োজন আছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল কৃত্রিম উপগ্রহ করে লাভ কী? এখানে আমি দুটি প্রধান লাভ বা উপকারের কথা বলব।

(১) প্রথম, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জন্যে মহাশূন্যের অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না। তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধে থেকে আমাদের গবেষণা চালাতে হ'বে।

(২) দ্বিতীয় লাভ বা উপকার হ'ল—আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাষ বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যদি পৃথিবী

থেকে ২২,০০০ মাইল উর্দ্ধে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা যায়, তবে সে ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিপাশে আবর্ত্তন করে আসবে। এর ফলে পৃথিবীর একটি বিশেষ স্থান থেকে একে সর্ব্বদাই দেখা যাবে। আবার এই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকেও সর্ব্বদাই পৃথিবীর এক পিঠ দেখা যাবে। সেখানকার মেঘমণ্ডল দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে অতি পরিষ্কার দেখা যাবে। এই মেঘমালার গতি কোন দিকে হচ্ছে তা সঙ্গে সঙ্গেই সঠিকভাবে জানা যাবে। কাজেই আবহাওয়া সম্বন্ধে সঠিক পূর্ব্বাভাষ দেওয়া যাবে। আমাদের হাওয়া-অফিসের কর্ত্তাদের আর দুর্ণাম বইতে হ'বে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রে অভিযানের ২য় পর্য্যায়ে যা বলা হ'ল, তাতে বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল, পথের অন্তরায় অনেক। আপনাদের মনের মধ্যে সহজেই প্রশ্ন জাগতে পারে—যদি এতই হাঙ্গামা, তবে চাঁদে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের সেই চিরকালের নেশা অ-জানাকে জানতে, অ-দেখাকে দেখতে। কারণ সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই।

চন্দ্রে অভিযান

(তৃতীয় পর্য্যায়)

সমরেন্দ্রনারায়ণ সেন
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগ যুগ থেকে চন্দ্রের গতি, ও প্রকৃতি ও পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মানুষের মনকে বার বার তার সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলেছে; চন্দ্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ আজ পর্য্যন্ত চন্দ্র সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছেন সবই পরোক্ষভাবে অৰ্জ্জিত; তা থেকে আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠের যে ছবি পাই তা মোটেই চন্দ্রে পাড়ি দেওয়ার পক্ষে লোভনীয় নয়; সারা চন্দ্রপৃষ্ঠ মরুভূমি ও পাহাড়ে সমাচ্ছন্ন; আমাদের পৃথিবীর মত চন্দ্রের কোনও বায়ুমণ্ডল নেই এবং তার ফলে চন্দ্রের আকাশে কখনও মেঘ জমে না বা বৃষ্টি হয় না, চন্দ্রে কোনও বাতাস নেই এবং সেজন্য সবসময় এক অখণ্ড নীরবতা সেখানে বিরাজ করছে। ক্রমাগত ১৫ দিন ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠ সূর্য্যের খরতাপে উদ্ভাসিত থাকে এবং তার ফলে চন্দ্রের বিষুবরেখার তাপ প্রায় ২২০° ফারেণহিট্ পর্য্যন্ত উঠে যায় এর পর যখন চন্দ্রের ১৫ দিন ব্যাপী রাত্রি আরম্ভ হয় তখন হঠাৎ এই উত্তাপের অবসান হয় এবং তাপমাত্র শূন্য থেকে ২৪৩ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ তারকা থেকে আমরা চন্দ্র সম্পর্কে বেশী জানি আর চন্দ্র অন্যান্য সৌরজগতের অধিবাসী চাইতে আমাদের পৃথিবী থেকে নিকটতম; এই জন্যই মানুষের সবচেয়ে প্রথম অভিযানের চেষ্টা হচ্ছে চন্দ্রে।

অজানা ও অজ্ঞাত স্থানে পাড়ি দেওয়ার বাসনা সব সময়ই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। যদিও এই মনোভাব মানুষকে চন্দ্রে অভিযানের সাহস ও শক্তি জোগাবে তবু চন্দ্রে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা; কারণ চন্দ্রে অভিযান করে মানুষ পৃথিবী ও সৌরজগত সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তার করতে সমর্থ হবে। যে দুইটি বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে চাই তা হল চন্দ্রের উদ্ভব কি করে হল ও কি ভাবেই চন্দ্র তার বর্ত্তমান রূপ পেয়েছে। চন্দ্রের উদ্ভব সম্পর্কে নানা মতবাদ আছে। বর্ত্তমানে যে মতবাদ প্রমাণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তা হল এই যে চন্দ্র প্রথমে উত্তপ্ত বাষ্পীয় আকারে ছিল; এবং ধীরে ধীরে এই বিশাল উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড তাপ বিকীরণ করে জমতে থাকে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। এরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে যে প্রথমে পৃথিবী ও চন্দ্র একটি গ্রহ হিসাবে ছিল পরে জোয়ার ভাটার অনুরূপ শক্তির প্রভাবে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; এই মতবাদ অনুসারে প্রথম অবস্থায় চন্দ্র পৃথিবীর আরও কাছে ছিল চন্দ্রে পাড়ি দিতে পারলে চন্দ্র সৃষ্টির এই মতবাদ সম্পর্কে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও চন্দ্রের মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে সমস্ত অন্তহীন গহ্বর ও উত্তুঙ্গ পাহাড় দেখতে পাই তারাই বা কি করে সৃষ্টি হল তা সম্পর্কেও আমরা আরও বিশদভাবে জানতে পারব। চন্দ্রপৃষ্ঠে সব সময়ই প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান উল্কাপিণ্ড এসে পড়ছে এবং এই গহ্বরগুলি ঐ উল্কাপিণ্ড দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। অন্য মতবাদ অনুসারে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলেও এই গহ্বরগুলি সৃষ্টি হতে পারে। এই গহ্বর ও পাহাড়গুলির গলিত লাভা প্রবাহ পরীক্ষা করে ভূতত্ত্ববিদগণ এই ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে সমর্থ হতে পারেন; এই ছাড়া চন্দ্রের কি কখনও কোনও বায়ুমণ্ডল ছিল এবং বর্ত্তমানে চন্দ্রের আকাশে কি কোনও ভারি গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব? ইউরেনিয়াম বা রেডিয়াম জাতীয় কোনও স্বয়ং তেজষ্ক্রিয় পদার্থের

সন্ধান হয়ত চন্দ্রের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হতে পারে; পৃথিবীর মত চন্দ্রেরও চৌম্বক শক্তি আছে কিনা এবং কিভাবে তার দিক ও শক্তির পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং এই চৌম্বক শক্তির উৎসই বা কি? যদি চন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হয় তবে হয়ত এই সমস্ত প্রশ্নের সম্যক ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে এবং তা থেকে আমরা চন্দ্র ও সমগ্র সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারব।

কাজেই যে সমস্ত যাত্রী চন্দ্রলোকে প্রথম অভিযান করবেন তাদের মধ্যে একদল বৈজ্ঞানিক থাকা চাই; এবং যে সমস্ত তথ্য তারা সেখানে সংগ্রহ করবেন তা পরীক্ষা করবার জন্য একটি ছোটখাট অথচ স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারও চন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া চন্দ্রলোকের জন্য যে জাহাজ তৈরী হবে তা চালাবার জন্য দক্ষ কর্ম্মচারীবৃন্দেরও প্রয়োজন এবং এই যাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য জল ও বাতাস সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

চন্দ্রে অভিযান দুইভাবে করা যেতে পারে; এক হল যাত্রিবিহীন একটী রকেট চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে পাঠান অথবা যাত্রিপূর্ণ একটি শূন্যপথে ভ্রাম্যমান বিমানও পাঠানো যেতে পারে। উপরোক্ত দুইটি উপায়ের মধ্যে প্রথমটি অপেক্ষাকৃত সহজ। যদি যাত্রিশূন্য রকেটের মধ্যে কয়েকশত পাউণ্ড বিস্ফোরক ভর্ত্তি করে তা চন্দ্রে নিক্ষেপ করা যায় তা হলে চন্দ্রবক্ষে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে এবং সেই আলোর ছটা পৃথিবী থেকে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে। পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই রকম একটি পরীক্ষা খুবই শিক্ষামূলক ও নূতন তথ্য সংগ্রহের উপায় হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় হল কি করে মানুষ চন্দ্রগ্রহে গিয়ে পৌছাতে পারে সেজন্য আমরা যাত্রিহীন রকেটের ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা থেকে বিরত থাকব।

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পৃথিবী থেকে যদি যাত্রীসহ একখানি শূন্যপথে চলার উপযোগী বিমানকে চন্দ্রে পাঠাতে হয় তা হলে একখানি ৮৪০,০০০ হাজার টন তিন পর্য্যায়ের রকেটের প্রয়োজন হবে। কারণ তাতে যাত্রী ছাড়াও এই দুর পাল্লায় যাত্রার উপযোগী খাদ্য, জল বাতাস ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থাকবে। জ্বালানি দ্রব্যের ওজনই এক সমস্যা হয়ে দাড়াবে। এবং এই রকেটটী ১৩০০ ফুট লম্বা ও ৩২০ ফুট চওড়া হবে। এই রকম একটি রকেটকে পৃথিবী থেকে পাঠানো প্রায় অসম্ভব। এর জন্য অন্য আর একটি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। যদি শূন্য পথে একটি স্পেস্ ষ্টেশন তৈরী করা সম্ভব হয় তা হলে পৃথিবী থেকে রকেটের সাহায্যে চন্দ্রগ্রহে অভিযানের ব্যোমযানের অংশগুলি স্পেস্ ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং চন্দ্রগ্রহের ব্যোমযান ঐ স্পেস্ ষ্টেশনেই তৈরী করা যেতে পারে। যাত্রাকে এই দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়াতে একটি অতিকায় রকেটের কাজ দুইটি রকেট দ্বারা সম্পন্ন হবে এবং এই দুইটি অপেক্ষাকৃত কম ভার রকেটকে শূন্য পথে ভাসমান করা সম্ভব।

শূন্যে ভাসমান ষ্টেশন থেকে যদি চন্দ্রযানগুলি রওয়ানা হয় তা হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধা তার গতিকে ব্যাহত করতে পারবে না এবং আধুনিক যুগের বিমান বা মোটর গাড়ীর মত তার—Stream lined হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি পৃথিবী থেকে চন্দ্রযানগুলি রওয়ানা হত তা হলে তাদের দুইবার এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীর বাধা ভোগ করতে হত একবার যাবার সময় ও একবার ফেরবার পথে এবং তার ফলে তাদের গঠন এমন এক রকম ধাতুর তৈরী হতে হত যা সহজে গরমে গলে না কারণ অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান এই যানগুলি বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের সঙ্গে তাদের তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। কিন্তু যদি শূন্যে ভাসমান স্পেস্ ষ্টেশন থেকে চন্দ্রযানগুলি চন্দ্রলোকের দিকে রওয়ানা হয় তা হলে বায়ুমণ্ডলীর প্রতিকূলতা আর তাকে সহ্য করতে হবে না। কাজেই চন্দ্রলোকে পৌছবার যানগুলিকে স্পেস্ ষ্টেশনেই তৈরী করে নিতে হবে।

এবং যেহেতু তারা শুধু শূন্য পথে বিচরণ করবে সেজন্য তাদের গঠন ও চালনাপদ্ধতিও হবে অনেক ক্ষমতাশালী।

কাজেই চন্দ্রে যাত্রার প্রথম কাজ হবে শূন্যে অবস্থিত স্পেস্ ষ্টেশন তৈরী করা। ধরে নিতে পারা যায় যে মহাশূন্য পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১২০ মাইল উপরে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে স্পেস্ ষ্টেশন আরও অনেক উপরে স্থাপনা করতে হবে হিসেব করে দেখানো যেতে পারে যে যদি স্পেস ষ্টেশনটি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১০৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত হয় তা হলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লাগবে ২ ঘণ্টা অর্থাৎ দিনে রাত্রির মধ্যে ১২ বার পৃথিবীকে আবর্ত্তন করবে। পৃথিবীর নিকট অবস্থিতির জন্য পৃথিবী থেকে রকেট জাহাজে যাতায়াত করা সহজসাধ্য হবে এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকেও এই স্পেস্ ষ্টেশনটির তাৎপর্য্য অনেক থাকবে। এই স্পেস্ ষ্টেশন থেকে নানারকম বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ চালানো যেতে পারে।

স্পেস্ ষ্টেশনকে ১০৭৫ মাইল দূরের কক্ষে নিয়ে যাবার জন্য রকেট জাহাজের ব্যবহার অপরিহার্য্য; এই শক্তিশালী জাহাজগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ও মাধ্যাকর্ষণের শক্তির বিরুদ্ধে স্পেস্ ষ্টেশনকে নিয়ে যাবে এবং গণনা করে বলা হয়েছে যে এই গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮৪৬৮ মাইল হওয়া প্রয়োজন। তিন পর্য্যায়ের এই বিরাট রকেট যন্ত্রের সব চেয়ে উঁচু পর্য্যায় হল এই স্পেস্ ষ্টেশন। রওয়ানা হওয়ার সময় রকেট জাহাজের প্রথম ধাপ কার্য্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তির্য্যকভাবে ২৪·৯ মাইল উঠে যাবে এবং এই অবস্থায় এর গতিবেগ ঘণ্টায় হবে ৫২৫৬ মাইল যখন রকেট জাহাজ এই গতিবেগ অর্জ্জন করেছে তখন তার দ্বিতীয় ধাপকে কার্য্যকরী করান হবে এই মটর চলার সঙ্গে সঙ্গে রকেট জাহাজ দিগন্তের দিকে একটু হেলে পড়ে আবার সবেগে উপরে উঠতে সুরু করবে। এই ভাবে যখন এ ৩৭·৮ মাইল উপরে উঠেছে তখন এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪৩৬৪ মাইল হবে। এই অবস্থায় রকেটের তৃতীয় অংশ নিজের মটরদের চালিত শক্তির সাহায্যে ৬৩·৩ মাইল উপরে উঠবে এবং তখন তার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮৪৬৮ মাইল।

রকেট জাহাজের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১৮৪৬৮ মাইল হবে এবং যখন তা ৬৩·৩ মাইল উপরে উঠে যাবে তখন তৃতীয় ধাপের মটরগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। নিজের পূর্ণ গতিবেগ নিয়ে তখন এই উড়ন্ত জাহাজ ১০৭৫ মাইল উপরের কক্ষের দিকে ছুটতে থাকবে। এইভাবে এগুতে থাকার ফলে রকেট জাহাজের গতিবেগ কিছু পরিমাণে শ্লথ হয়ে আসতে পারে কাজেই কক্ষে পৌছবার ১৫ সেকেণ্ড আগে আবার মটর গুলিকে সক্রিয় করে তোলা হবে। এইভাবে যখন রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫৮৪০ মাইল হবে তখন রকেট মটরগুলি আবার বন্ধ করে দিতে হবে। রকেট জাহাজের ১৫৮৪০ মাইল গতিবেগ যে কেন্দ্রাভিগ শক্তি যোগাবে তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং রকেট জাহাজ পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে ঘুরতে থাকবে। ২৫০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এই চক্রাকৃতি স্পেস ষ্টেশন পৃথিবী থেকে রকেট জাহাজের সাহায্যে আনা হবে; বিভিন্ন অংশ আগে তৈরী করে রকেট জাহাজের সাহায্যে ১০৭৫ উর্দ্ধে অবস্থিত কক্ষে নিয়ে আসা হবে। যখনই স্পেস ষ্টেশনের বিভিন্ন অংশ এই কক্ষে আসবে তখনই ইঞ্জিনিয়াররা তা জুড়ে দিয়ে তা তৈরী করে নেবেন। স্পেস ষ্টেশনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে সেখানে তিনটি তালা অথবা ডেক থাকবে এবং আশিজন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের থাকার বন্দোবস্ত তাতে করা হবে। পৃথিবী থেকে সব সময়ই রকেট জাহাজের সাহায্যে স্পেস্ ষ্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে এবং জল খাদ্য ও বাতাস সব সময়ই যোগান হবে।

স্পেস্ ষ্টেশনই হবে চন্দ্রে অভিযানের জাহাজ তৈরীর কারখানা; একটি প্রধান সুবিধা হবে এই যে স্পেস্ ষ্টেশন যেহেতু ১৫৮৪০ মাইল গতিবেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে সেজন্য চন্দ্রে অভিযানকারী জাহাজগুলি শুরুতেই

১৫৮৪০ মাইল গতিবেগ পেয়ে যাবে। এবং এই প্রাথমিক গতিবেগের জন্য জ্বালানীর প্রয়োজনও অপেক্ষাকৃত কম হবে এবং খুব শক্তিশালী রকেট মটরের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে। স্পেস্ ষ্টেশনে যদি চন্দ্রে অভিযানের জাহাজগুলি তৈরী হয় আর তারা যদি স্পেস্ ষ্টেশন থেকে চন্দ্রের দিকে পাড়ি দেয় তা হলে এই সুবিধাগুলি যাত্রাকে অনেকাংশে সহজ করে আনবে।

চন্দ্রে অভিযানকারী জাহাজ বহরে তিনটি জাহাজ থাকবে দুইটি জাহাজে এমন পরিমাণে জ্বালানী থাকবে যা যাবার ও ফেরার পক্ষে প্রচুর হবে। যেভাবে বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করেছেন তাতে মনে হয় চন্দ্রে যেতে ৫ দিন অথবা ১২০ ঘণ্টা সময় লাগবে; দুইটি জাহাজে যাত্রীরা থাকবে আর তৃতীয় জাহাজে থাকবে প্রধানতঃ মাল। এই তৃতীয় জাহাজ আর ফিরে আসবে না কারণ চন্দ্র পৃষ্ঠেই তাকে ফেলে আসা হবে। এইজন্য এই জাহাজে শুধু একদিকে যাত্রার জ্বালানী থাকবে আর বাকী অংশ খাদ্য, জল, বাতাস ও অন্যান্য অত্যাবশক জিনিষ দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিনের অনেক আগ থেকে চন্দ্রযানগুলি তৈরীর জিনিষপত্র স্পেস্ ষ্টেশনে রকেট জাহাজের সাহায্যে আনতে হবে। জ্বালানী আনতেই রকেট জাহাজগুলির অনেকবার পৃথিবী থেকে যাতায়াত করতে হবে। হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় ১৩০০ হাজার টন জ্বালানীর প্রয়োজন পড়বে।

যখনই চন্দ্রযানগুলির বিভিন্ন অংশ স্পেস্ ষ্টেশনে এসে পৌছবে তখনই চন্দ্রযানগুলি তৈরী আরম্ভ হয়ে যাবে। যাত্রীদের জন্য থাকবার অংশগুলি ডুরএলুমিনিয়াম্ ধাতু দ্বারা তৈরী করা হবে এবং তার উপরে ভাজকরা নাইলন ও প্লাষ্টিক কাপড়ের আবরণ দিয়ে ঘেরা থাকবে এবং ঘন বাতাসের চাপ দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকৃতি করে দেওয়া হবে। চন্দ্রযানগুলির চালকদের ঘরও ঐভাবে তৈরী করা হবে এবং যাত্রীদের থাকবার ঠিক পাশে চালকবৃন্দদের বসবার বন্দোবস্ত হবে। এই কাঠামোর মধ্যে জ্বালানী নেবার ট্যাঙ্কগুলি জুড়ে দিয়ে সেগুলি জ্বালানী দিয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটী চন্দ্রযান লম্বায় ১৬০ ফুট ও পাশে ১১০ ফুট চওড়া হবে এবং যাত্রার সময় তাদের ওজন হবে ৪৩৭০ টন। প্রত্যেকটী জাহাজের বস্তিদেশে ত্রিশটী রকেট মটরের ব্যাটারী থাকবে এবং এদের ওজন হবে ৬½ টন।

চন্দ্রযানগুলি তৈরীর যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে প্রত্যেকটী চন্দ্রযানে ৫টী তালা বা ডেক থাকবে। বর্ত্তুলাকৃতি যাত্রীদের কোঠার নিচে থাকবে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। একটি হল বেতার বার্ত্তা পাঠাবার জন্য এ্যারিয়েল্ ও অন্যটী হল একটি সৌর আয়না অথবা Solar mirror. এই সৌর আয়নার গঠন হল একটি কনকেভ্ আয়নার মত এবং খুব পালিশ একটু ধাতু থেকে তা তৈরী হবে। এই সৌর আয়না সূর্য্যের আলো একটী পারাভর্ত্তি কাচের টিউবে প্রতিফলিত করবে; তার ফলে পারা পারাবাষ্প পরিণত হয়ে একটি টারবো জেনারেটারকে চালানো হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে সৌর আয়নার আয়তন যদি ৯৫০ বর্গ ফুট হয় তা হলে তা থেকে ৩৫ কিলোওয়াট পরিমানের বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাবে। ছুটন্ত উল্কা পিণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমগ্র চন্দ্রযানকে প্রায় ১/১৬" পরিমান চওড়া পাতলা ধাতব চাদরে ঢেকে দেওয়া হবে এবং এই চাদর চন্দ্রযানগুলির উপর ১" ইঞ্চি উঁচু ছোট ছোট খুটির উপর বসানো থাকবে।

যাত্রী ও অন্যান্য চালকদের কোঠার ভিতর বাতাসের চাপ কি হবে এবং তার গঠন কিরকম হবে তা নিয়েও অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অম্লজানের পরিমাণ শতকরা ২১ ভাগ ও যবক্ষারজানের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস বাকী একভাগ পূর্ণ করে রেখেছে। সমুদ্রতীরে এই বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৪ পাউণ্ড অথবা ৭½ সের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানুষ প্রতি ইঞ্চিতে ৮ পাউণ্ড চাপেও খুবই সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করতে পারে আর তাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ারও কোনও কষ্ট হয় না। চন্দ্রযানগুলির

কোঠাগুলিতে যদি শতকরা ৪০ ভাগ অম্লজান ও ৬০ ভাগ হিলিয়াম্ গ্যাস পুরে দেওয়া হয় এবং চাপ যদি ৮ পাউণ্ডে নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাহলে এই কম চাপেও যাত্রীরা যথেষ্ট পরিমাণ অম্লজান পেতে পারবেন যবক্ষারযানের বদলে যদি হিলিয়াম্ গ্যাস নেওয়া হয় তাহলে ওজনের দিকেও অনেকখানি সুরাহা হবে।

চন্দ্রযানগুলির যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে তার মধ্যে পাচটী তালা বা ডেক থাকবে। সবচেয়ে উপরের ডেকে থাকবেন প্রধান বিমান কর্ম্মচারী বা ক্যাপ্টেন যিনি সমগ্র যানখানিকে পরিচালনা করবেন। ইঞ্জিনীয়ার অথবা ন্যাভিগেটার একেবারে বাদিকে বসবেন এবং তিনি সবসময় জ্বালানীর পরিমাণ, ভিতরের উত্তাপ, চাপ অম্লজানের পরিমাণের উপর নজর রাখবেন। তার পাশেই বসবেন বেতার চালক এবং খুব ছোট ন্যান্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতারতরঙ্গ দিয়ে তিনি স্পেস ষ্টেশন ও পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন। জাহাজের পরিচালক একেবারে ডানদিকে বসবেন এবং রকেট মটর চালনা তারই তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং ভিতরের বেতার যন্ত্রের সাহায্যে তিনি যাত্রীদের ও অন্যান্য পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং জাহাজকে ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তারই উপর বর্ত্তাবে। পরিচালকের নিচের তালাতে থাকবেন ন্যাভিগেটর যার ঘরে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে থাকবে একটি রেকর্ডিং যন্ত্র যাতে করে জাহাজের গতি ও উচ্চতা একসঙ্গে ন্যাভিগেটর জানতে পারবেন। তৃতীয় ডেকে থাকবে যাত্রীদের থাকবার ঘর চতুর্থ ডেকে থাকবে বৈদ্যুতিক নানারকম যন্ত্রপাতি এবং সবচেয়ে নীচের তালাতে থাকবে অম্লজানের ট্যাঙ্ক, খাওয়ার জলের পাত্র ও খাদ্য।

হিসাব কষে দেখা গেছে চন্দ্রের কক্ষপথে যেতে ঘন্টায় চন্দ্রযানগুলির বেগ ১৯৫০০ মাইল হওয়া দরকার কিন্তু যেহেতু চন্দ্রযানগুলি শূন্যে অবস্থিত ষ্টেশনে ১৫৮৪০ মাইল বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেজন্য অতিরিক্ত বেগ আরও ৩৬৬০ মাইলের দরকার হবে। যখনই চন্দ্রযানগুলির রকেট মটরগুলি কার্য্যকরী হয়ে উঠল তখনই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির মধ্যে ভার সাম্য নষ্ট হয়ে গেল এবং যাত্রিরা কিছু কিছু নিজেদের ওজন বোধ করবেন; হিসেব করে দেখা গেছে রওয়ানা হওয়ার তেত্রিশ মিনিট পর চন্দ্রযানগুলির গতিবেগ ঘন্টায় ১৯৫০০ মাইল হয়ে যাবে এবং এই গতিতে ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট পর চন্দ্রযানগুলি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১৭৮০০ মাইল দূরে গিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গতির বেগ কমে গিয়ে দাড়াবে ঘণ্টায় ১০৫০০ মাইল। এবং এই গতিতে চলে ৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট পর পৃথিবী ও চন্দ্রযানগুলির দূরত্ব দাড়াবে প্রায় ৩৩০০০ মাইল গতির বেগ কমে গিয়ে ৮০০০ মাইল ঘণ্টায় হবে এবং রওয়ানা হওয়ার ত্রিশ ঘণ্টা পর ১৩২০০০ মাইল দুরত্ব পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে। যখন দুরত্ব এই দাড়াবে তখন গতির বেগ কমে গিয়ে ঘন্টায় ৩৯৮০ মাইল হবে। এর পর প্রতি ঘণ্টায় গতির বেগ কমতে থাকবে এবং চতুর্থ দিনের প্রারম্ভে গতির পরিমাণ দাড়াবে ঘণ্টায় ৮০০ মাইল যা সাধারণতঃ জেট বিমানের গতি হয়। এই অবস্থায় যাত্রীগণ চন্দ্রের কক্ষ পৃষ্ঠ ভাসা ভাসা ভাবে দেখতে পাবেন; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের যেখানে শেষ ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের যেখানে সুরু তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেছেন নিউট্রেল সীমারেখা; চন্দ্রযানগুলি যখন এই নিউট্রেল বলয় রেখা অতিক্রম করবে তখন তাদের গতিবেগ হয়ে পড়বে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল; চন্দ্রের দূরত্ব এই নিউট্রেল বলয় থেকে প্রায় ২৩৬০০ মাইল। এই সীমারেখা পার হলেই কিন্তু চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টানে চন্দ্রযানগুলির গতিবেগ বাড়তে থাকবে। নিউট্রেল সীমারেখা অতিক্রম করে আরও ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট চলার পর চন্দ্রের দূরত্ব থাকবে মাত্র ৫৫০ মাইল এবং গতিরবেগও অনেক বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় চন্দ্রযানগুলিকে চন্দ্রলোকে অবতরণ করবার উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে। প্রথম যে বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে তা হল চন্দ্রযানগুলির গতি নিয়ন্ত্রণ করা কারণ তা না করলে চন্দ্রের মাধ্যা-কর্ষণের ফলে গতির বেগ ক্রমেই বাড়তে থাকবে এবং চন্দ্রযানগুলি রুক্ষ ধূসন চন্দ্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে।

চন্দ্রযানগুলির পরিকল্পনার সময় এই বিষয়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা হল এই। প্রত্যেক চন্দ্রযানের ভারকেন্দ্রে তিনটি flywheel-এর ব্যবস্থা আছে এবং এইগুলি বৈদ্যুতিক মটরে চালিত হবে। এই তিনটি flywheel পরস্পরের সঙ্গে ৯০° কোণ করে অবস্থিত। একটি চক্রের অবস্থান হল যেদিক দিয়ে চন্দ্রযানগুলি যাচ্ছে সেই দিকে। আর অন্য দুটি চক্র এই চক্রের সঙ্গে ৯০° কোণ করে অবস্থিত। যখনই এক নম্বর চক্রকে ঘুরানো হবে তখন সমস্ত চন্দ্রযানটি ঘুরতে সুরু করবে বৈদ্যুতিক মটরের সাহায্যে এই চক্রকে প্রায় ১৮০° ঘোরানো হবে এবং তার ফলে চন্দ্রযানগুলিও নিজেদের অক্ষের চারদিকে ১৮০° ঘুরে যাবে আর্থাৎ রকেট মোটরগুলি এখন পিছন থেকে সামনে এসে পড়বে। এই অবস্থায় যদি নামবার রকেট মোটরগুলিকে কার্য্যকরী করে তোলা হয় তা হলে তারা গতির উল্টো দিকে ধাক্কা দিতে থাকবে এবং চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে গতি বেগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল তা ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। যখনই চন্দ্রযানগুলি চন্দ্রের নিকটে এসে পড়বে তখন চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের ফলে তাদের গতি পথ অন্যদিকে হেলে যাবে কারণ চন্দ্র স্থির নিশ্চল নয় সেও তার কক্ষ পথে ঘণ্টায় ২২৮০ মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে আর চন্দ্রের গতির দিকে যাচ্ছে চন্দ্রযানগুলির গতির পথের সঙ্গে ৯০° কোণ করে অবস্থিত। কাজেই চন্দ্রলোকের জাহাজের পরিচালককে সেইভাবে fly চক্রের সাহায্যে চন্দ্রযান-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের ঠিক কোন জায়গায় চন্দ্রযানগুলি নামবে তা আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন; চন্দ্রপৃষ্ঠে ১৪ দিন ব্যাপী খর সূর্য্যতাপে উদ্ভাসিত থাকে এবং এই ১৪ দিনকে বলা হয় চন্দ্রের দিন। যাত্রা এমনভাবে আরম্ভ করতে হবে যাতে করে এই চৌদ্দদিনব্যাপী যে অখণ্ড দিন তার প্রারম্ভে চন্দ্রে অবতরণ করতে হবে।

চন্দ্রের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্য্য দিগন্ত থেকে ১½° ডিগ্রির বেশী উপরে উঠে না এবং তার ফলে এই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর তাপ সব সময়ই শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকে। চন্দ্রের বিষুবরেখার তাপমাত্রা ২২০° ফারেণহিট্ পর্য্যন্ত উঠে যায় যা মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে একেবারে প্রতিকূল। এর ফলে যদিও চন্দ্রের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মত কোনও বায়ুমণ্ডল নেই তবু চন্দ্রের মধ্যে ঋতুপরিবর্ত্তনের খেলা চলে; যদিও একে সম্যক রূপে ঋতু পরিবর্ত্তন বলা চলে না। খুব রুক্ষ ও বন্ধুর জায়গার মধ্যে চন্দ্রযানগুলি কিছুতেই নাবতে পারবে না; আবার চন্দ্রপৃষ্ঠের যে সমস্ত জায়গাগুলি খুবই সমতল সেখানেও অবতরণ করা খুব নিরাপদ নয় কারণ খুব ছোট উল্কাপিণ্ডগুলি প্রবল বেগে সর্ব্বদাই চন্দ্রপৃষ্ঠে পড়ছে কাজেই এই উল্কাবৃষ্টির হাতথেকে রক্ষা পেতে হলে যাত্রীদের আবাসস্থল চন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত কোনও গভীর গহ্বরের মধ্যে তৈরী করতে হবে। এমন একটি জায়গায় অবতরণ করা দরকার যেখানে তাপমাত্রা যাত্রীদের পক্ষে সহনীয় হবে। এই সমস্ত সর্ত্তগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি জায়গায় প্রায় পাওয়া যায় তার নাম হল সাইনাস ররিস্ এই সাইনাস ররিস্ চন্দ্রপৃষ্ঠের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে ওসেয়িনাস্ পরসেলাস নামক একটি সমতলভূমির কোলে অবস্থিত। চন্দ্রের উত্তর মেরু থেকে সাইনাস ররিসের দূরত্ব ৬৫০ মাইল এবং দিনের উত্তাপ ৪০° ফারেণহিটের উপর উঠেনা। সাইনাস ররিস্ সমতল ভূমিখণ্ড অথচ ছোটখাট গহ্বর কাছেই থাকতে চন্দ্রে ঘাটি করবার পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী। সাইনাস ররিসের কাছের গহ্বরে ঘাটি করলে ছুটন্ত উল্কাপিণ্ড হতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চন্দ্রে অবতরণ করার মিনিট দশেক আগে থেকে যাত্রীদের মধ্যে খুবই আগ্রহ ও উত্তেজনা দেখা যাবে। পরিচালকের ক্যাবিনে অবস্থিত উচ্চতা মাপবার যন্ত্র ও গতির পরিমাপক যন্ত্র চন্দ্রযানগুলির চন্দ্রের আপেক্ষিক দূরত্ব ও গতির পরিমাপ নির্দ্দেশ করবে। চন্দ্রযানগুলির গতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে চন্দ্র-পৃষ্ঠের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রযানগুলির গতি একেবারে শূন্যের অঙ্কে নেমে যায় এবং যেমন করে হেলিকপ্টার

বিমান মাটিতে অথবা অন্য যায়গায় নাবে ঠিক সেই ভাবে চন্দ্রযানগুলি চন্দ্রের মাটি স্পর্শ করবে। যদিও চন্দ্রপৃষ্ঠের যে সমস্ত ছবি আগে নেওয়া হয়েছে সেইগুলি পরিচালককে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামতে সাহায্য করবে তবুও চন্দ্রপৃষ্ঠে নামবার ঠিক আগে টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে যদি ছবি নেওয়া হয় তা হলে হয়ত খুবই ছোট ছোট পাহাড় যা পৃথিবী থেকে নেওয়া ছবিতে ভাল আসেনি তাদেরও ভালভাবে দেখা যাবে এবং পরিচালক এতে অবতরনের জায়গা সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট আভাষ পাবেন।

নামবার ঠিক অব্যবহিত আগে নামবার গীয়ার যন্ত্রটি কার্য্যকরী হয়ে উঠবে। এই নামবার গীয়ার বা যাকে বলা হয় Landing gear মাকসার পায়ের মত চারিটি পা ও মধ্যে অবস্থিত একটি পা; এতক্ষণ এইগুলি চন্দ্রযানের ভিতরে গুটানো ছিল; চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যখন চন্দ্রযানগুলির উচ্চতা ১০০ ফুটের মত তখন কেন্দ্রে অবস্থিত পাটি ধীরে ধীরে নাবিয়ে দেওয়া হবে প্রত্যেক পায়ের মাথায় ধাক্কা সইবার বন্দোবস্ত আছে। এই পায়ের উপর ভর দিয়ে অতি অল্প সময়ের জন্য চন্দ্রযান-খানি আপন ভারসাম্য রক্ষা করবে। তারপর বাকী চারখানা পা এসে চন্দ্রেপৃষ্ঠের মাটির উপর বসে গেলে চন্দ্রযানখানি অতি সহজেই নিজের ভার সাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

চন্দ্রে অভিযাত্রীদের কতকগুলি সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন; নভো জাগতিক রশ্মি অথবা কসমিকরে সব সময়ই চন্দ্রপৃষ্ঠে এসে পড়ছে। খুব ছোট ছোট ধুলিকণার মত উল্কাপিণ্ড থেকে আরম্ভ করে বিরাট বড় বড় উল্কা বৃষ্টি চন্দ্রপৃষ্ঠে সব সময়ই হচ্ছে। চন্দ্রপৃষ্ঠে চলাফেরা করার সময়ও খুব সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন কারণ খুব নরম বালির আস্তরণের ভিতর গভীর অতলস্পর্শী গহ্বর থাকা আশ্চর্য্য নয়। নভোরশ্মি ও উল্কাপিণ্ড থেকে রক্ষা পাবার জন্য যাত্রীদের তাবু একটি গভীর অথচ চওড়া গহ্বরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়; যা অনুমান করা হয়েছে তাতে ৭০ ফুট থেকে ১০০ ফুট গভীর গহ্বর যার পার্শ্বদেশ সোজা উঠে গেছে তাতেই অস্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করা চলে। গহ্বরের ভিতর পরিষ্কার করে তাতে আগের তৈরী তাবুর অংশগুলি একে একে নাবিয়ে দিতে হবে। খুব দ্রুতগতিতে কাজ এগুতে থাকবে এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, এয়ার কণ্ডিসন করা ও জল সরবরাহ করার ব্যবস্থাও অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে কি কি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হবে ও যাত্রীদল কিভাবে চন্দ্রলোক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করবেন তা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন; চন্দ্রগ্রহে থাকার মেয়াদ ধরা হয়েছে ৬ সপ্তাহ এবং সেই ভাবেই খাদ্য রসদ জল ও বাতাস চন্দ্রযানগুলিতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল চন্দ্রপৃষ্ঠে যে সমস্ত গভীর গহ্বর দেখা যায় সেগুলি কি উল্কাবৃষ্টির ফলে হয়েছে অথবা ভূমিকম্পই তাদের উৎপত্তির মূল কারণ; সাইনাস ররিসের কাছের লাভা প্রবাহগুলি অথবা চন্দ্রের পাহাড়গুলি পরীক্ষা করে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আশা করা যায় এ সম্পর্কে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন, চন্দ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যে দুইটি মতবাদ বর্ত্তমাতে প্রচলিত সে সম্পর্কেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে একটি মতবাদ অনুসারে চন্দ্র হল একটি গ্রহ যা সৃষ্টির প্রথমভাগে অনন্ত বিশ্ব থেকে ছুটে এসে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ে। তারপর তার ও পৃথিবী সংঘর্ষের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি হয়; তারপর তা আবার তার বর্ত্তমান কক্ষে ফিরে গিয়ে উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করে; অন্য মতবাদ বলে যে সুরুতে চন্দ্র বাষ্পীয় আকারে ছিল এবং বর্ত্তমানে চন্দ্রের যে কক্ষ তার আরও অনেক নিকটে ছিল। এই অবস্থায় এই উত্তপ্ত বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে এই মতবাদ বেশী গ্রহণ যোগ্য এবং চন্দ্রে অভিযানকারী যাত্রীদের কাজ হবে এই দুই মতবাদের মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা তা নিরূপণ করা। দ্বিতীয় যে প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা করা হবে তা হল চন্দ্রের আমাদের পৃথিবীর মত কোনও

বায়ুমণ্ডল আছে কিনা যদি চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলে আরগন অথবা ক্রিপটন্ জাতীয় কোনও ভারী গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে চন্দ্র কোনও কালে গলিত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল না কারণ তা হলে এই রকম ভারী গ্যাস তা থেকে তখনই সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যেত। কোনও কম্প্রেসার যন্ত্রের সাহায্যে এই সমস্ত ভারী গ্যাসকে যদি তারা আদৌ চন্দ্রের চারদিকে থেকে থাকে, কাচের নলের ভিতর ভর্ত্তি করা সম্ভব এবং তার বর্ণালী থেকে ঐ গ্যাসের প্রকৃতি ও তার পরিমাণ বের করা হয়ত যেতে পারে কারণ চন্দ্রের এই অভিযানে আগেই বলা হয়েছে যে একটি ছোটখাট গবেষণাগার সঙ্গে নেওয়া হবে। চন্দ্রের মধ্যে মেরুজ্যোতি বা aurora Borealis জাতীয় কিছু দেখা যায় কিনা তাও গবেষণার অঙ্গীভূত।

পৃথিবীর মত চন্দ্রেরও চৌম্বক শক্তি আছে কিনা তাও গবেষণার বিষয়। এবং যদি চন্দ্রের কোনও চৌম্বক শক্তি থাকে তাহলে তা দিন রাত্রি ও বৎসরের সঙ্গে তার শক্তি কমে অথবা বাড়ে কিনা এবং তার কোনও দিক পরিবর্ত্তন হয় কিনা তাও আমাদের অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। এখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে তাতে মনে হয় পৃথিবীর চুম্বক শক্তির $১০^{-৬}$ ভাগ হল চন্দ্রের চুম্বক শক্তির পরিমাপ; কাজেই খুবই সূক্ষ্ম ও প্রবল অনুভূতি সম্পন্ন যন্ত্র চন্দ্রের চুম্বক শক্তির পরিমাপ করতে সমর্থ হবে। পৃথিবীর চুম্বক শক্তির দিক পরিবর্ত্তনের কারণস্বরূপ এই মত গ্রহণ করা হয়েছে যে পৃথিবীর চুম্বক শক্তির উৎস হল বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ বা পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত ধাতুদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যা ধারণা চন্দ্র সম্বন্ধে করা হয়েছে তাতে মনে হয় চন্দ্রের অভ্যন্তর কঠিন শিলা রাশিতে পূর্ণ এবং তাই যদি হয় তবে চন্দ্রের চৌম্বকশক্তির দিক পরিবর্ত্তন হবে না। এই সম্পর্কে যদি পরীক্ষামূলকভাবে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয় তবে এই মতবাদের যাচাই করা সম্ভব হবে।

ভূবিজ্ঞানীগণ চন্দ্রে অন্যান্য ধাতু যথা ইউরেনিয়াম থোরিয়াম প্রভৃতির সন্ধান করবেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে নানারকম ধাতুর নমুনা বা স্প্যাসিমেন সংগ্রহ করবেন। চন্দ্রের অভ্যন্তর কি গলিত অবস্থায় আছে না একেবারে কঠিন শিলারাশিতে পূর্ণ তা সম্পর্কে একটি পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। যদি ভূমিকম্পের মত একটা মৃদু কম্পন সৃষ্টি করা যায় তা হলে সেই কম্পন চন্দ্রপৃষ্ঠ ভেদ করে চলতে থাকবে যদি অনেক দূরে একটি গহ্বরের মধ্যে একটী ভূকম্পন মাপক যন্ত্র (সিসমোগ্রাফ) রাখা যায় তা হলে এই কম্পন ঐ যন্ত্রে ধরা পড়বে। যদি চন্দ্রের অভ্যন্তর একেবারে কঠিন শিলা রাশিতে ভর্ত্তি থাকে তা হলে ঐ কম্পনের কোনও হ্রাস হবে না অর্থাৎ একেবারে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ঐ কম্পন চলে যাবে আর যদি গলিত ধাতব পদার্থ যদি চন্দ্রের অভ্যন্তরে থাকে তা হলে এই কম্পনের কিছু অংশের গতি ব্যাহত হবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে নভোরশ্মির পরিমাপ ও দিন রাত্রির মধ্যে তার ভেদাভেদ হয়ত নভোরশ্মির মূল কোথায় জানতে সাহায্য করতে পারে কারণ নভোরশ্মির উৎপত্তি যে কোথায় এবং কি ভাবে হচ্ছে তার কারণ এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও চন্দ্রপৃষ্ঠে হয়ত অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে কারণ পৃথিবী থেকে চন্দ্রমণ্ডলে আমরা কি কি দেখতে পারব তার সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব নহে। এই জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার কার্য্যক্রম হয়ত দিন দিন নূতনভাবে করতে হবে। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে এবং যে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাবে তা তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে অবস্থিত পর্য্যবেক্ষণ রত বৈজ্ঞানিকদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কারণ যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তা হলে অন্ততঃ যা কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা জানা যাবে এবং ভবিষ্যতের যাত্রাকে আরও নিরাপদ ও সুগম করবার সুবিধা হবে।

চন্দ্র থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের আগে চন্দ্রে একটি স্বয়ংক্রিয় রকেট ষ্টেশনের স্থাপনা করে আসতে হবে যাতে ঐ

ষ্টেশন চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপের পরিমাপ, নভোরশ্মি পরিমাপ ও উল্কাপিণ্ডের গতি সম্পর্কে খবর পৃথিবীতে পাঠাইতে পারে। পৃথিবীতে যাত্রার আগে চন্দ্রযানের পরিচালকবৃন্দ চন্দ্রযানগুলির যান্ত্রিক অবস্থা, জ্বালানীর পরিমাণ ও অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেবেন। চন্দ্রে অভিযাত্রীদের অবস্থান হবে ছয় সপ্তাহের মত এবং এই সময়ের মধ্যে চন্দ্র তার কক্ষে প্রায় ১½ বার ঘুরে আসবে এবং যখনই চন্দ্রও শূন্যে অবস্থিত স্পেস্ ষ্টেশন একই রেখায় আসবে তখনই পৃথিবীতে ফিরে আসার যাত্রা সুরু হবে। মালবাহী জাহাজকে চন্দ্রপৃষ্ঠে ফেলে আসা হবে এবং যাত্রীদের জাহাজেরও রূপ কিছুটা পরিবর্ত্তিত হবে। প্রত্যেক যাত্রীবাহী জাহাজের নিচে দশটি করে জ্বালানী ভর্ত্তি পাত্র থাকবে, তার মধ্যে দুটি হবে চন্দ্র থেকে রওয়ানা হওয়ার জন্য, চারিটি হবে চন্দ্র থেকে স্পেস্ ষ্টেশনে আসার জন্য ও আরও চারিটি উদবৃত্ত ট্যাঙ্ক থাকবে। রকেট মটর চলবার সঙ্গে সঙ্গে টারবোপাম্প গুলি কার্য্যকরী হবে এবং চন্দ্রযানগুলি ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়বে। যখনই চন্দ্রযানগুলি গতি সঞ্চয় করবে তখনই যাত্রীগণ নিজেদের ওজন কিছু কিছু বোধ করবেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০ মাইল আসার পর গতির বেগ ঘণ্টায় ৫৮৪০ মাইল হবে। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টান হতে বেরিয়ে পড়তে এই গতিবেগ যথেষ্ট। এই অবস্থায় চন্দ্রযানগুলির রকেট মোটরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই গতিবেগ চলে চন্দ্রযানগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমারেখার মধ্যে এসে পড়বে এবং তারপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে তারা শূন্যে ঘূর্ণায়মান স্পেস্ ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে; যেহেতু চন্দ্র নিজের কক্ষে ঘণ্টায় ২২৮০ মাইল বেগে ঘুরছে সেইজন্য যাত্রাকালে চন্দ্রের রকেট মোটরগুলি চন্দ্রের গতির বিপরীত দিকে চন্দ্রযানগুলিকে ২২৮০ মাইল গতিবেগ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত আরও গতি রকেট মটরগুলিকে দিতে হবে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করা যায়। নিউট্রেল সীমারেখা অতিক্রম করলে চন্দ্রযানগুলি গতি সঞ্চয় করবে কারণ তখন তাহারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় এসে পড়বে। স্পেস্ ষ্টেশনের কক্ষ থেকে ১৩১০০০ মাইল দূরে চন্দ্রযানগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৯৮০ মাইল পর্য্যন্ত উঠবে এবং ১৭০০০ মাইল দূরে তাদের গতিবেগের মাত্রা ঘণ্টায় ১৭০০০ মাইল পর্য্যন্ত পৌছাবে। এইভাবে চন্দ্রযানগুলি গতিবেগ ক্রমেই বেড়ে চলবে কাজেই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করার সময় যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল এই সময়ও তা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ চন্দ্রযানগুলিকে নিজেদের অক্ষের চারদিকে ১৮০° ঘুরিয়ে দিতে হবে এবং সেই অবস্থায় চন্দ্রযানগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। স্পেস ষ্টেশনে অবতরণ করার সময় চন্দ্রযানগুলির গতিবেগ স্পেস্ ষ্টেশনের গতিবেগের সমান হওয়া উচিত অর্থাৎ তখন ঘণ্টায় ১৫৮৪০ মাইল। এই অবস্থায় চন্দ্রযানগুলি স্পেস্ ষ্টেশনে নেবে পৃথিবীর চারদিকে তার উপগ্রহের মত ঘুরতে থাকবে। স্পেস্ ষ্টেশন থেকে তিন ধাপের রকেট করে চন্দ্রযানগুলি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

শূন্যদেশে বিচরণ করা ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। স্ফুটনিক ও এক্সপ্লোরার তার নিদর্শন। বিজ্ঞানের আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক দিনের গ্রহ থেকে গ্রহে যাওয়ার স্বপ্ন হয়ত বাস্তবে রূপ পাবে। মানুষের ইতিহাসে সেই দিন এক নবযুগের সূচনা করবে।

চন্দ্রে অভিযান

(চতুর্থ পর্যায়)

শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে জ্যোতির্বিদদের মধ্যে একটি উত্তপ্ত বিতর্ক চলেছিল মঙ্গলগ্রহের গায়ের কতকগুলি দাগ নিয়ে। সকলেই জানেন, মঙ্গলের গায়ের এই দাগগুলিকে কৃত্রিম খাল বলে মনে করা হয়েছিল। এই মতের সপক্ষে ছিলেন শিয়াপারেল্লি এবং পার্সিভাল লাওয়েল। অন্যদিকে ছিলেন পৃথিবীর জ্যোতির্বিদ সমাজের মস্ত বড় একটা অংশ। মঙ্গলগ্রহের ইংরেজী নাম হচ্ছে মার্স, অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা। যুদ্ধের দেবতাকে নিয়ে প্রায় ষাট বছর আগে যে বাগযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, তখনকার আমলের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সে যুদ্ধের পূর্ণ মীমাংসা সম্ভবপর হয় নি। লাওয়েল তাঁর "Mars and its Canals" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "মঙ্গলগ্রহকে দূরবীণ দিয়ে যখন পরিবর্ধিত করে দেখি, তখন তার বর্তুলাকার দেহের শিয়রে শ্বেত মুকুট আর সর্বাঙ্গের রক্তাভ পটভূমিতে হরিদ্রাভ নীল রেখাসমষ্টির বিস্তার দেখতে পাই।" তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, এখন আর শুধু চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে মঙ্গলের দেহের আঁকিবুকির উপর রায় দিতে হয় না। উন্নততর ফটোগ্রাফিক পদ্ধতির কল্যাণে লালউজানী (infra-red) এবং দৃশ্যমান নানা ধরণের আলোয় নানাসময়ে মঙ্গলের বহু ছবি তোলা হয়েছে। বিভিন্ন ঋতুতে মঙ্গলের চেহারার পরিবর্তনও লক্ষ্য করা হয়েছে। মঙ্গলের দেহ যে একটা অতিসূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলের আস্তরণে মোড়া আছে, একথা আজ মোটামুটি স্বীকৃত। এই বায়ুমণ্ডলের গঠন, তার নিজস্ব মেঘলোকের বৈচিত্র্য, মঙ্গলের দেহের উপাদান ইত্যাদি বিষয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে শতাব্দীর প্রথম পাদের সেই খালসংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা আজও সম্ভবপর হয় নি। আর এরই সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি বৃহত্তর প্রশ্ন: মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবপর কিনা? একমাত্র এই প্রশ্নটিকে অবলম্বন করেই এইচ. জি. ওয়েলস, এডগার অ্যালান পো প্রমুখ সাহিত্যিকেরা নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করেছেন। তথ্যের দিক দিয়ে উদ্ভট হলেও এসব কাহিনী এতকাল আমাদের মনোরঞ্জন করে এসেছে।

সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থায় নূতন এবং রোমাঞ্চকর উপায়ে হয়ত এই শতাব্দী উত্তীর্ণ হতে হতে বিজ্ঞানীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। সে উপায় হচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সাক্ষাৎভাবে পাড়ি জমানো। শুধু লাওয়েল কেন, তাঁর অনেক পরবর্তী বিজ্ঞানীদের পক্ষেও এ কল্পনা আকাশ কুসুম ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে চন্দ্রলোকে যাত্রার যে বিস্তৃত পরিকল্পনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে বোঝা যাবে যে গ্রহান্তরে যাত্রা এখন শুধু উন্নততর যান্ত্রিক উদ্ভাবনসাপেক্ষ ব্যাপার, এবং তা কোনক্রমেই সম্ভাব্যতার অতীত নয়। পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া-আসাকে যদি ডেলিপ্যাসেঞ্জারী বলি, তবে গ্রহান্তরের ব্যোমযানকে বলতে পারি দূরপাল্লার এক্সপ্রেস গাড়ী। যে-লোক ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে অভ্যস্ত, এক্সপ্রেস গাড়ী সম্পর্কে ভীতি তার থাকে না। তার কাছে দূরের গাড়ীতে চড়ার প্রধান সমস্যা হচ্ছে উপযুক্ত রসদ এবং রাহাখরচের ব্যবস্থা করা। আমরা যখন মনে মনে চাঁদে গিয়েছি এবং সেখান থেকে বহাল তবিয়তে ফিরেও এসেছি—তখন এবার আমাদের মনে মনে গ্রহান্তরে যাবার অধিকার জন্মেছে। এ বিষয়ে কবি আমাদের

ছাড়পত্র দিয়েছেন এই বলে যে "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে।"

সর্বাগ্রে ধরা যাক্ মঙ্গলগ্রহের কথা। যা, বললাম প্রথমেই সমস্যা হচ্ছে রসদ এবং রাহা খরচের পরিমাণ কি করে কমানো যায়। কারণ এদিক দিয়ে আমাদের অবস্থা হচ্ছে নিতান্তই মধ্যবিত্ত। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে যদি ১০ টন ওজনের একটা রকেট প্রতি সেকেণ্ডে ৪ কিলোমিটার বেগ নিয়ে মঙ্গলের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে রওনা হয়, তবে তার জ্বালানী লাগবে মোট ২১৬ টন। বলা বাহুল্য যে ব্যাপারটা মোটেই সুবিধাজনক হবে না। সুতরাং আমাদের অন্য কোন উপায় ভাবতে হবে। অর্থাৎ আমরা সোজাসুজি পৃথিবী থেকে রওনা না হয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি একটি স্পেস্-স্টেশন থেকে রওনা হব। এই স্পেস্-স্টেশন সম্বন্ধে ইতিপুর্বেই বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এটি পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাশূন্যে যাত্রাপথে এর কাজ অনেকটা বাড়ীর কাছের জংশন স্টেশনের মত। সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার চক্রবেগ নিয়ে এটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবং জ্বালানী, রসদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবকিছুর ভাণ্ডার এতে আছে। জংশন স্টেশনে যেমন ছোট ছোট লোক্যাল ট্রেণ রসদ এবং যাত্রী বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি পৃথিবী থেকে খেয়াগাড়ী অর্থাৎ খেয়ারকেটে করে এইসব সরঞ্জাম এই স্পেস-স্টেশনে আনা হয়েছে। দূরপাল্লার যাত্রীরাও প্রথমে এখানে হাজির হয়েছেন। এমন কি, হাঙ্গামা কমাবার জন্যে এমন ব্যবস্থাও করা যায় যাতে খেয়ারকেটের ইঞ্জিন এবং অন্যান্য অংশগুলোকেই অদল বদল করে সাজিয়ে গুছিয়ে দূরপাল্লার ব্যোমযান গড়ে তোলা যায়। কেবল একটি কথা মনে রাখতে হবে—দূরগামী ব্যোমযান যেহেতু বায়ুশূন্য এলাকা দিয়েই বেশীটা পথ চলবে, সেইহেতু খেয়ারকেটের সঙ্গে তার বহিরঙ্গের কিছু কিছু তফাৎ থাকবে।

আগেই বলেছি যে স্পেস-স্টেশনটি সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার অর্থাৎ ৫ মাইল চক্রবেগ নিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এখন এমনভাবে যদি মঙ্গলগামী রকেটটিকে রওনা করা যায় যাতে স্পেস-স্টেশনের এই গতিবেগটিও ঐ রকেটে সঞ্চারিত হয়, তবে ফাঁকতালে অনেকটা সুবিধে করে নেওয়া যাবে। বাস্তবিকপক্ষে যাত্রাকালটা এইভাবেই স্থির করা হয়ে থাকে। ফলে রকেটটিকে যে বেগে ছাড়া হচ্ছে তার সঙ্গে নিখরচায় প্রতি সেকেণ্ডে আরো আট কিলোমিটার বেগ যোগ হয়ে যায়। একেই বলে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যবুদ্ধি!

একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার। মঙ্গলগ্রহে পৌছবার একাধিক সম্ভাব্য পথ আছে। রকেটটিকে কোন পথে রওনা করা হচ্ছে তারই উপরে নির্ভর করবে তার প্রয়োজনীয় বেগ এবং যাত্রার স্থায়িত্ব।

প্রথমে ধরা যাক আমরা মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করতে চাই না, দীর্ঘকাল তার সঙ্গসুখও চাই না, কেবল একবার মহাশূন্যের মধুযামিনীতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতে চাই। অর্থাৎ মঙ্গলকে তার কক্ষপথে পাশ কাটিয়ে চলে আসতে চাই। এর জন্য সময় লাগবে দুবছর। জ্যোতির্বিদ তাঁর মহাবিশ্বের পাঁজি দেখে যাত্রাকাল স্থির করে দিলেন এই বলে যে স্পেস-স্টেশন থেকে স্থানীয় সময়ের ঠিক মধ্যরাত্রিতে রওনা দিতে হবে। এই সময়টিতে পৃথিবী আর ঐ স্পেস-স্টেশন সূর্যের সঙ্গে এক সরল রেখায় থাকবে। রকেটের গতিমুখ এবং স্পেস-স্টেশনের গতিমুখও এই সময়ে একই দিকে থাকবে। ফলে রকেটটি সেকেণ্ডে মাত্র ৪·৩ কিলোমিটার (প্রায় ২·৭ মাইল) গতিবেগ নিয়ে রওনা হলেই চলবে। পৃথিবী থেকে সোজা রওনা হলে দরকার পড়ত সেকেণ্ডে ৪·৩+৮ অর্থাৎ ১২·৩ কিলোমিটার (প্রায় ৭·৭ মাইল) গতিবেগ। আর জ্বালানী যে জায়গায় লাগত ২১৬ টন, সে জায়গায় লাগবে ১৯·৬ টন!

পৃথিবীর কক্ষ থেকে রকেটটি যত দূরে যাবে, তার গতিবেগ ক্রমশঃ ততই কমতে থাকবে। আগে থাকতেই ঠিক করা আছে, কোন লগ্নে মহাশূন্যের ঠিক কোন

ঠিকানায় সে মঙ্গলগ্রহের সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়ে পৌছবে। অমনি শুরু হবে ছবি নেওয়ার পালা। মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতই আপন অক্ষদণ্ডকে ঘিরে আবর্তিত হয়। মঙ্গলের দিবারাত্রির মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২·৫৮ সেকেণ্ড, অর্থাৎ আমাদের পার্থিব দিবারাত্রির থেকে সামান্য কিছু বেশী। সুতরাং যে অল্পক্ষণের জন্য মঙ্গলের সঙ্গে আমাদের রকেটের শুভদৃষ্টি ঘটবে, তারই মধ্যে মঙ্গলের দেহের বিভিন্ন অংশে ছবি তোলা সম্ভবপর হবে।

পৃথিবী থেকে যাত্রাশুরু করবার একবছর পরে রকেটটি তার যাত্রাপথের একেবারে প্রান্তবিন্দুতে গিয়ে পৌছবে। এই সময়ে সূর্য থেকে তার দূরত্ব দাঁড়াবে সূর্য এবং পৃথিবীর গড় দূরত্বের ২·১৭৫ গুণ। জ্যোতির্বিদ্যার ভাষায় এই দূরত্বকে বলা হয় ২·১৭৫ জ্যোতিষিক একক। এইখানে এসে রকেটের গতিবেগ দাঁড়াবে সব চাইতে কম।

এবার রকেটের বেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং সে আবার মঙ্গলের কক্ষের নিকটবর্তী হবে। নিকটবর্তী হলেও এ-যাত্রা আর তার সঙ্গে মঙ্গলের নতুন করে মোলাকাৎ ঘটবে না। উপবৃত্তাকার গতিপথ সম্পূর্ণ করে রকেটটি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। ফিরে আসবে ঠিক সেই বেগে, যা নিয়ে সে এখান থেকে রওনা হয়েছিল।

কৌতূহলী বিজ্ঞানীর কৌতূহল কিন্তু এত সহজে মিটবে না। কারণ মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ করে তার প্রশ্নের ভাণ্ডার অফুরন্ত, এর আগেই আমরা তার খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছি। পৃথিবীতে বসে এসব প্রশ্নের অধিকাংশরই সদুত্তর দেওয়া রীতিমত কষ্টকর, অনেক-ক্ষেত্রে রীতিমত অসম্ভব। পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় ৭৮০ দিন অন্তর অন্তর, যখন পৃথিবীর একপাশে থাকে মঙ্গল এবং ঠিক অন্য পাশে থাকেন সূর্যদেব। আবার যেহেতু এই বিশিষ্ট লগ্নগুলিতেও পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব যথেষ্ট কমবেশী হতে পারে, সেইহেতু এর মধ্যে সেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণগুলিতেই ভালভাবে পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর, যখন মঙ্গল এবং পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে। ১৯৩৯ সালে এমন একটি সময় এসেছিল, তারপরে এল ১৯৫৬ সালে। আবার আসবে ১৯৭১ সালে। অর্থাৎ একজন বিজ্ঞানীর আয়ুষ্কালে খুব বেশীবার নয়।

তাই আমাদের ভাবতে হবে কি করে বেশীক্ষণ ধরে মঙ্গলের কাছাকাছি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। প্রথমটায় সশরীরে মঙ্গলে মানুষের অবতরণ করা মোটেই সম্ভবপর হবে না, কারণ নামতে হলে যে সমস্ত তথ্য আগে জানা দরকার, তাই আমাদের হাতে নেই। সেজন্য সর্বাগ্রে রকেটটিকে এমনভাবে পাঠাতে হবে যাতে সে মঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে তার একটি কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়। সেখানে মঙ্গলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে সে বেতারমারফতে আমাদের কাছে খবরাখবর পাঠাবে।

প্রথমে যে প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হবে সে হচ্ছে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের গঠন কি ধরণের। এ পর্য্যন্ত লাল-উজানী এবং অন্যান্য দৃশ্যমান আলোয় মঙ্গলের যে সমস্ত ছবি তোলা হয়েছে, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে মঙ্গলের আশেপাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরমান মেঘের অস্তিত্ব আছে। মেরু অঞ্চলে বরফের আস্তরণও দেখা গেছে, তবে সে আস্তরণ খুব বেশী পুরু বলে মনে হয় না। জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তবে জলের পরিমাণ নেহাৎই সামান্য। এছাড়া আর্গণ নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং নাইট্রোজেন আছে। অক্সিজেনের অস্তিত্ব এককালে থাকলেও এখন প্রায় নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এত কম যে তাতে মানুষের বসবাস সম্ভব কিনা? সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গলে উদ্ভিদ নিশ্চয়ই আছে।

মঙ্গলের উপরে রকেট নামাতে হলে রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ কমানো দরকার। এটা করা যেতে পারে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের একেবারে প্রান্তদেশে রকেটটিকে এমনভাবে চালিয়ে যাতে বায়ুর মৃদু ঘর্ষণে রকেটের বেগ কমে যায় এই অতিপ্রয়োজনীয় গাড়ী

থামানোর কাজ (braking action) মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলকে দিয়ে হবে কিনা তা দেখা দরকার।

পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডল তাকে বহির্বিশ্বের নানা উৎপাত থেকে রক্ষা করে। অসংখ্য ছোট ছোট উল্কা বিপুলবেগে এসে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যদি না হত, তবে আর রক্ষা ছিল না। মহাজাগতিক রশ্মি এবং সূর্যের অতিবেগনী (ultra-violet) আলোর হানিকর প্রভাব থেকেও এই বায়ুমণ্ডল আমাদের রক্ষা করে। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল সে তুলনায় অনেক বেশী ক্ষীণ। সুতরাং প্রকৃতি চেহারাও সেখানে অনেক বেশী নির্মম বলে অনুমান করা যায়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হবে এই সমস্ত বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা।

মঙ্গলগ্রহে মানুষের অবতরণের প্রশ্ন আসবে সব চাইতে পরে, প্রচুর কাঠখড় পোড়ানোর পর। ওখানে পৌঁছেও আমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসবাস করতে হবে, মঙ্গলের বাতাস বুকে টানা চলবে না। ঘুরে বেড়াতে হলে স্পেস-স্যুট পরতে হবে। যেহেতু মঙ্গলগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মাত্র শতকরা চল্লিশ ভাগ, সেই হেতু ঘুরে বেড়ানোটা বেশ আরামপ্রদ লাগতে পারে, কতকটা যেন ভেসে বেড়ানোর মত।

অবতরনের জন্য কি ধরণের যাত্রাপথ সবচেয়ে সুবিধে হবে? এখানে একটা কথা সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। মহাশূন্য পরিক্রমার প্রতি পদে আমরা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় থাকব, সুতরাং সূর্যকে এড়িয়ে যদি টানা সরলরেখায় মঙ্গলগ্রহে যেতে চাই তবে সেটা সম্ভবপর হবে না; সূর্যের টানে রকেটের গতিপথ বেঁকে যাবে, ঠিক যেমন সোজাসুজি নৌকোয় করে খেয়াপার করতে গেলে স্রোতের টানে নৌকোর মুখ বেঁকে যায়। এ সত্ত্বেও সোজা রাস্তায় যাওয়া যায়, যদি রকেটের মধ্যে এমন প্রচণ্ড বেগ সঞ্চার করা যায় যাতে সে সূর্যের টানকে অগ্রাহ্য করতে পারে। কিন্তু তারজন্য এমন বিপুল পরিমাণ জ্বালানী লাগবে যে সেটা শেষ পর্যন্ত খামখেয়ালীপনা হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব উপায় কি? সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে একটি অর্ধ-উপবৃত্তাকার পথে মঙ্গলের অভিমুখে রওনা দেওয়া। এভাবে যাত্রা করার সুবিধে হচ্ছে এই যে এতে রওনা হওয়ার সময় রকেটের গতিবেগ খুব দ্রুতহারে বাড়াতে হয় না, নামবার সময় গতিবেগ খুব বেশী কমাতেও হয় না। তাছাড়া জ্বালানীর খরচও অনেক কম হয়।

রকেটটিকে মঙ্গলগ্রহে পাঠাতে হলে কিন্তু যে কোনদিন রওনা করা চলবে না। কবে পৃথিবী থেকে যাত্রা করলে কোনখানে কখন মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে সে হিসেব আগে থাকতেই ছকে দেওয়া থাকবে। এমনভাবে রওনা হতে হবে যাতে রকেটটি পৃথিবী থেকে যাত্রা করে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করলেই মঙ্গলের সম্মুখীন হতে পারে। ৭৮০ দিনে একবার ঘুরে ফিরে পৃথিবী এবং মঙ্গলের মধ্যে এধরণের সংস্থান ঘটে থাকে, সুতরাং সেই অনুযায়ী রকেটের যাত্রার একটি টাইমটেবল তৈরী করতে হবে।

হিসেব করে দেখা গেছে ২৫৯ দিনে রকেটটি তার অর্ধউপবৃত্তাকার সঞ্চারপথ অতিক্রম করবে। তারপর ফিরে আসবার সময় আবার সুবিধাজনক সংস্থানের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। ৪৫৪ দিন পরে এই সুযোগ আসবে। এই অন্তবর্তী কালটুকু গ্রহান্তরের তীর্থ পর্যটনে যাত্রানাস্তির কাল। আন্দামানের দ্বীপান্তরে যেমন দীর্ঘদিন পরপর জাহাজ ছাড়ত, গ্রহান্তরের জাহাজকেও তেমনি গড়িমসির নিয়ম মেনে চলতে হবে।

মঙ্গলগ্রহের দুটি নিজস্ব বামনাকার চাঁদ আছে, তাদের নাম হচ্ছে ফোবোস এবং দেইমোস। মঙ্গল থেকে দেইমোসের দূরত্ব হচ্ছে ২৩,০০০ কিলোমিটার (১৫,০০০ মাইল) অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী থেকে আমাদের চাঁদের যা দূরত্ব, তার $\frac{১}{১৬}$ ভাগ। আর ফোবোসের দূরত্ব হচ্ছে ৯০০০ কিলোমিটার (৫,৮২৮ মাইল)। মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ফোবোসের লাগে ৮ ঘণ্টা এবং দেইমোসের লাগে ৩০ ঘণ্টা। আয়তনে এই উপগ্রহ দুটি খুব ছোট—ফোবোসের ব্যাস হচ্ছে ১৫ মাইল এবং দেইমোসের ৭½ মাইল। সুতরাং গ্রহ-পরিক্রমার পরবর্তী অধ্যায়ে যদি এই দুটিতে রকেট নামানো যায়, তবে এখান থেকে মঙ্গলগ্রহকে স্বচ্ছন্দে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ার ফলে এই চাঁদ দুটিতে নামা এবং এখান থেকে রওনা দেওয়া অনেক সোজা হবে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে যেমন বিজ্ঞানীদের অপরিসীম কৌতূহল, তেমনি এই সৌরজগতে আমাদের আরেকটি প্রতিবেশীকে নিয়ে কবিদের অশ্রান্ত কলাপ শুনতে পাওয়া যায়। সে হচ্ছে শুক্রগ্রহ। শুকতারা নাম নিয়ে আমাদের এই নিকট পরশীটি কাব্য এবং রূপকথার অন্দরমহলে অনায়াসে প্রবেশ করেছে। গ্রহান্তরে যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এই শুক্রলোকে ধাবিত হব।

আয়তন এবং ওজনের দিক দিয়ে সৌরজগতের মধ্যে শুক্রগ্রহের সঙ্গেই আমাদের পৃথিবীর আত্মীয়তা সব চাইতে বেশী। আয়তনে সে পৃথিবীর চেয়ে সামান্য ছোট। শুক্রগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ প্রায় পৃথিবীর কাছাকাছি (শতকরা ৮৬ ভাগ), সুতরাং ওখানে গিয়ে চলে ফিরে বেড়াতে খুব অসুবিধা হবে না।

আজ থেকে প্রায় দুই শতাব্দী আগে ১৭৬১ সালে রুশ বিজ্ঞানী লোমোনসভ শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব নির্দেশ করেন। এই বায়ুমণ্ডলের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে আলো প্রতিফলন করবার ক্ষমতা, শুক্রগ্রহের দেহে সূর্যের যতটুকু আলো এসে পড়ে সে তার শতকরা ৫৯ ভাগ প্রতিফলিত করে দেয়; অপর পক্ষে পৃথিবী করে ২৯ ভাগ এবং মঙ্গল ১৫ ভাগ। এর থেকে প্রথমে মনে করা হয়েছিল শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশী। কিন্তু পরে প্রমানিত হয়েছে যে এর প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বন-ডাই অক্সাইড, যার ঘন আবরণকে ভেদ করে শুক্রগ্রহের ছবি অনেকদিন পর্যন্ত তোলা যায় নি। জলীয় বাষ্প থাকলেও খুব সামান্য পরিমাণেই আছে। আর অক্সিজেনেও নেই। তাই শুক্রগ্রহে যেতে হলে অক্সিজেনের পুঁজি সঙ্গে যথেষ্ট থাকা দরকার।

শুক্রগ্রহও তার আপন অক্ষদণ্ডের চারদিকে আবর্তিত হয়। কিন্তু এই আবর্তনের কাল সম্বন্ধে যথেষ্টই মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন একবার আবর্তিত হতে সময় লাগে ৬৮ ঘণ্টা, কেউ বলেন পৃথিবীর মতই, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। আবার তৃতীয় একটি মত হচ্ছে, শুক্রগ্রহ যে দুশ' পঁচিশ দিনে সূর্যের চারপাশে একবার পরিক্রমা করে আসে, ঠিক সেই সময়েই আপন অক্ষদণ্ডকে ঘিরে তার একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ শুক্রগ্রহের একটি দিন হয় তার এক বছরে।

এসব প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে একমাত্র শুক্রগ্রহে ভ্রাম্যমাণ রকেট পাঠিয়ে। তাছাড়া ঠিক কিভাবে ওখানে রকেট নামানো যেতে পারে, ওখানকার বায়ুমণ্ডল রকেট নামানোর পক্ষে উপযুক্ত কি না, এসব কথাও জানা দরকার। প্রথম দিকে গ্রহে সোজাসুজি অবতরণ না করে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে হবে। মঙ্গলগ্রহের সম্পর্কে দূর থেকে যেটুকুও বা তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, শুক্রগ্রহ সম্পর্কে তাও যায়নি। তার কারণ শুকতারার সর্বাঙ্গ কার্বনডাই অক্সাইডের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। হয়ত এই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ক্যামেরার সাহায্যে শুকতারার এই অতিরিক্ত লজ্জা কিছুটা মোচন করা যাবে।

শুক্রগ্রহে যেতে হলেও উপবৃত্তাকার পথ নির্বাচন করাই প্রশস্ত। যাত্রার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে রওনা হওয়ার সময়কার গতিবেগের উপর। ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যদি সূর্যের তুলনায় গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে ৩২ কিলোমিটার, তবে শুক্রগ্রহে পৌঁছতে সময় লাগবে ১৪৬ দিন। অর্থাৎ ১৪৬ দিন ধরে পথচলার পর রকেটটি যেখানে এসে পৌঁছবে সেখানে শুক্রগ্রহের সাক্ষাৎ মিলবে। এখন গতিবেগ যদি এর চেয়ে কমিয়ে দেওয়া যায়, ধরুন সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার করা যায়, তবে যাত্রার স্থায়িত্ব কমবে না বাড়বে? ছবিতে দেখছি যে গতিবেগ কমালে যাত্রাকাল কমে যাচ্ছে, কমে গিয়ে এক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে ৮১ দিন। আরো কমিয়ে যদি সেকেণ্ডে ২৭ কিলোমিটার করা হয়, তবে যাত্রার স্থায়িত্ব কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৬০ দিন। এর কারণ কি?

রকেটটি যখন শুক্রগ্রহের দিকে রওনা দিচ্ছে, তখন সে সূর্যের আরও কাছে যাচ্ছে, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে তার গতি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের অভিমুখে। ফলে সূর্যের তুলনায় তার গতিবেগ যত কম হচ্ছে, সূর্য তাকে ততই বেশী করে আকর্ষণ করছে, এবং এই কারণে তার গতিপথ দৈর্ঘ্যে খাটো হয়ে যাচ্ছে। তাই কম গতিবেগ নিয়েও সে অল্পসময়ে শুক্রগ্রহে গিয়ে পৌছতে পারছে। অপরপক্ষে সূর্যের তুলনায় গতিবেগ বেশী হলে, গতিপথও বেশী দীর্ঘ হচ্ছে, ফলে বেশী সময় লাগছে।

উপরে যে যুক্তি দেওয়া হল, ঠিক সেই যুক্তি অনুসরণ করেই দেখানো যায় যে উপবৃত্তাকার পথে শুক্রগ্রহে যেতে যা সময় লাগবে, আরও দূরবর্তী গ্রহ বুধে যেতে তার চাইতে কম সময় লাগবে। এর কারণ এই যে বুধে যাওয়ার রাস্তার দৈর্ঘ্য শুক্রের রাস্তার দৈর্ঘ্যের চাইতে কম। এদিক দিয়ে বুধে যাওয়ার কথা ভাবা গেলেও অন্য কতকগুলি অসুবিধা আছে। বুধ হচ্ছে সূর্যের নিকটতম গ্রহ এবং সেখানে সূর্যের উত্তাপ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশী। বুধের দেহের অর্ধেকটা সারাবছর সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, তাই এখানে চিরন্তন গ্রীষ্ম। এই অর্ধাংশে জমির তাপ ওঠে ৪০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আর অন্য গোলার্ধ হচ্ছে চিরহিমের দেশ। তাছাড়া, বুধগ্রহে বায়ুমণ্ডলের কোন সন্ধান এপর্যন্ত মেলেনি।

এই ত গেল ঘরের কাছের গ্রহগুলোর কথা। এরা হচ্ছে সৌরজগতে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। জ্যোতির্বিদ্যার ভাষায় যাকে বলে terestrial planets বা পার্থিব গ্রহ। শুধু তাই নয়, আয়তন, ওজন, গঠন ইত্যাদি নানা ব্যাপারে এরা আমাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। অপরপক্ষে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুণ প্রভৃতি গ্রহগুলি যদিচ সৌরজগতের বিশাল সংসারেরই অন্তর্ভুক্ত, তবু এসব গ্রহের আয়তন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি এই পৃথিবীর থেকেই অনেকটাই ভিন্নতর। এদের বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং এছাড়াও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস এখনও বন্দী হয়ে আছে। যতদূর মনে হয় তাতে প্রাণের বিকাশের অনুকূল অবস্থা এখনও এসব গ্রহে সৃষ্ট হয় নি। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ২.৬৪ গুণ। অর্থাৎ বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশে একবার যদি গিয়ে পৌছনো যায় তবে হয়ত উত্থানশক্তি রহিত হয়ে স্রেফ শুয়ে থাকতে হবে।

আর তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে দূরত্ব। পৃথিবী থেকে এইসব দূরান্তবাসী গ্রহের ব্যবধান এত বেশী সেখানে পৌছতে প্রচণ্ড সময় লেগে যাবে। এমন কি যদি সেকেণ্ডে ১৬.৭ কিলোমিটার বেগ নিয়ে পাড়ি জমানো যায়, তবে বৃহস্পতিতে পৌছতে লাগবে ১ বছর ৩৯ দিন, শনিতে যেতে লাগবে ২ বছর ১৯৪ দিন, আর সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটোতে যেতে লাগবে ১৯ বছর ৯১ দিন।

এই হল বর্তমান অবস্থা। এখনকার পরিচিত তরল জ্বালানী নিয়ে এ ধরণের গ্রহ পর্যটন অনেকটা সুদূর পরাহত। কিন্তু বিজ্ঞান আজ যে হারে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে "অসম্ভব" কথাটার পরিসর ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এখনই আমরা কোটন রকেটের কথা শুনতে পাচ্ছি যা নাকি আলোর সমান বেগে (সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল) মহাশূন্যে ধাবিত হবে। কিভাবে কখন এই রকেট বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে। আপাততঃ এদেশে বসে তা নিয়ে জল্পনা করা ছাড়া আমাদের হাতে অন্য উপায় নেই। রকেটের জ্বালানীতে পরমাণুশক্তির ব্যবহার যেদিন সম্ভব হবে (অবশ্য ইতিমধ্যে যদি না হয়ে থাকে) সেদিন নিঃসন্দেহে নভোচারণ বিদ্যায় যুগান্তর আসবে। মানুষের যে-মন মহাবিশ্বের এই বৃহৎ বিস্তারে স্তম্ভিত হয় নি, বৃহৎ বাধায় বিপর্যস্ত হয় নি এবং বৃহৎ সাফল্যেও নিরস্ত হয় নি, নভোচারণের নবযুগে সেই মনই তার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি। মানুষের এই মনকে সম্মান না জানিয়ে পারা যায় না।

পরমাণুর সাধারণ জ্ঞান

(ডাঃ তপেন রায় লিখিত)

জড় জগতে আমরা যে সমস্ত বস্তু দেখিয়া বা অনুভব করিয়া থাকি তাহা তিন প্রকার অবস্থায় বিদ্যমান। কেহ কঠিন অবস্থায় বিদ্যমান, যেমন লৌহ, কাঁচ, বরফ ইত্যাদি; কেহ তরল অবস্থায় বিদ্যমান, যথা তৈল, পারদ, জল ইত্যাদি; কেহ বায়বীব অবস্থায় যথা, বাতাস, ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি। কিন্তু যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন যে কোন জড় পদার্থ অসংখ্য অণুদ্বারা গঠিত। যেমন জল অসংখ্য জলের অণুর সমষ্টি। জল জলই থাক বা তাহা বরফ হউক অথবা তাহা জলীয় বাষ্প হউক ঐ অণুগুলি সব সময়েই একই অণু থাকে; তাহাকে আমরা যদি জলের অণু বলি তবে সব অবস্থাতেই তাহা জলের অণু। অবশ্য ঐ জলের ভিতর দিয়া যদি তড়িৎ প্রবাহ করান হয় তবে দেখা যায় যে জল হইতে উদজান ও অম্লজান নামক দুইটি গ্যাস বাহির হইতেছে। এবং উদজান যখন রাসায়নিক ভাবে অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হয় যাহাকে আমরা সহজ ভাষায় উদজানের দহন বলিয়া থাকি তখন দেখা যায় যে ঐ সংযোগের ফলে জল তৈয়ারী হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এজন্য বলেন যে জল ঠিক মৌলিক পদার্থ নহে ইহা একটি যৌগিক পদার্থ এবং উদাজান ও অম্লজানের সংযোগে প্রস্তুত। কিন্তু দেখা গিয়াছে উদজান বা অম্লজান কেহই যৌগিক পদার্থ নহে অর্থাৎ ইহারা মৌলিক পদার্থ। এইরূপ মৌলিক পদার্থের সংখ্যা যাহা স্বাভাবিক ভাবে ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্তব্য তাহা হইতেছে ৯২ (?)। যে কোন একটি মৌলিক পদার্থের যদি উপরোক্ত অণুর ন্যায় এককটি চিন্তা করা যায় তাহা হইলে আমরা তাহাকে আর অণু না বলিয়া তাহার নাম পরমাণু বলিব। সুতরাং পৃথিবী পৃষ্ঠে ৯২ রকম পরমাণু বর্ত্তমান কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ভুরি, ভুরি। বলা বাহুল্য এই পরমাণুগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত হাল্কা। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহাদের দেখা যাইবে না। আরও এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠের যাবতীয় পদার্থ ঐ ৯২টি পরমাণুরই নানারূপ সংযোজনে তৈয়ারী।

এইবার ভাবা যাউক ঐ পরমাণুগুলির গঠন প্রণালী কিরূপ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তড়িৎপ্রবাহ বা বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানা যাউক। পাইপের ভিতর দিয়া যেমন জল প্রবাহিত হয় তেমনই তামার বা কোনও ধাতুর তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। জলপ্রবাহ যেমন জলের অসংখ্য অণুর প্রবাহ ও বিদ্যুৎ প্রবাহ তেমনই অসংখ্য বিদ্যুৎ কণার (এককের) প্রবাহ। এই বিদ্যুৎকণাগুলির নাম ইলেকট্রন। সুতরাং বিদ্যুৎ প্রবাহ অসংখ্য ইলেকট্রণের প্রবাহ। এই ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত অল্প। হিসাবের খাতায় যেমন জমা আর খরচ অর্থাৎ ধন ও ঋণ দুই রকম জিনিষ আছে বিদ্যুৎও দুই রকমের আছে ধন বিদ্যুৎ ও ঋণ বিদ্যুৎ। সমান সমান ধন ও ঋণ বিদ্যুৎ একত্রে থাকিলে তাহাকে নিউট্রাল বলা হয়। ইলেকট্রন যে বিদ্যুৎ বহন করে তাহা ঋণ বিদ্যুৎ বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ।

তেমনই ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ২০০০ গুণ ভারী কিন্তু ধন বিদ্যুৎবাহী আর একরূপ কণিকা আছে যাহার নাম প্রোটন। ইলেকট্রন ও প্রোটনের গায়ের মোট বিদ্যুৎ কিন্তু শূন্যের সমান অর্থাৎ ইলেকট্রনে যতটা ঋণ বিদ্যুৎ আছে প্রোটনে ঠিক ততটা ধন বিদ্যুৎ বা পজিটিভ্ বিদ্যুৎ বর্ত্তমান। আরও একরূপ কণিকা আছে যাহার ভর প্রোটনের ন্যায় কিন্তু তাহার গায়ে কোনও বিদ্যুৎ নাই ইহাদের নাম নিউট্রন। এইবার যে কোনও পরমাণুর গঠন ভাবা যাউক। ইহাদের প্রত্যেকরই একটি কেন্দ্রীন আছে এবং তাহার চারিপাশে ইলেকট্রন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ ঠিক যেমন সূর্য্যের চারিপাশে গ্রহগুলি ঘুরিতেছে ঠিক সেইরূপ ঐ পরমাণুর ভিতরে কেন্দ্রীনটি সূর্য্যের কাজ করিতেছে এবং ইলেকট্রনগুলি গ্রহের ন্যায় কেন্দ্রীনকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই কেন্দ্রীনগুলি কিন্তু সকলেই ধন বিদ্যুৎবাহী। যদি প্রোটনের ধন বিদ্যুৎকে এক একক ধন বিদ্যুৎ বলা যায়, তবে কোনও কেন্দ্রীনের গায়ে ১ কোনও কেন্দ্রীনের গায়ে ২ এইরূপ কাহারও গায়ে ৯২ একক ধন বিদ্যুৎ বর্ত্তমান। সত্য কথা বলিতে কি ঐ বিভিন্ন ধরণের কেন্দ্রীনই (বিভিন্ন ধন বিদ্যুৎ বিশিষ্ট) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এইবার ঐ কেন্দ্রীন কিভাবে তৈয়ারী তাহা চিন্তা করা যাউক। প্রত্যেকটি কেন্দ্রীনের ভিতর আর কিছুই না কেবল প্রোটন ও নিউট্রন আছে। হাইড্রোজেন বা উদযানের কেন্দ্রীন মাত্র একটি প্রোটন দিয়া তৈয়ারী। হিলিয়াম কেন্দ্রীন দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন দ্বারা গঠিত। এইরূপ ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীন ৯২টি প্রোটন এবং ১৪৬টি নিউট্রন দ্বারা তৈয়ারী। সুতরাং হাইড্রোজেন হিলিয়াম এই কেন্দ্রীনগুলি খুবই হাল্কা এবং ইউরেনিয়াম ইত্যাদি কেন্দ্রীনগুলি উহাদের অপেক্ষা খুবই ভারী। যেগুলি মাঝামাঝি ভরের যেমন পটাসিয়াম, ব্রোমিন, স্ট্রন্সিয়াম, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি তাহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। পদার্থবিদরা একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে কোনও দুইটি কণিকা (প্রোটন বা নিউট্রনদের) একত্রিত হইবার সময় কিছুটা শক্তি ছাড়িয়া দেয় ইহার পরিমাণ তাঁহারা বলেন প্রায় ৮ মেভ; কিন্তু পরিমাণের কোন প্রয়োজন আমাদের আপাততঃ নাই। যাহা হউক ইহার নাম আমরা দিলাম বন্ধনশক্তি। অর্থাৎ যদি সোডিয়াম কেন্দ্রীনের কথা ভাবা যায় তবে প্রথমতঃ ইহার কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন সমেত মোট ২৩টি কণিকা আছে এবং এজন্য ইহার বন্ধনশক্তি প্রায় ঐ ৮ মেভএর ২৩ গুণ। এই আইন কিন্তু মাঝারি ভরের কেন্দ্রীনের বেলায়; কারণ দেখা গিয়াছে যে খুব হাল্কা বা খুব ভারী হইলে তাহাদের বন্ধনশক্তি কম। সেজন্য যদি বেশী ভরের কেন্দ্রীন ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা মাঝারি ভরের কেন্দ্রীন পরিণত হয় তবে বন্ধনশক্তির মোট পরিমাণ বাড়িয়া গেল অর্থাৎ এই ভাঙ্গিবার সময় সে কিছু শক্তি ছাড়িয়া দিবে। এবং ঠিক এইরূপ যদি হাল্কা ভরের দুইটি কেন্দ্রীন সংযুক্ত হইয়া একটি মাঝারি ভরের কেন্দ্রীন তৈয়ারী হয় তবে এখনও বন্ধনশক্তির মোট পরিমাণ সংযোগের সময় বাড়িয়া গেল; সুতরাং এই সংযোগের সময় তাহারা কিছু শক্তি ছাড়িয়া দিবে। পদার্থবিদরা দুনিয়ার একটি চিরন্তন নিয়ম লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা এই যে, যে কোন বস্তু বা বস্তু বিন্যাস সব সময়েই চেষ্টা করে কি করিয়া তাহারা কম শক্তি সম্পন্ন হইবে অর্থাৎ তাহারা পারিলেই শক্তি ছাড়িয়া দিতে চায়। সুতরাং এই নিয়ম অনুযায়ী খুব বেশী ভরের কেন্দ্রীন সব সময়েই ভাঙ্গিতে চায় এবং খুব কম ভরের কেন্দ্রীন সব সময়েই জুড়িতে চায় এবং এই ভাঙ্গা এবং জোড়ার সময় তাহারা শক্তি ছাড়িয়া দেয়।

অতএব আমরা যদি ইউরেনিয়ামকে ভাঙ্গিতে থাকি তবে প্রচুর শক্তি পাইতে পারি এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের নাম ফিসন্ (fission)। এ্যাটম বোমা, রিয়েক্টর ইহারা ফিসন্ প্রণালীতে চলে। আবার আমরা যদি কোনও গতিকে উদ্যানের সহিত উদজান জুড়িতে থাকি তাহা হইলেও প্রচুর শক্তি পাইতে পারি এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের নাম ফিউসন্ (fussion)। হাইড্রোজেন বোমা, জিটা ইহারা এই ফিউসন্ প্রণালীতে চলে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত সাধারণের জন্য বক্তৃতা।

পরমাণবিক শক্তি—যুদ্ধে ও শান্তিতে

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, (পদার্থবিদ্যা বিভাগ)

মানবসৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ তার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে নিজের কাজে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে। নিজের শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করে থাকেনি বলেই মানবগোষ্ঠী আজ কাল প্রভাবে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হতে পেরেছে। গত দুই দশকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ যে সমস্ত শক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছে তা হল প্রধানতঃ সৌর শক্তি থেকে উদ্ভূত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মানুষ এক নূতনতর শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছে। এই শক্তি হল পরমাণবিক শক্তি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রায় সমস্ত শক্তির আবিষ্কারের সঙ্গেই ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ জড়িত আছে। কখনও সে নবাবিষ্কৃত শক্তি ব্যবহার করেছে উদ্ভিদ বা জানবেতর প্রাণীর বিরুদ্ধে, কখনও বা ব্যবহার করেছে নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কালক্রমে মানুষ সেই শক্তিকেই আবার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টায় ব্যবহার করেছে। কোনও শক্তির আবিষ্কার যদি শান্তিপূর্ণ কার্য্যকলাপের জন্য হয়ে থাকে, তাহলেও শেষ পর্য্যন্ত তাও প্রায়ই ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরমাণবিক শক্তির ইতিহাসেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। পরমাণবিক শক্তির প্রথম ব্যবহার হয়েছে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে। মানবগোষ্ঠীর এক অংশের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্য অংশের ধ্বংস প্রচেষ্টায়। প্রথম প্রথম যারা এই শক্তির সন্ধানে অগ্রসর হয়েছে তারা সকলেই এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কিন্তু মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এই শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়েছে। ফলে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর কয়েকটি রাষ্ট্রে পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে এবং বিদগ্ধজন নূতন নূতন ক্ষেত্রে এই শক্তি ব্যবহার করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। রাজনৈতিক কারণে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহার পদ্ধতির নানারকম খুঁটিনাটির জ্ঞান মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। তা সত্বেও এ বিষয়ে যেসব তথ্য সাধারণে প্রকাশ করা হয়েছে তার থেকেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এই বক্তৃতায় আমি পরমাণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের বিষয় সাধ্যমত আপনাদের জানাতে চেষ্টা করব। পরবর্ত্তী বক্তারা এই শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয় বলবেন।

পরমাণবিক শক্তির উৎস হল দুই প্রকার। প্রথমতঃ কয়েকটি ভারী পরমাণুকেন্দ্রীনেরে fission বা

বিশিষ্ট প্রকারের বিভাগকে যে শক্তি নির্গত হয় তা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত শক্তির উপরেই আণবিক বোমা, বিভিন্ন ধরণের আণবিক চুল্লী ও আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি নির্ভরশীল। পরমাণবিক শক্তির প্রকাশের দ্বিতীয় উপায় হল কয়েকটি লঘু পরমাণুকেন্দ্রীনের fusion বা একত্রীকরণ। হাইড্রোজেনের বোমায় এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয়। বিভাজন এবং একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় কিভাবে ব্যবহারোপযোগী শক্তির উদ্ভব হয় তা এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতায় বলা হয়েছে। তাই সে বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পরমাণবিক বোমার বিষয়ে জানতে হলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর উপর নিউট্রন কণিকার প্রভাবের বিষয়ে জানতে হবে। নিউট্রন কণিকার কোন বৈদ্যুতিক গুণ নেই। ইহার ভরও প্রায় একটি প্রোটন বা হাইড্রোজেন পরমাণু কণিকার সমান। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যে সমস্ত পরমাণুর বিষয়ে আমাদের জানা ছিল তাদের মধ্যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভর সর্ব্বাধিক। ইউরোনিয়ামের কয়েকটি আইসোটোপ আছে। বিভিন্ন আইসোটোপের মধ্যে U^{238} সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। আর একটি আইসোটোপ হল U^{235}। যে কোন পরমাণুর বিভিন্ন আইসোটোপের কন্দ্রীণে একই সংখ্যক প্রোটন থাকে। তাহাদের নিউট্রন সংখ্যায় তফাৎ হওয়ায় ভরের তফাৎ হয়। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পরমাণুর ভরের একক হিসাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ব্যবহার করা হয়। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর দিকে একটি নিউট্রন ধাবিত হলে কয়েক রকম ঘটনা ঘটতে পারে।

(১) নিউট্রন কণিকা ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিকটবর্ত্তী না হয়ে দূর দিয়ে বলে যেতে পারে।

অথবা,

(২) নিউট্রন কণিকা ইউরেনিয়াম পরমাণু কেন্দ্রীনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অধিকতর ভরের নূতন পরমাণুর সৃষ্টি করতে পারে। নূতন পরমাণু তেজষ্ক্রিয় হয় এবং অন্যান্য পরমাণুর সৃষ্টি করে।

অথবা,

(৩) নিউট্রন কণিকা ইউরেনিয়াম পরমাণুকে প্রায় সমান ভরের দুইটি পরমাণুতে বিভক্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ফিসান (fission) বলে।

বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি পরমাণু কেন্দ্রীন হতে উদ্ভূত পরমাণুগুলি প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হয়। এই পরমাণুগুলির শক্তির পরিমান প্রায় বিশ কোটী ইলেকট্রন ভোল্ট। এই শক্তির পরিমাণের একটি ধারণা এইভাবে হতে পারে। একটি কারণে পরমাণুর দহনে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তার পরিমাণ হল ৪ ইলেকট্রন ভোল্ট। অর্থাৎ কিছু কয়লাকে দহন করলে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয়, সমান ভরের ইউরেনিয়ামের বিভাজনে হয় তার থেকে পঁচিশ লক্ষ গুণ। বিভাজন প্রক্রিয়ার আর একটি বিশেষত্ব হল এই যে উদ্ভূত পরমাণু ছাড়াও এই সময় এক বা একাধিক নিউট্রনেরও উদ্ভব হয়। বিভাজন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রচণ্ড শক্তি এবং এক বা একাধিক নিউট্রনের আবির্ভাবই এই প্রক্রিয়াকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য করেছে। বিভাজন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তিই খালি একে শক্তির উৎস করে তুলতে পারত না। তার কারণ হল এই যে বিভাজন প্রক্রিয়া সাধন করতে নিউট্রন কণিকার প্রয়োজন। অথচ এই নিউট্রন কণিকা সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে নিউট্রন কণিকাকে কোন পরমাণু কেন্দ্রীন থেকে বের করে আনতে হয়। নিউট্রনকে বের করতে যে সব উপায় জানা আছে তাতে কোন

পরমাণুকে অন্য তীব্র গতিবিশিষ্ট পরমাণু কণিকা দিয়ে আঘাত করাতে হয়। এই আঘাত করাবার চেষ্টায় ধাবিত পরমাণু কণিকাগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটিই নিউট্রন বের করতে পারে। ফলে পরমাণু কণিকাগুলিকে বেগবান করতে যে শক্তি ব্যবহার করতে হয় তার বেশীর ভাগই কোন কাজে লাগে না। ফলে ব্যবহৃত শক্তির যে সামান্য অংশ নিউট্রন বের করতে সক্ষম হয়, বিভাজন নিউট্রন পাওয়া না গেলে তাতে শেষ পর্যন্ত কোন লাভই হত না।

এবারে দেখা যাক বিভাজনে উদ্ভূত নিউট্রন কি ভাবে এ অবস্থার তারতম্য ঘটায়। জটিলতর অবস্থাকে সহজে বোঝাবার জন্য মেনে নেওয়া যাক যে নিউট্রন ইউরেনিয়ামকে আঘাত করলেই বিভাজন হয় আর প্রত্যেকবার বিভাজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি নিউট্রন পাওয়া যায়। তা হলে এক তাল ইউরেনিয়ামের মধ্যে কোন একটি পরমাণু বিভক্ত হলে আমরা দুইটি নিউট্রন পাব। এই দুইটি নিউট্রন আবার নিজ নিজ গতিপথে যেতে যেতে অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করবে আর তাতে পাওয়া যাবে মোট বারটি নিউট্রন। এইভাবে প্রত্যেকটি বিভাজনে নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে ২০ 'পুরুষ' বাদে পাওয়া যাবে প্রায় দশ লক্ষ নিউট্রন আর ৪০ 'পুরুষ' বাদে যে নিউট্রন সংখ্যা দাঁড়াবে তা পাওয়া যাবে ১৭৭ এর পরে ৭০টি শূন্য বসালে। বিভাজন প্রক্রিয়া এভাবে ঘটাতে পারলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল শক্তি পাওয়া যাবে। এই যে প্রক্রিয়া যাতে উদ্ভূত পদার্থ আবার পূর্ব্বের পদার্থকে প্রভাবিত করে তাকে ইংরাজীতে চেইন রিয়াক্সন (chain reaction) বলে।

চেইন রিয়াক্সন সহজে বোঝাবার জন্য এই উদাহরণে এমন কতকগুলি জিনিষ মেনে নেওয়া হয়েছে যা আসল প্রক্রিয়ায় হয় না। নিউট্রন পাওয়া গেলেই যে তার প্রত্যেকটি অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিভক্ত করবে এমন কোন কথা নেই। উদ্ভূত নিউট্রন অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণু কেন্দ্রীনে প্রবেশ করে বাসা বাঁধতে পারে বা এই ধরণের প্রক্রিয়া করার জন্য যে যন্ত্রপাতি দরকার তাতে অন্যান্য যে সব পরমাণু থাকবে বা ব্যবহৃত ইউরেনিয়ামে যদি অসম্পূর্ণ শোধনজনিত কোন ইউরেনিয়াম ভিন্ন পরমাণু থাকে তাতে গিয়ে প্রবেশ করতে পারে। তা ছাড়া উদ্ভূত নিউট্রন কোন পরমাণুকে আঘাত না করেই ইউরেনিয়ামের তালের থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে। গড়ে যতটা দূর গেলে একটি নিউট্রন কণিকা একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করতে পারে তা নেহাৎ কম নয়। এই দূরত্বকে স্বাধীন পথ বলা যায়। তাই ইউরেনিয়ামের তালটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থে, উচ্চতায় যদি এই স্বাধীন পথ থেকে বেশ বড় না হয় তা হলে উদ্ভূত নিউট্রন কণিকার পক্ষে সেই তাল থেকে বেড়িয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই সমস্ত কারণে সত্যিকারের চেইন রিয়াক্সন বুঝতে হলে তোমাদের প্রত্যেকটি বিভাজনে উদ্ভূত নিউট্রন সংখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে উদ্ভূত নিউট্রনের কতগুলি পরে আবার বিভাজনে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ কোনগুলি ইউরেনিয়াম বা অন্যান্য পরমাণুর কেন্দ্রীনে গিয়ে বাসা বাঁধবে না বা ইউরেনিয়াম তাল থেকে বেরিয়ে যাবে না, সেই সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। গড়ে প্রত্যেকটি ক্ষেপিত নিউট্রন প্রতি যদি এই সংখ্যা একের বেশী হয় তা হলেই চেইন রিয়াক্সন হতে পারবে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে সাধারণ ভাবে খনিজ সম্পদ থেকে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তাতে বিভাজন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বেশীর ভাগ নিউট্রনই এখানে কেন্দ্রীনে গিয়ে বাসা বাঁধে। একটি নিউট্রনের স্বাধীন পথ এখানে অনেক বড়। ফলে চেইন রিয়াক্সন করা সম্ভব হলেও তার জন্য অনেকখানি ইউরেনিয়াম প্রয়োজন হবে।

সাধারণ ইউরেনিয়ামে চেইন রিয়াক্সন করার এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টায় দেখা গেল যে অপেক্ষাকৃত কম বেগবান নিউট্রন ব্যবহার করতে পারলে ইউরেনিয়াম তাল থেকে তার বের হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম হবে। পরমাণু বিজ্ঞানে সেকেণ্ডে কয়েক হাজার মাইল বেগকে তীব্র গতি আর সেকেণ্ডে এক মাইল বেগকে মন্দ গতি বলা হবে। বিজ্ঞানীরা এও দেখালেন যে অপেক্ষাকৃত কম ভরের মৌলিক পদার্থের মধ্য দিয়ে নিউট্রন পাঠালে তার গতি মন্দিভূত হয়। যেমন জল বা মোমের ভিতর দিয়ে নিউট্রন গেলে তার মন্দ গতি হয়। হাইড্রোজেনের ভর আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। তাই সমানে সমানে ঠোকাঠুকিতে নিউট্রনের গতি শক্তি প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে যায়। তাই প্রথমের দিকে ইউরেনিয়ামের সঙ্গে জল মিশিয়ে তাতে চেইন রিয়াক্সন করার চেষ্টা হল। তাতে অসুবিধা হল এই যে হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রীনে গিয়ে এত নিউট্রন বাসা বাঁধতে আরম্ভ করল যে চেইন রিয়াক্সন সম্ভব হল না। দুই প্রকার যান্ত্রিক উন্নতি দ্বারা চেইন রিয়াক্সন করা সম্ভব হল। প্রথমতঃ নিয়ামক (moderator) হিসাবে হাইড্রোজেনের বদলে গ্রাফাইট বা ভারী জলের (heavy water) ব্যবহার আর দ্বিতীয়তঃ ইউরেনিয়াম এবং নিয়ামক কয়েক স্তরে সাজিয়ে রাখা। এতে চেইন রিয়াক্সন করতে হলে গ্রাফাইটকে উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ করতে হবে। আবার ইউরেনিয়ামের তালও যথেষ্ট বড় রাখতে হবে। এই রকম একটা ব্যবস্থায় চেইন রিয়াক্সন করা সম্ভব হলেও তা দিয়ে বোমা তৈরী সম্ভব নয়। তবে বোমা তৈয়ারী করার কাজে এর ব্যবহার হয়েছে। এখানে যে মন্দগতি নিউট্রনগুলি থাকে তার সবগুলি বিভাজন করায় না। তার কিছু কিছু ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনে গিয়ে বাসা বাঁধে। দেখা গেছে যে U^{235} এ সাধারণতঃ বিভাজন হয় আর নিউট্রন সাধারণতঃ বাসা বাঁধে U^{238} এর কেন্দ্রীনে। U^{238} একটি নিউট্রন গিয়ে হয়ে যায় U^{239}। এই নূতন পরমাণু কেন্দ্রীনে তখন দুইটি নিউট্রন পর পর প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। ফলে জন্ম নেয় নূতন পরমাণু নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম। প্লুটোনিয়ামের গুণ কতকটা U^{235} এর মত। এতেও বিভাজন হয়।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে U^{235} এ সাধারণতঃ বিভাজন হয়। আর U^{238} এর সাধারণতঃ নিউট্রন গিয়ে বাসা বাঁধে। তাই যদি U^{235} এর একটি তাল পাওয়া যায় তাতে নিউট্রন পাঠাতে পারলে প্রায় প্রত্যেকটি নিউট্রনই বিভাজন করাতে পারবে। নিউট্রনের গতি যদি মন্দিভূত না করা হয় তাহলে এক একটা বিভাজন করাতে নিউট্রনকে কিছু বেশী দূর যেতে হবে সত্য তবে U^{235}-এ এত বেশী সংখ্যক সংখ্যাতে বিভাজন হবে যে চেইন রিয়াক্সন করাতে স্বাধীন পথের খুব বেশী বড় তালের দরকার হবে না। তা ছাড়া U^{235}-এ চেইন রিয়াক্সন অনেক তাড়াতাড়ি তৈরী হবে। নিউট্রনের গতি মন্দিভূত না করার জন্য বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে খুব অল্প সময় নষ্ট হবে। তাছাড়া বিভাজনে উদ্ভূত নিউট্রনের বেশীর ভাগই এখন বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শক্তির প্রকাশ হবে। প্লুটোনিয়ামেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দেবে।

এখন বোমা বিস্ফোরণের মূল সূত্র কি দেখা যাক। ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যদি অধিক শক্তির প্রকাশ হয় তবেই বিস্ফোরণ হয়ে থাকে। অধিক শক্তি প্রকাশ হলেই বিস্ফোরণ হয় না। যেমন ইউরেনিয়ামের তালে যদি মন্দগতিতে চেইন রিয়াক্সন করান যায় তা হলে ধীরে ধীরে শক্তির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ইউরেনিয়াম্ এবং তার আধার ইত্যাদি দ্রবীভূত হবে আর পরে উদ্ভূত শক্তিতে তাপমান বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাস হয়ে ধীরে ধীরে আয়তনে বৃদ্ধি পাবে। তার ঘনত্ব যাবে কমে আর শেষ পর্য্যন্ত নিউট্রনের পক্ষে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

এভাবে হয়ত ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ হতে পারে তবে ইউরেনিয়াম থেকে যতটা শক্তি পাওয়া সম্ভব তার খুব অল্প অংশই এতে ব্যবহার হবে।

দেখা যাচ্ছে যে পরমাণুশক্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার করে বিস্ফোরণ করাতে হলে প্রথমতঃ যতদূর সম্ভব পরিশুদ্ধ U^{235} বা Pu^{239} দরকার। তা পাওয়ার উপায় কি? U^{235} পাওয়ার একটি উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ইউরেনিয়ামের মৌলিক পদার্থের গ্যাসের মধ্য থেকে ইউরেনিয়াম আয়ন অর্থাৎ ধনাত্মক বিদ্যুৎ সম্পন্ন পরমাণু তৈরী করা হয়। এই ইউরেনিয়াম আয়নগুলি প্রবাহিত হলে একটি বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের উপর চৌম্বক শক্তির আরোপ করলে বিভিন্ন ভরের পরমাণুগুলি বিভিন্ন পথে আবর্ত্তিত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন পথ থেকে বিভিন্ন ভরের পরমাণুগুলি পাওয়া যেতে পারে। আরও কয়েকটি উপায়ে U^{235} পাওয়া যায়। আমরা সে সব আলোচনার মধ্যে যাব না। Pu^{239} তৈরী করার পদ্ধতির বিষয়েও পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে সাধারন ইউরেনিয়াম থেকে U^{235} বা Pu^{239} নিয়ে বিস্ফোরক তৈরী হতে পারে। বিস্ফোরক পদার্থের আয়তন এমন হওয়া দরকার যে তাতে চেইন রিয়াক্সন হতে পারে। আয়তন যত বড় হবে, বিস্ফোরকের মধ্য থেকে নিউট্রন নির্গমনের সম্ভাবনা ততই হ্রাস পাবে আর বিস্ফোরণ তত অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারবে। উপযুক্ত আয়তনের বিস্ফোরক পদার্থ একত্র করাই হল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এজন্য দুইটি বা ততোধিক বিস্ফোরক পদার্থের পিণ্ড নেওয়া হয়। এই পিণ্ডগুলি এমন হওয়া দরকার যাতে চেইন রিয়াক্সন হওয়া সম্ভব নয়। তারপর সেই পিণ্ডগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি একত্র করতে হবে। দুটি পিণ্ড কিছুটা কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গেই চেইন রিয়াক্সন আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ একটি পিণ্ড থেকে নির্গত নিউট্রন অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। যদি দুইটি পিণ্ডকে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি একত্রীভূত করা না হয় তা হলে উৎপন্ন শক্তি দুটি পিণ্ডকে দ্রবীভূত করে দেবে সে দুটি একত্রীভূত হওয়ার অনেক পূর্ব্বে। ফলে খুব সাধারণ ধরণের একটি বিস্ফোরণ হবে। দুইটি বিভিন্ন অংশকে একত্র করার জন্য ছোট খাট একটি কামান দরকার। কামান দিয়ে একটি অংশকে অপর অংশের দিকে ধাবিত করতে হবে। তবে বিশেষ কামান দিয়ে উৎক্ষিপ্ত করলেও একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশে যোগ সাধন করতে যতটা সময় লাগে তা পরমাণু বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট কম নয়। তবে দুইটি অংশ একত্র হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি চেইন রিয়াক্সন আরম্ভ না হয় তা হলে বোমার দিক দিয়ে কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে যদি কোন নিউট্রন না আসে ও বোমা বিস্ফোরণে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। আবার দুইটি অংশ যখন একত্র হবে তখন যদি কোন নিউট্রন না দেখা দেয় তা হলেও দুটি অংশ আবার বিনা বিস্ফোরণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এমন কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে ঠিক সময় দুইটি পিণ্ড একত্রীভূত হয় তখন নিউট্রন তাতে আঘাত করে। তবে প্রথম সম্ভাবনা থেকে নিশ্চিত ভাবে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। মনে রাখতে হবে আন্দাজ ১।৩০০০ সেকেণ্ডের মধ্যে একটিও নিউট্রন না গেলেই বোমা বিস্ফোরণ সাফল্য লাভ করবে। এই সময়ে নিউট্রন নিম্নের উপায়ে আসতে পারে।

(ক) মহাজাগতিক রশ্মি,

(খ) ঘন ধাতুর মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত লঘু ভরের পরমাণুর সঙ্গে ইউরেনিয়াম উদ্ভূত আল্ফা কণিকার সংঘাত,

(গ) ইউরেনিয়াম পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিভাজন।

মহাজাগতিক রশ্মি থেকে গড়ে প্রতি বর্গ ফুট স্থানে সেকেণ্ডে বারটির মত নিউট্রন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উপায়েও এর থেকে বেশী নিউট্রন আসে না। এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে সেকেণ্ডে প্রায় ৪০/৫০টি নিউট্রন স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিভাজনে পাওয়া যায়। বোমা বিস্ফোরণের শত্রু হল এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিভাজন। এর থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল যত শীঘ্র সম্ভব দুইটি অংশকে একত্র করা। একত্রীভূক্ত বিস্ফোরকে চেইন রিয়াক্সন আরম্ভ হয়, নিউট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর বোমার সমস্ত পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়। চেইন রিয়াক্সন সমস্ত বিস্ফোরক পদার্থ শেষ হলে বন্ধ হয় অথবা গ্যাসের আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে বন্ধ হয়। এই সমস্ত ব্যাপার সইতে ১/১০০০০০০ সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগে। উদ্ভুত শক্তিতে বিরাট তাপমানের সৃষ্টি হয়। তার পরে যে ধরণের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দেখা যায় তা নির্ভর করে বিস্ফোরণ কোথায় করান হয়েছে তার উপর। আকাশে বিস্ফোরণ করালে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরকের আধার এবং বিস্ফোরকের অবশিষ্টাংশ প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হয়। বিস্ফোরক ও আধারের ভগ্নাংশগুলি বিরাট তাপমানে বৈদ্যুতিক কণা সমৃদ্ধ হয়ে তীব্র বেগে চলতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে (১/৫০০০০ সেঃ) তা প্রায় ৫০ ফুট ব্যাসের গোলাকার ধারণ করে। তখন এর ঘনত্ব প্রায় সাধারণ বায়ুর ঘনত্বের সমান হয়। এর পর আয়তন বৃদ্ধি কিছুটা ধীরে ধীরে হয়। উত্তপ্ত ধাতু চারিদিকের বায়ুর সঙ্গে মিলিত হতে থাকে। এই বায়ুও ভীষণ উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত ধাতু ও বায়ুর মিশ্রণ বলতে থাকে। যখন আয়তন এতটা বৃদ্ধি পায় যে ইহার বাষ্প চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর বাষ্পের সমান হয় তখন আয়তন বৃদ্ধি বন্ধ হয়। এতে হয়ত ১/১০০০ সেঃ সময় লাগে। গ্যাস দ্বারা এই সময় একটি 'অগ্নি গোলকের' সৃষ্টি হয়। এই অগ্নিগোলকের ব্যাস কয়েকশত ফুট। প্রায় সেকেণ্ড খানেক এই গোলক চোখ ধাঁধান সাদা আলো বিকীরণ করে। অগ্নিগোলক তারপর ক্রমশঃ শীতল হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই অগ্নিগোলক উপরের দিকে উত্থিত হতে থাকে এবং শীতল বায়ুর ধারা ইহার চারিদিকে আসতে থাকে। উপরে উঠবার সময় ইহার নীচে ধূলি এবং মেঘের একটি স্তম্ভ দেখা দেয়। এই স্তম্ভের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের তেজষ্ক্রিয়া পদার্থ থাকে। এই তেজষ্ক্রিয়তা অবশ্য ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। একদিনের মধ্যেই অনেকখানি তেজষ্ক্রিয়তা নষ্ট হয়। যে জলীয় বাষ্প উত্তপ্ত স্তম্ভের সঙ্গে উপরে আসে তা উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুতে দ্রবীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। স্তম্ভটির ঊর্দ্ধ গতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অবস্থা আসতে পারে যে উপরের বায়ু নীচের বায়ুর থেকে গরম। তখন স্তম্ভের গ্যাস আর উপরে না উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এইটাকে বলে মস্‌রুম (mushroom) বা ব্যাঙের ছাতা। তেজষ্ক্রিয়তার দ্বারা অবশ্য এই সময়ও স্তম্ভের কিছু কিছু গ্যাসের তাপমান বৃদ্ধি পায়। সেগুলি আরও উপরে উঠে আবার ব্যাঙের ছাতার সৃষ্টি করে। এগুলো হয় পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬ থেকে ৮ মাইল উপরে।

আকাশে যখন এইসব ব্যাপার হয় পৃথিবীতে ততক্ষণে একটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণে উদ্ভূত শক্তিতে এই সময় অনেকখানি বায়ুকে অসম্ভব রকম বেগে চারিদিকে ধাবিত করে। এইভাবে একটি বায়ু তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাতে কোন এক স্থানে প্রথমে বায়ুর অত্যধিক চাপ পড়ে। তার পড়ে আবার সেখানে বায়ুর চাপ অসম্ভব রকম হ্রাস পায়। এইভাবে বায়ুর চাপের পরিবর্ত্তনের পর একটি প্রচণ্ড বেগবান ঝটিকার সৃষ্টি হয়। কোন একটি বাড়ীর দেওয়ালে ধরুন এই বায়ুর চাপ পড়ল। দেওয়ালের একদিকে বায়ুর প্রচণ্ড চাপ, অন্যদিকে যৎসামান্য চাপ থাকায় দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। বায়ুর চাপের তফাৎ হওয়ায় যে ঝড় বয় তাতে

বাড়ীর যে সব অংশ প্রথম বার বেঁচে গেছে তাও ধ্বংস হয়।

বিস্ফোরণের প্রায় ১০০০ ফুট দূরে বায়ুর চাপ সাধারণ বায়ুর চাপের প্রায় ১০।১৫ গুণ। এই চাপেই মানুষের বুকের হাড় গুঁড়িয়ে যায়। প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ গজ দূরে এই চাপের মাত্রা সাধারণ বায়ুর চাপের এক তৃতীয়াংশ বেশী। এই চাপেও সাধারণ বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়। একটি সাধারণ দেওয়ালে এর চাপ প্রায় ততটা যতটা চাপ হবে একটা রেলগাড়ী দেওয়ালের উপর বসিয়ে দিলে। প্রায় ২ মাইল দূরে গেলে এই চাপ হবে সাধারণ চাপের শতকরা ১৫ অংশ বেশী। এই চাপে সাধারণ ঘরবাড়ী ধ্বংস না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর পুরাতন ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। হিরোসিমায় বিস্ফোরণ স্থানের ৮ মাইল দূরে পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী দেখা গিয়েছিল।

জলের নীচে বিস্ফোরণ ঘটলে অগ্নি গোলকের পরিবর্ত্তে একটি প্রকাণ্ড গ্যাসের বুদ্বুদ দেখা দেয়। জলের প্রচণ্ড বেগে গ্যাসে পরিণতিই এই বুদ্বুদ সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ। এই জল বুদ্বুদ যখন জলের উপরে এসে উপস্থিত হয় তখনই আবার সেখানে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি হয়। তাতে বিরাট আয়তনের জল সমষ্টি উপরে উঠে যায়। এই সময় যে জল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তার উচ্চতা ১০০ ফুট পর্য্যন্ত উচু হয়। এই তরঙ্গের নিকটে কোন রকম অর্ণবপোত থাকলে তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। সমুদ্রপারের ঘরবাড়ীও তাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে।

বুদ্বুদ জলের উপর আসার পর একটি বিরাট জলধারা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই জলধারায় প্রায় ১০লক্ষ টন জল থাকতে পারে। জলধারা ১ মাইল থেকে ১½ মাইল পর্য্যন্ত উপরে ওঠার পর শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে। জলধারার উপরের দিক কতকটা ফুলকপির মত চেহারার মেঘে পরিণত হয়। জলধারার উপরের দিকের গতি এইবার কতকটা ব্যাহত হয় আর ধারার নীচের দিকের জল সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সময় নীচে একটি বিরাট জল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের উচ্চতা হয় ২৫০ থেকে ৩৫০ গজ। এই তরঙ্গ বিস্ফোরণের স্থান থেকে চারিদিকে যেতে থাকে। যাত্রাপথে বিস্ফোরণ স্থানের উপরকার মেঘের সঙ্গে মিশে যায়। বায়ুধারা থাকলে এই মেঘ অনেকদূর পর্য্যন্ত যেতে পারে। এই মেঘে থেকে যে বৃষ্টি হয় তাতে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থাকে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে বিস্ফোরণ হলে বিস্ফোরণ স্থানে একটি গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া পৃথিবীর কিছুটা অংশ উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ধুলার সঙ্গে মিশে নীচে ফিরে আসে। ফলে বিস্ফোরণ স্থানের আশে পাশে বেশ কিছুটা জায়গায় অনেকখানি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ দেখা যায়। বায়ুর চাপ বৃদ্ধি ও অত্যাধিক উত্তাপও এ অবস্থায় হয়ে থাকে। তবে পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির তুলনায় ভূপৃষ্ঠে বিস্ফোরণে ক্ষতি কিছুটা কম হয়।

এতক্ষণ আমরা বিভাজন প্রক্রিয়ার ব্যবহারে যে বিস্ফোরণ ঘটনো যেতে পারে তার কথাই আলোচনা করেছি। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণুর মিলনেও অনেক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বিভিন্ন নক্ষত্রে এই ভাবে শক্তির উৎপাদন হয়ে থাকে। তাদের ধারণা যে সূর্য্য এই ভাবে বারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠিত হয় এবং এই গঠনে যে শক্তি পাওয়া যায় তা হতে সূর্য্য ক্রমাগত যে শক্তি হারাচ্ছে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়। এই গঠনে সহায়তা করে সূর্য্যের অভ্যন্তরের অত্যাধিক উত্তাপ। পরমাণু বোমায়ও অল্পক্ষণের জন্য সেই রকম উত্তাপ পাওয়া যায়। তাই সেই অল্প সময়ের মধ্যে যে ধরণের একত্রীকরণ প্রক্রিয়া হওয়া সম্ভব তা ঘটানো যেতে পারে। সূর্য্যে সংঘটিত একত্রীকরণ হতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং তা

করা এক্ষণে সম্ভব নয়। তবে নিম্নের প্রক্রিয়াগুলি হতে পারে ঃ

$$H^3 + H^2 \rightarrow He^4 + n^1$$

$$H^3 + H^3 \rightarrow He^4 + 2n^1.$$

প্রথমটিতে একটি ডিউটেরিয়াম কণিকার সহিত একটি ট্রিটিয়াম কণিকার সংঘর্ষে একটি হিলিয়াম পরমাণু ও একটি নিউট্রন কণিকার উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়টিতে দুইটি ট্রিটিয়াম পরমাণুর সংঘর্ষে একটি হিলিয়াম পরমাণু ও দুইটি নিউট্রন কণিকার সৃষ্টি হয়। এই ধরণের কোন প্রক্রিয়া হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই বোমার আয়তন যতদূর ইচ্ছা বৃদ্ধি করে ভয়ঙ্কর অস্ত্র তৈরী করা যেতে পারে। তবে কতদূর আয়তনের অস্ত্র শত্রুর নিকট পর্য্যন্ত নিরাপদে নেওয়া যায় তা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সামরিক কর্ত্তৃপক্ষই বলতে পারেন।

পরমাণুবিক বিজ্ঞান মানবগোষ্ঠীর হস্তে এক বিরাট শক্তির উৎসের সন্ধান দিয়েছে। ইহা যুগপৎ মানুষের কল্যাণে অথবা মানবগোষ্ঠীর ধ্বংস প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হতে পারে। ইহার ধ্বংস করবার ক্ষমতা একটা ভয়ঙ্কর যে মানবগোষ্ঠী যদি একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের ইহার ধ্বংসাত্মক ব্যবহার থেকে নিবৃত না করে ত মানবগোষ্ঠীর পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা সমধিক। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পরমাণুবিক বোমা তৈরী করায় যারা বিশিষ্ট অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ রবার্ট ওপেনহাইমারের এক বিবৃতি উদ্ধৃত করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। তিনি বলেছিলেন—

“যুযুধান পৃথিবীর বিভিন্ন অস্ত্রশালায় অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রাগার-গুলিতে যদি পরমাণবিক বোমা নূতন অস্ত্র হিসাবে সঞ্চিত হতে থাকে, তবে কালক্রমে মানবগোষ্ঠী—Cos Alamos এবং Hiroshimaর নামগুলিকে পর্য্যন্ত গালাগালি দেবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একত্র হতে হবে ; নতুবা সকলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধ পৃথিবীর বহু অংশকে ধ্বংস করে এই কথাই বলে দিয়েছে। পরমাণবিক বোমা সকল লোকের বোধগম্য ভাষায় এই কথাই জানিয়েছে। অন্যান্য লোকে অন্য সময় অন্য যুদ্ধের বিষয়েও এই কথাই বলে দিল। কিন্তু তাদের কথা কেউ জানে নি। কিছু কিছু লোক মানবেতিহাসের একটা ভুল ধারণা নিয়ে মনে করে যে এখনও এ কথা কেউ জানবে না। আমরা তা বিশ্বাস করি না। আমাদের কার্য্যকলাপে আমরা যেন সমষ্টিগত বিপদের সম্মুখে আইনানুসারে ও মানবিকতার দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীব্যাপী এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে থাকি।”

পরমাণু-শক্তি ও তার ব্যবহার

(জনসংযোগমূলক বক্তৃতামালা)

তৃতীয় পর্যায়— পারমাণবিক চুল্লী (Nuclear Reactor)

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবনে ৮-৫-৫৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

শ্রীদিলীপ ভদ্র

শান্তিপূর্ণ যেসব কার্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মধ্যে পারমাণবিক চুল্লী বা Nuclear Reactor সর্বশ্রেষ্ঠ। আগামী যুগে অফুরন্ত শক্তির উৎস হিসাবে এই রিয়্যাক্টর মানবসমাজের অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন ও পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন জটিল গবেষণার ক্ষেত্রে রিয়্যাক্টর আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও নানাভাবে করিবে।

রিয়্যাক্টর জিনিষটি কি এবং তাহা কিভাবে শক্তি উৎপাদন করে তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদের কতকগুলি প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। প্রথমতঃ ফিশন (fission), যাহাকে আমরা বাংলায় বিদারণ বা বহুভাগকরণ বলিতে পারি। আমরা জানি যে যখন একটি উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন নিউট্রন একটি ভারী পরমাণু কেন্দ্রকে আঘাত করে তখন তাহা কয়েকটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা পরমাণুকেন্দ্রে ভাঙিয়া যায় এবং সেইসঙ্গে কিছু নিউট্রন ও কিছু পরিমাণ শক্তিও নির্গত হয়। উদাহরণস্বরূপ,

নিউট্রন$\rightarrow {}_{92}U^{235} + {}_{92}U^{236}$ (নিউট্রনের শোষণ)

$\rightarrow {}_{56}Ba^{139} + {}_{36}Kr^{94}$ + তিনটি নিউট্রন + শক্তি

(পরমাণুকেন্দ্রের বিদারণ)

এই হাল্কা পরমাণুকেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ উচ্চগতিসম্পন্ন ও তেজষ্ক্রিয় হয়। ইহারা সাধারণতঃ বিটা ও গামা রশ্মি নির্গত করে। পদার্থবিদ্যার ভাষায় বলিতে গেলে এরূপ একটি বিদারণে প্রায় ১৯০ মিলিয়ন ইলেক্ট্রনভোল্ট শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তির শ্রেণীবিভাগ অনেকটা নিম্নরূপ—

১৬৭ মি. ই. ভো. = বিদীর্ণ পরমাণুগুলির গতিশক্তি,
৫ " = দ্রুতগতি নিউট্রনগুলির গতিশক্তি,
৭ " = সঙ্গে সঙ্গে যে গামারশ্মি নির্গত হয় তাহার শক্তি,
৫ " = তেজষ্ক্রিয় হাল্কা পরমাণুকেন্দ্রগুলি হইতে নির্গত বিটারশ্মির শক্তি,
৬ " = তেজষ্ক্রিয় পরমাণুকেন্দ্রগুলি হইতে নির্গত গামারশ্মির শক্তি।

এছাড়া প্রায় ১১ মি. ই. ভো. শক্তি নিউট্রিনো (যাহাদের ভর বা বিদ্যুতাধীন কিছুই নাই) হিসাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং অপশক্তি উৎপাদনে কোন কাজে আসে না। যে গামারশ্মি নির্গত হয় তাহা বিদারণহারের সঙ্গে তাপউৎপাদনের হার নির্ধারণ করে। আর যে সকল উচ্চগতিসম্পন্ন নিউট্রন উদ্ভূত হয় তাহারা পরে আরও ক্রমিক বিদারণ ঘটায় এবং এইভাবে একটি বহুরাশিক প্রক্রিয়ার (chain reaction) সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে বিদারণক্ষম পরমাণুকেন্দ্রের সহিত নিউট্রনের

সংঘর্ষের ফলে এই যে প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে উদ্ভূত শক্তিকে সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগানো হয়। ইহাকে আমরা একটি তাপ ও বিকীরণ শক্তির উৎস বলিতে পারি যেখানে রাসায়নিক ক্রিয়ার বদলে পারমাণবিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হইতেছে। সেইজন্য শক্তিউৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতিতে যেসকল বিশেষত্ব থাকা দরকার, এখানেও সেগুলি আছে। যেমন, পরিকল্পনা ও পরিচালনা, অর্থাৎ, কিভাবে পরিকল্পনা করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ শক্তি সর্বাপেক্ষা অল্পায়াসে পড়িয়া যাইতে পারে, কি ধরণের উপাদান ও তাহাদের কিরকম বিন্যাস করিলে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায়, কিভাবে বহুরাশিক প্রক্রিয়াকে সুবিধামত আরম্ভ ও বন্ধ করা যায়, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, পারমাণবিক চুল্লীর অভ্যন্তরস্থ নিউট্রনের প্রবাহ এবং বহুরাশিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে কিভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহা জানিবার জন্য প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই গাণিতিক উপায়ের প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই হিসাবে, পারমাণবিক চুল্লীর এই তাত্ত্বিক দিকটাও চিত্তাকর্ষক।

নিউট্রনের কোন বিদ্যুতাধীন না থাকায় ইহা পদার্থের অভ্যন্তরে অবাধে প্রবিষ্ট হইতে পারে। শুধুমাত্র পরমাণুকেন্দ্রের অতি নিকটে ইহা পারমাণবিক বলের (Nuclear force) আওতায় গিয়া পড়ে। তখন দুই ধরণের ঘটনা ঘটিতে পারে—(১) বিক্ষেপণ (Scattering), (২) শোষণ (Absorption)। বিক্ষেপণ নানা ধরণের হইতে পারে, যেমন স্থিতিস্থাপক (elastic) ও অস্থিতিস্থাপক (inelastic) ইত্যাদি। আবার শোষণের জন্যও নানাধরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে বিদারণ বা fission। সাধারণত নিম্নগতিসম্পন্ন নিউট্রনের শোষণের ফলেই বিদারণের সম্ভাব্যতা বেশী। তাছাড়া, শোষণের ফলে বিদারণক্ষম আইসোটোপেরও উদ্ভব হয়। যেমন,

নিউট্রন$+ {}_{92}U^{238} \rightarrow {}_{29}U^{239} \rightarrow {}_{93}Np^{239} \rightarrow {}_{94}Pn^{239}$,

কিংবা,

${}_{90}Th^{232}$ + নিউট্রন$\rightarrow {}_{90}Th^{233} \rightarrow {}_{91}Pa^{233} \rightarrow {}_{92}U^{233}$।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি যথাক্রমে সংবর্তক (Converter) ও প্রতিপালক (Breeder) শ্রেণীর রিয়্যাক্টরে সংঘটিত হয়।

আমরা জানি যে রিয়্যাক্টরের অভ্যন্তরে একটি বহুরাশিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এখন, যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যাহাতে নিউট্রনের সংখ্যা বিদারণক্ষম পরমাণুকেন্দ্রের সংহতির ভিতর সবসময় অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে বহুরাশিক প্রক্রিয়াটি স্বতঃনির্ধারিত অবস্থায় আসে; ইহা সম্ভব হইতেছে এই কারণে যে একটি নিউট্রনের শোষণের ফলে উদ্ভূত বিদারণে একাধিক নিউট্রনের মুক্তিলাভ ঘটিতেছে। একটি আদর্শ রিয়্যাক্টরে আমরা জ্বালানী হিসাবে ${}_{92}U^{235}$ ব্যবহার করিব যাহা নিম্নগতিসম্পন্ন নিউট্রনের সাহায্যে বিদীর্ণ হইবে। এই বিদারণের ফলে আমরা গড়ে ২·৫ টি নিউট্রন পাইব এবং মোটামুটিভাবে ১৯০ মি. ই. ভো শক্তির উৎপাদন ঘটিবে। তেজষ্ক্রিয় হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রগুলির গতিশক্তিই তাপ উৎপাদনের প্রধান উৎস এবং এই শক্তি প্রবহমান কোন তরলপদার্থের (যাহা সহজে তাপ পরিবহনে সক্ষম) সাহায্যে অন্যত্র অপসারিত করা সম্ভব। এইসব ছাড়াও রিয়্যাক্টরের অভ্যন্তরে আর একটি পদার্থ থাকে যাহাকে নিয়ামক (moderator) বলে; নিয়ামক হিসাবে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন বা কার্বন জ্বালানীর সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই নিয়ামকের সাহায্যে বিদারণজনিত নিউট্রনসমূহের গতিবেগ কমাইয়া নির্ধারিত মানে লইয়া আসা হয়। এই মন্দীকরণের (slowing down) এর সময় অনেক

নিউট্রন প্রক্রিয়াকেন্দ্র (Reaction core) হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। এইজন্য চতুর্দিকে একটি নিউট্রন প্রতিফলক ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ উচ্চগতিসম্পন্ন নিউট্রনসমূহ অল্পই শোষিত হয় আর নিম্নগতিসম্পন্ন নিউট্রনসমূহ অধিকাংশই বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেইজন্যই প্রক্রিয়াকেন্দ্র বেশীসময় থাকে। ইহার পরই স্বতঃ নির্ধারিত অবস্থার (Self-sustaining or Critical) উদ্ভুব হয় যখন একটি U^{235} পরমাণুকেন্দ্রের বিদারণের ফলে উদ্ভূত নিউট্রনসমূহ দ্বারা আর একটি মাত্র বিদারণ সম্ভবপর হয়।

বিভিন্ন রিয়্যাক্টরের শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ তাহাদের উদ্দেশ্যে, গঠনপ্রণালী, জ্বালানী ইত্যাদির বিভিন্নতা হিসাবেই করা হয়। জ্বালানী হিসাবে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম (যাহার মধ্যে ০·৭% U^{235}), কিয়ৎপরিমাণে উর্বর ইউরেনিয়ম (যাহার মধ্যে ১-২% U^{235}) বহুলপরিমাণে উর্বর ইউরেনিয়ম (যাহার ৯০% U^{235}) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। রিয়্যাক্টর নানা প্রকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, যেমন গবেষণা, আদর্শ বা prototype, তাপের উৎস, বিদ্যুৎশক্তির উৎস, আইসোটোপ উৎপাদনে (যাহা জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানে আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে), যানবাহন চালনার যন্ত্র, ইত্যাদি। তাহাছাড়া, রিয়্যাক্টরে নানাধরণের তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় যাহা তাপপরিবহনে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। যেমন জল, তরল সোডিয়ম, ভারী জল, ইত্যাদি। অনেক সময় রিয়্যাক্টরে নিয়ামক, জ্বালানী এবং তাপ পরিবহনকারী তরল পদার্থ একসঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, যেমন ধরুন ইউরানিল সালফেট। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ জল খুব উচ্চ চাপে তাপপরিবাহী পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

নিয়ামক হিসাবে সাধারণতঃ ক্যাডমিয়ম, গ্রাফাইট, বেরিলিয়ম, জিরকনিয়ম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এই সব ধাতুর কিছু দণ্ড রিয়্যাক্টরের ভিতরে প্রবেশ করানো থাকে এবং এগুলির সাহায্যে আমরা বহুরাশিক প্রক্রিয়ার গতিবেগ নিয়মিত করিতে পারি।

নিয়ামক ছাড়াও আর একটি জিনিষের দরকার হয় যাহাকে আমরা চালনা দণ্ড (control rod) বলিতে পারি। ইহার সাহায্যে যদি কখনও বহুরাশিক প্রক্রিয়া আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তাহা হইলে আবার উহাকে সাধারণ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়। সাধারণতঃ এগুলি এমন কতকগুলি পদার্থের দণ্ড যাহাদের নিউট্রন শোষণ ক্ষমতা প্রচুর। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে এগুলিকে চালানো হয়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

(চতুর্থ পর্যায়)

দেবীচরণ খাঁ
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

কাগজে আমরা প্রায়ই পড়ি, রাশিয়া বা আমেরিকা কোথাও পরমাণবিক বোমা ফাটিয়েছে যার ফলে প্রচুর তেজস্ক্রিয়তাজাত কণা বায়ুর সঙ্গে মিশে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কোথাও বৃষ্টির সঙ্গে কোথাও খাদ্যের মধ্যে দিয়ে ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শরীরের বাইরে ভেতরে পড়ে নানারকমের জটিল অসুখের সৃষ্টি করছে অথবা আমাদের বংশগতির ক্ষতি সাধন করছে। ফলে তেজস্ক্রিয়তার কথা শুনলে আমরা ভীতই হয়ে পড়ি, এবং বলে থাকি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদের পক্ষে মুষল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে দৈনন্দিন কাগজে ওঠে না এমন কিছু কিছু সংবাদও আছে, যেগুলো জানলে আমরা বুঝতে পারব, তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার মানুষের সমৃদ্ধতর জীবনের ইঙ্গিতই বহন করে আনছে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের অশুভ প্রয়োগ বন্ধ করতে পারলে এই আবিষ্কার আমাদের বৃহৎ সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রবন্ধে আমরা সেই শুভ প্রয়োগের দিকটি আলোচনা করব।

তেজস্ক্রিয়তা কি জানতে গেলে পরমাণু কেন্দ্রকের (atomic nucleus) গঠন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। পরমাণু কেন্দ্রকগুলি প্রোটন্ ও নিউট্রন নামক দুধরণের মূল কণা দিয়ে তৈরী, এদের ভর (mass) প্রায় সমান, শুধু প্রোটনের ধনাত্মক তড়িতাধান আছে, নিউট্রনের কোনরকম তড়িতাধান নেই। যে সব কেন্দ্রকের প্রোটনের সংখ্যা সমান, তাদের রাসায়নিক ক্রিয়া একরকম, তাই তাদের একই গোষ্ঠিতে ফেলা হয়। এই গোষ্ঠির নাম আইসোটোপ গোষ্ঠি। যেমন হাইড্রোজেন, ডয়টেরন, ট্রাইশিয়াম, এদের সবাইকার প্রোটনের সংখ্যা এক, এই তিনটিকে হাইড্রোজেনের, আইসোটোপ বলা হয়। হাইড্রোজেনের কোন নিউট্রন নেই, ডয়টেরনের একটা নিউট্রন, ট্রাইশিয়ামের দুটো। কোন আইসোটোপ গোষ্ঠিতে নিউট্রনের সংখ্যা যথেচ্ছভাবে বাড়ানো যায় না, তা নির্ভর করবে মূলত প্রোটনের সংখ্যার ওপর, এবং তাছাড়া কেন্দ্রীনের বলের প্রকৃতি, তলের প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর। এইভাবে দেখা যায় কোন গোষ্ঠিতে পাঁচটা আইসোটোপ আছে; যেমন কার্বন (প্রোটন ৬; নিউট্রন ৪, ৫, ৬, ৭, ৮,); কোথাও বা দশটা; যেমন টিন (প্রোটন ৫০; নিউট্রন ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৪)। কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যাটা যখন সমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন কেন্দ্রকটা আলফা কণা, বিটা কণা ও গামা রশ্মি বের করে দিয়ে একটা স্থিত সমতায় চলে আসতে চায়। যেমন কার্বন^{১২} (প্রো ৬, নি ৬) ও কার্বন^{১৩} (প্রো ৬, নি ৭) নিজেরাই স্থিত সমতায় আছে, তাই এরা ভাঙে না। কিন্তু কার্বন^{১০} ও কার্বন^{১১}তে নিউট্রনের সংখ্যা কম; তাই ওরা একটা করে পজিট্রন (ইলেকট্রনের সমান ভর, ধনাত্মক তড়িতাধান) ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে বোরণ^{১০} (প্রো ৫ নি ৫) ও বোরণ^{১১} (প্রো ৫ নি ৬) হয়ে স্থির হয়। অপর পক্ষে কার্বন^{১৪}র নিউট্রন সংখ্যা বড় বেশি, তাই সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে

নাইট্রোজেন^{১৪} (প্রো ৭ নি ৭) হয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়। এই অস্থির কেন্দ্রকগুলিকে তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক বলে।

প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক আছে। সীসের চেয়ে ভারী কেন্দ্র করা সাধারণতই অস্থির। ইউরেনিয়াম থেকে শুরু করে ওপরের সবাই ক্রমাগত আপনা থেকেই ভাঙতে ভাঙতে নানা মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত হতে হতে শেষে সীসেতে এসে থামে। কিন্তু জোলিও কুরিরা দেখালেন, কৃত্রিম ভাবে ওতেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক তৈরী করা যেতে পারে। যেমন সোডিয়াম^{২৩}কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ায় তা সোডিয়াম^{২৪} হয়ে দাঁড়াবে। সোডিয়াম ^{২৪} অস্থির, সুতরাং তেজস্ক্রিয়, তা একটা ইলেকট্রন আর দুটো গামা কণা বের করে ম্যাগনেসিয়াম চব্বিশ হয়ে দাঁড়াবে। এই ভাবে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রচুর কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরী করা হয়েছে। এদের মধ্যে সোডিয়াম ছাড়াও আর চারটে খুব ব্যবহৃত হয়; যেমন, আয়োডিন^{১৩১} (৮ দিন লাগে অর্ধেক সংখ্যায় হয়ে দাঁড়াতে, একটা বিটা কণা (ইলেকট্রন), ও একটা গামা দেয়); ফসফোরাস^{৩২} (অর্ধজীবন ১৪·৩ দিন, একটা বিটা); গন্ধক^{৩৫} (অর্ধজীবন ৮৭ দিন, বিটা দেয় একটা); কার্বন^{১৪} (অর্ধজীবন ৬০০০ বছর, একটা বিটা)। আজকাল পারমাণবিক চুল্লীতে এদের শিল্পগত পরিমাণে তৈরী করা যায়।

আলফা, বিটা, অথবা গামা কণাকে কটা করে বেরিয়েছে, অথবা আদৌ বেরিয়েছে কিনা, তা ধরবার জন্যে এক ধরণের যন্ত্র আছে, তার নাম গাইগার কাউন্টার। আলফা, বিটা ও গামার জন্যে বিভিন্ন রকমের গাইগার কাউন্টার ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে নানা ধরণের পরীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে, যা মানুষের জীবনকে সুস্থ ও ঐশ্বর্যময় করে তুলছে। প্রথমতঃ চিকিৎসা জগতে। আমরা জানি, কর্কট রোগে রেডিয়ামের ব্যবহার করা হয়। রেডিয়াম প্রাকৃতিক ভাবে তেজস্ক্রিয়। তা থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলফাকণা বেরিয়ে রোগাক্রান্ত কোষ সমষ্টিকে পুড়িয়ে দেয়। সুতরাং রোগ আর অন্য কোষসমষ্টিতে প্রসারিত হতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানিকরা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়েই বসে রইলেন না, কারণ তার দাম অত্যন্ত বেশি, সাধারণের নাগালের বাইরে। তাঁরা কৃত্রিমভাবে কোবল্ট ^{৬০} আইসোটোপ তৈরী করলেন এবং দাম অনেক কম, অথচ এর থেকে জাত কণার শক্তিও খুব বেশি। সুতরাং সস্তায় কর্কট রোগের চিকিৎসার উপায় বের হল।

অনেক সময়ে রক্তে বড় বেশী লোহিত কণিকা জমে গিয়ে polycythaemia vera বলে একধরণের রোগ হয়। ফসফরাস^{৩২}এর তীব্র বিটা কণা দিয়ে তাদের কমিয়ে দেওয়া হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থিতে কর্কট রোগ হলে অথবা থাইরয়েডের অতি বৃদ্ধি হলে আয়োডিন^{১৩১} ওষুধ হিসেবে খাইয়ে দেওয়া হয়। আয়োডিন থাইরয়েড চলে যায়, তার বিটা ও গামা কর্কটরোগাক্রান্ত কোষসমষ্টিকে ধ্বংস করে, অথবা অতিবৃদ্ধি নিবারণ করে। থাইরয়েডের কোন রোগ হয়েছে কিনা সেটাও নির্ধারণ করা হয় আয়োডিন^{১৩১} দিয়ে। আমাদের থাইরয়েড গ্রন্থি খাদ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়োডিন শোধন করে। এই পরিমাণটা আমাদের জানা আছে। এখন, সাধারণ আয়োডিনের বদলে যদি তেজস্ক্রিয় আয়োডিন দেওয়া হয়, তাহলে ওই পরিমাণ আয়োডিন থেকে কটা বিটা কণা বের হবে তার হিসেব আমরা করতে পারি। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন খাইয়ে দেওয়া হয়, তারপর তার গলার কাছে গাইগার কাউন্টার যন্ত্র ধরে বিটা কণা গণা হল। জানা বিটা কণার সংখ্যা

ও কাউন্টারে গণা সংখ্যা থেকে আমরা সহজ ঐকিক নিয়মের সাহায্যেই বের করতে পারি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির থাইরয়েড কত কম বা বেশী আয়োডিন নিয়েছে, অর্থাৎ তার অসুস্থতার মান কত।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হয় বোধ হয় জৈব রসায়ণ বিষয়ে। নানা ধরণের পরীক্ষায় তাদের গতিচিহ্নক (tracer) হিসেবে কাজে লাগান হয়। যেমন, হেভিসি জানতে চাইলেন একটা গাছ কত পরিমাণ সীসে গ্রহণ করে ও তার কোন্ অঙ্গে কতখানি নেয়। তিনি লেড নাইট্রেট দ্রাবকে থোরিয়াম বি দিলেন; থোরিয়াম বি রাসায়ণিকভাবে সীসে, কিন্তু তেজস্ক্রিয়। এখন গাছের শিকড় যত থোরিয়াম বি শুষতে লাগল ও বিভিন্ন অঙ্গে পাঠাতে লাগল, সেই সেই অঙ্গ থেকে সমানুপাতিকভাবে বিটা কণা বেরুতে লাগল এবং তা' গাইগার কাউন্টার দিয়ে মাপা হল। সুতরাং কাউন্টারের সাহায্যে আমরা প্রতি মূহুর্তেই সীসে কোথা কিভাবে যাচ্ছে ও জমা হচ্ছে জানতে পারলাম।

আমাদের শরীরের গঠন ও পোষণের জন্য জৈবপদার্থের মধ্য দিয়ে নানা মৌলিক পদার্থ আমরা গ্রহণ করি। জীবিত প্রাণীর শরীরে কোন্‌টা কোন অঙ্গে যায় এবং কি অবস্থায় থাকে, তা নির্ধারণ করতে গেলেও জৈবপদার্থের মধ্যে মৌলিক স্থির পদার্থের বদলে তার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং কিছুক্ষণ পরে বিভিন্ন কোষসমষ্টি থেকে জৈব যৌগিক পদার্থ বের করে নিয়ে কাউন্টারের সাহায্যে তার তেজস্ক্রিয়তা মেপে বিভিন্ন কোষসমষ্টিতে সেই মৌলিক পদার্থ কি পরিমাণে গেছে বের করতে হবে।

কখনও কখনও কোন বস্তুতে একটি বিশিষ্ট পদার্থের পরিমাণ জানার দরকার হয়। যে পদার্থটাকে ওই বস্তু থেকে আলাদা করা সম্ভব নয় তার পরিমাণের স্বল্পতার জন্যে। যেমন কোন যৌগিক পদার্থের অনেকগুলি অনুরূপ যৌগিক পদার্থের মিশ্রিত অবস্থার মধ্যে থেকে পরিমাণ বের করা। তখন তরলীকরণ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। পরিমাপ্য বস্তুর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যৌগিক নিয়ে তার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নিখুঁতভাবে মাপা হয়। তারপর তাকে মিশিয়ে দেওয়া হয় মিশ্রণের সঙ্গে। এখন মিশ্রণে পরিমাপ্য বস্তুর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। সুতরাং কিছু নষ্ট করতে তাকে অন্য পদার্থ থেকে আলাদা করে নেওয়া গেল। এর তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণ মাপা হল এবং মূল তৈরি করা বস্তুর সমায়তন পরিমাণের জন্য কত তেজস্ক্রিয়তা হবে বের করা হল। বলা বাহুল্য, তেজস্ক্রিয়তা কমে যাবে। কতখানি কমলো জানলে বলে দেওয়া যাবে, কতখানি অতেজস্ক্রিয় পদার্থ দরকার হয়েছে তরলীকরণের জন্যে। সেইটাই মিশ্রণের মধ্যে পরিমাপ্য যৌগিক পদার্থের পরিমাণ।

এই উপায় রোগীদের শরীরে রক্তের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; রোগীর থেকে খানিকটা রক্ত বের করে নেওয়া হল। রক্তটা কিছু তেজস্ক্রিয় ফসফেটের সঙ্গে ঝাঁকন হল ও নুনজলে ধুয়ে নেওয়া হল। লোহিত-রক্তকণিকারা কিছু ফসফরাস^{৩২} নিয়ে নিল। এর তেজস্ক্রিয়তা মাপা হল, তার নির্দিষ্ট পরিমাণ আবার ইনজেকশন করে দেওয়া হল। এটা রক্তের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল। এখন ওই পরিমাণ রক্ত আবার বের করে নেওয়া হল এবং তার তেজস্ক্রিয়তা মাপা হল। তেজস্ক্রিয়তার হ্রাসের পরিমাণ থেকে ঐকিক নিয়মে বলে দেওয়া যায়, রোগীটির শরীরে কত রক্ত আছে।

শুধু চিকিৎসা, উদ্ভিদবিদ্যা বা রসায়ণেই নয়, শিল্পেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রচুর ব্যবহার করা হয়।

হাওয়াতে এক কোটি ভাগের একভাগ ক্রিপটন ও দশকোটি ভাগের একভাগ জেনন গ্যাস আছে। বাতাস তরল করার সময় এদের আলাদা করা মুশকিল। এই কাজে প্রথমেই জানতে হবে তরলকারী যন্ত্রের মধ্যে কোথায় তারা আছে। এইজন্যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজষ্ক্রিয় ক্রিপটন ও জেনন বাতাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরা বাতাসের ক্রিপটন জেননের সঙ্গে মিশিয়ে যায় সমভাবে। তখন একটি গাইগার কাউণ্টারকে তরলকারী যন্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরালেই ধরা পড়ে কোথায় কেমন ক্রিপটন ও জেনন আছে।

ইঞ্জিনের কোন একটি অংশকে তেজষ্ক্রিয় করে তুললে তার ক্ষয়জাত গুঁড়োর তেজষ্ক্রিয়তা থেকেই মাপা যায় সেই অংশটি কতখানি ক্ষইল। পিষ্টনে লুব্রিকেটিং তেলটা এক পাশের কিছু ক্ষইয়ে অপর পাশে জমা করে। প্রথম অংশটা তেজষ্ক্রিয় হলে, শেষকালে অপর অংশে জমা তেজষ্ক্রিয়তা থেকে মাপা যায়, কতখানি ক্ষয়ে ওপাশ থেকে এপাশে এল।

কাপড়ে রঙ করতে গেলে সুতোতে তেল দিয়ে রঙ ধরাতে হয়। এই তেল যদি বিভিন্ন জায়গায় বেশি কম হয় তাহলে রঙ ঠিক একভাবে সব জায়গায় পড়ে না। তেলটাতে যদি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই কাপড়ের বিভিন্ন জায়গায় ছোট গাইগার কাউণ্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা যেতে পারে তেলটা সমভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা।

সার্ভে করার সময় খোলা মাঠে খোঁটা পুঁততে হয়, তা অনেক সময় খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে বের করতে হয়। খোঁটার মাথায় একটু কোবল্ট ^{৬০} মাখানো থাকলে একটা গাইগার কাউণ্টারের সাহায্যে একেবারেই স্থির করা যায় কোথায় খোঁটা আছে। সঙ্কর ধাতুতে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ঢুকিয়ে অনায়াসেই বের করা যায় কোন ধাতু কতখানি উবে যায়। ধাতুর প্লেটের ওপরে অন্যধাতু, যেমন নিকেল, তামা, লোহা ইত্যাদি পলেস্তারা উত্তাপে কি পরিমাণে প্লেটের ভেতর ঢুকে যায়, তা বের করতে হলে পরীক্ষামূলক প্লেটটিতে তেজষ্ক্রিয় নিকেল ইত্যাদির পলেস্তারা দেওয়া হয়, ও কাউণ্টারের সাহায্যে তাদের অন্তর্গমনের পরিমাণ মাপা হয়। সঙ্কর ধাতুতে গন্ধক বা সেলেনিয়াম নলের পরিমাণও তেজষ্ক্রিয়া গন্ধকের সাহায্যে জানা যায়। কোন সঙ্কর ধাতুতে কোন ধাতু কোথায় কি পরিমাণে আছে জানতে গেলেও তেজষ্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়।

সর্বাধুনিক কাগজের কারখানায় কাগজের শীটের এক পাশে তেজষ্ক্রিয় ক্যালসিয়াম ^{৪৫} রাখা হয় ও অপর পাশে বিটা কণা মাপার গাইগার কাউণ্টার রাখা হয়। নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কোথাও কাগজ মোটা হয়ে গেলে বিটা কণা কমে যায়, আর সরু হয়ে গেলে বিটা কণা বেড়ে যায়। কাউণ্টারের সঙ্গে সংযোগের সাহায্যে যথাক্রমে কাগজ সরু করা ও মোটা করার বন্দোবস্ত আছে।

পেট্রল পাইপলাইনের পাঠানোর কেন্দ্র থেকে এক প্রকৃতির তেল পাঠাবার পর যখন নতুন প্রকৃতির তেল পাঠানো হয়, তখন গ্রাহক কেন্দ্রে বোঝা মুশকিল ঠিক কখন তেলের প্রকৃতির পরিবর্তন হল। এখন, যদি নতুন প্রকৃতির তেলের মুখে খানিকটা তেজষ্ক্রিয় পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়, আর গ্রাহক কেন্দ্রে একটা কাউণ্টার রাখা হয়, তাহলে নতুন তেল আসা মাত্রই কাউণ্টারের গণনাসংখ্যা বেড়ে যাবে। তখন গ্রাহক কেন্দ্রের লোকেরা বুঝতে পারবে, এই নতুন তেল এল।

অধিকাংশ কারখানায় ঘূর্ণায়মান বেল্টটি ক্রমাগত স্থির বিদ্যুত জমা করে, এবং শেষে স্থানীয় বজ্রাঘাত ঘটিয়ে কারখানার ক্ষতি সাধন করে। এই স্থির বিদ্যুৎটি সরিয়ে ফেলার জন্যে অনেক রকম উপায়

বের করা হয়েছিল। যেমন আলট্রাভায়োলেট দিয়ে চার পাশের বাতাসকে তরিৎবাহী করে তুলে বিদ্যুৎ মাটিতে পাচার করে দেওয়া, কিংবা চারিপাশের বাতাসকে সিক্ত ও উত্তপ্ত করে তুলে বিদ্যুৎ মাটিতে নামিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রথমটিতে ভয়ানক খরচ, দ্বিতীয়টিতে কর্ম্মীদের ভীষণ অসুবিধা। বর্তমানে বেল্টের কাছে থালিয়াম ^{২০৪} অথবা ট্রনশিয়াম ^{৯০} রাখা হয়। এদের তেজষ্ক্রিয়তা থেকে জাত বিটা কণা বাতাসকে বিদ্যুৎ পরিবাহী করে তোলে, এবং স্থির বিদ্যুৎ ক্রমাগত ধীরে ধীরে মাটিতে মিশিয়ে যায়।

তেজষ্ক্রিয়তাকে মানুষের উপকারে লাগাবার জন্যে নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ক্রমশই এর ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠবে।

The Theatre in Bengal

S. K. De

The first Bengali theatre was born in Calcutta as early as 1795, but it was an isolated episode. A Russian literary adventurer, Herasim Lebedeff, took a fancy to stage, with song, dance, and music, an improvised Bengali play with the help of Bengali actors and actresses. Nearly forty years lie between this first staging of a Bengali play and the second, which occurred in 1833 on a temporary stage set up by one Nabin Chandra Basu in his own house at north Calcutta, but which did not last for more than two years. The actual history of the Bengali theatre did not begin till 1857, when three private theatrical parties appear to have sprung up in different parts of north Calcutta. A year later, in 1858, came the more well known Belgatchia Theatre, but it staged only one drama, a Bengali version of *Ratnavali*, and came to an abrupt end in 1861 on the untimely death of one of its princely patrons.

This was the age of amateur private theatricals; and for the next ten years more than half a dozen such parties came in succession, each having a shortlived existence. Although set up in private houses and meant for privileged classes, they yet succeeded in staging some of the best productions of contemporary playwrights, and drew full houses. The casualness of their performances, however, and the limited seating capacity soon led to a demand for a public theatre, which was at last opened with a modest stage, under the name of the National Theatre, on the 7th December 1872 by one such amateur party, namely, the enterprising Baghbazar Amateur Theatre, later called the Shyambazar Nātya-samāj. The National Theatre became the precursor of the regular public stage in Bengal, which, in spite of many vicissitudes, has continued, through the once famous Bengal, Great National, Star, Minerva, Emerald, Classic, Kohinoor, Manmohan and Cornwallis Theatres, up to the present day.

The Bengali theatre, like Bengali drama, is thus a creation of modern times, and partakes of all the salient features of the modern stage. But it came into existence at a time when Bengal was passing through an age of uncertainty and transition. Diverse and conflicting influences were active. The rich tradition of the older Sanskrit theatre had vanished, but there was a revival of interest in Sanskrit plays. We find therefore that regular dramatic performances open on the different Bengali stages of 1857 with a translation of *Abhijñāna-śakuntala* by Nanda Kumar Ray and an adaptation of *Veṇī-saṃhāra* by Ram Narayan Tarkaratna. As has been mentioned, the only drama staged by the Belgatchia Theatre in 1858 was a version of *Ratnāvalī*. Other classical masterpieces, like *Vikramorvaśī* and *Mālatī-mādhava*, followed on other stages. This was presumably because original Bengali plays were not available. But the earlier Bengali plays,

when they came to be written, not only utilized Sanskrit mythological subjects, but also retained some of the characteristics of the Sanskrit drama like *nāndī*, a blessing pronounced as a prologue, and its act division. Even Madhusudan Datta, who emphatically declared his intention 'to throw off the fetters forged by a servile admiration of everything Sanskrit', translated *Ratnāvalī* into English and betrayed an unmistakable influence of Sanskrit by his retention of the *vidūṣaka*, the jocose companion and confidential friend of the hero of a play, and by the scene of Padmāvatī's union with the king which he depicted on the model of *Śakuntalā*. The Bengali theatre, even if it did not accept the technique and tradition, could not, at least in its earlier phases, entirely escape the general influence of Sanskrit drama, while, in its later phases, it eagerly utilized the vast possibilities of dramatic themes which Sanskrit literature and mythology afforded.

But there also existed the traditional Yātrā as a semi-dramatic form of popular amusement. It had, however, declined in tone and temper and could hardly satisfy the new-born taste of the educated Young Bengal Although greatly influenced by it, the Bengali theatre did not, as a matter of fact, grow out of the Bengali Yātrā, nor did the demand for the theatre come from the class which still patronized the Yātrā. It is not surprising, therefore, that in the preface to his *Ratnāvalī*, Ram Narayan Tarkaratna, himself an orthodox pandit, should speak in contemptuous terms of the popular Yātrā and vote in favour of the new drama based on English and Sanskrit models. At the same time, it must be said that some of the peculiar features of the Yātrā, such as its overflow of song and dance, its long drawn-out theme, its predilection for declamation, rhetoric. and irrelevant farcical episodes, continued to manifest themselves throughout the history of the Bengali theatre down to the days of Girish Chandra Ghosh and Kshirod Prasad, and even up to the present time.

But there can be no doubt that the origin of the Bengali theatre is to be sought in the desire for a less archaic form of amusement felt by a generation which, under the new system of English education, had their taste developed for a new theatre of the European type. The Young Bengal, who had studied European literature with something of the same newly awakened interest as inspired Renaissance scholars to study Greek and Latin, had as much enthusiasm for everything new as contempt for everything old. The English playhouses of Calcutta did not entirely satisfy them. What they did at first, therefore, was not to create a Bengali theatre, as it was not possible to do so in the absence of Bengali plays, but to organize amateur English theatricals in which Shakespeare and English translations of Sanskrit classics were staged. It was these amateur theatricals of an alien kind which, between 1831 and 1855, were the real forerunners of the Bengali stage which followed in their wake.

From these antecedents and background will be understood the general trend and characteristics, as well as the strength and weakness, of the Bengali theatre as it grew. There was no question of the model to be followed. Bengal simply adopted the mid-

Victorian stage with all its accessories of painted scenery, costume, and make-up, but fortunately with a genuine love of the drama and of amateur acting as an art.

The Bengali theatre revealed at the outset a more healthy tone and greater artistic endeavour because of the presence in it of educated and enthusiastic young men who knew what they were doing. The influence of the decadent Yātrā no doubt persisted, but the initial influence of the Sanskrit drama was healthy, while European examples were eagerly seized and skilfully adapted. A passion for music was still retained by frequent infusion of songs, partly on the Shakespearean model, but chiefly through the influence of the Yātrā. With admirable energy the Bengali theatre attempted all kinds of stage-craft and experimented in all types of plays. The idea of romantic tragedy came from Shakespeare, although certain exaggerations were bound to creep in; while the English tragi-comedy, light opera, shrewd comedies of manners, and loose farcical productions were also cultivated. There never was a real conflict between Sanskrit and English models; and, side by side, Kālidāsa and Shakespeare found a place of honour. But, in the true spirit of the Renaissance, materials were exploited from all possible sources. With a real power of assimilating foreign influences, a high standard was usually maintained and the best features of the Western theatre reproduced in a new form.

Passing through an initial stage of Sanskrit and English adaptations, the types of plays produced included mythological and saint plays (a prominent feature of the Yātrā), dramas of romance and love, histroical and social tragedies, satirical sketches of contemporary manners, and patriotic historical plays of heroic sacrifice. The Bengali theatre was fortunate in having a remarkable series of actor-dramatists and a large number of actors and actresses who have lent their names to the creation of a living histrionic tradition.

But many drawbacks still lingered. The crude stage of the last century, its plays of inordinate length, its love of spectacular shows, its dazzling oriental costume, painted scenery, brilliant light and noisy concert, were slow to disappear. The excess of song and dance introduced in all possible contexts to the accompaniment of slipshod modern tunes and the inevitable harmonium, the frequent intrusion of purposeless farcical interludes, the preference for blood-and-thunder tragedies with their interminable rant and rhetoric, the relishing of mythological or semi-religious plays which possess more sentiment than action—all these still remained.

In spite of some good actors, the general standard of acting, with its tendency towards declamation and strained gesticulation, did not always reach a high level. Although actresses are said to have figured in the early theatre of Herasim Lebedeff and Nabin Chandra Basu, the employment of men for female rōles continued down to the time of the National Theatre, until women actors were introduced on the public stage by the Bengal Theatre.

It is the far-reaching reforms of Sisir Kumar Bhaduri, himself a brilliant professional actor and man of taste and culture, that in recent years raised the tone and temper of the Bengali theatre. To this effort should be

added the refining influence of Rabindranath Tagore. We have now a better type of acting, plays of not more than three hours' duration, less song, dance, and low comedy of the Yātrā type, shorter scenes and more brisk dialogue, and more appropriate dress and scenery which avoid anachronisms and absurdities.

So far as circumstances permit, the Bengali theatre has been, and still is, the best in India; but deficiencies still remain. Stage-craft is not yet up to the mark; and much is still desirable in the way of lighting devices, colour schemes, and scenic effects. In some theatres, again, there is not only a complete disregard of the demands of art, but also of the comforts of the audience who are accommodated in poorly equipped and often unclean playhouses.

These deficiencies, however, would not have mattered much had there not been in recent times an unfortunate dearth of good plays and good actors. The stage-quality of the majority of the plays is poor because the authors possess little idea of stage-technique and even less perhaps of the dramatic possibilities of their themes. While the ordinary actor is unwilling to go through a course of severe apprenticeship, good actors are now being lured away by the cinema which they find more lucrative. We have had several good actresses but, generally speaking, the class from which they are recruited and the little education that they possess make it difficult to train them in the ideas of life and society of which they have hardly any direct knowledge.

But the greatest difficulty is that the cinema, being today a much better commercial venture, takes away all the money and leaves little for the theatre, which can never disregard artistic requirements and proceed entirely on a commercial basis. It is useless to put all the blame on the unthinking playgoers; for the average playgoer, however faulty his taste is, loves a good play when it is properly produced. But an artistic success need not necessarily be a commercial success. The Bengali theatre appears to be doomed unless enough money is forthcoming to effect the necessary improvements and enable it to insist upon a high standard irrespective of commercial gain.

We understand that the Government of India has instituted an Academy of Fine Arts. We do not yet know much about it except its high-sounding name. We have as yet no idea as to how it proposes to function, nor what its activity would be towards protecting the interests of the theatre in the different provinces. But such problems as we have briefly indicated here should certainly come within its purview. We have as yet no permanent national theatre in Bengal, nor any training institute for young aspiring actors. We do not grudge people's enthusiasm for a public stadium for sports in Calcutta, but should there not be equal enthusiasm for a Bengali theatre in Calcutta, Which should worthily keep up its century-old histrionic tradition ?

The Security Council

Chaya Bhattacharyya

The first purpose of the U. N. is the maintenance of international peace and security. Just as the League of Nations emerged out of the first World War, so the U. N. was the product of the second World War. The framers of the U.N. Charter at San Francisco attempted to devise a scheme for an international organization which would avoid the weaknesses of the League of Nations which had ultimately failed due to lack of support on the part of the nations of the world.

The emphasis in the Charter was laid on a security system the keystone of which was the Security Council. It was given the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. On the functioning of the Security Council then, has depended to some extent the success or failure of the U. N. in its main task of maintaining peace. I shall deal first with the functioning and powers of the Security Council, its composition, procedure and voting arrangements. I shall go on to consider how far it has been effective in fulfilling its functions as the dominant security organ as laid down in the Charter and what have been the reasons for its failure. Lastly I shall discuss the Security Council's future role and the possibilities of remedying its defects.

The six principal organs of the U. N. are the general assembly, consisting of the representatives of all the members of the U. N., the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of justice and the Secretariat. The field of action of the Security Council is important but more restricted than that of the General assembly. The Security Council is empowered firstly, to take collective measures for preventing or removing threats to the peace, and suppressing acts of aggression or breaches of the peace, and secondly to effect the pacific settlement of disputes by making recommendations on procedures and terms of settlement in situations which have not reached the stage where more vigorous action to prevent war is required. A subsidiary function of the Security Council is to establish a system for the regulation of armaments to promote and maintain peace, and to enter into agreements to make armed forces and facilities available to the Security Council for enforcement action. The Security Council has also a few continuing activities, and the idea of security has been stretched to enable the Council to share in the admission of new members, the suspension or restoration of rights of members, expulsion of members, procedure of amendment of the Charter, election of judges of the I. C. J.,

administration of certain Trust areas and the selection of the Secretary General. But it has been designed chiefly for crises and prompt effective action on behalf of the U. N. in maintaining peace.

The Security Council is composed of representatives of 11 States, 5 of which are designated in the Charter to be permanent members. They are the Republic of China, France, the Soviet Union, the U. K. and U. S. The other 6 are non-parmanent, 3 elected every year for a 2-year term by the General assembly and not re-eligible for election at the end of the term. The non-permanent members are selected on the basis of their contribution to the maintenance of international peace and security and also to equitable geographical distribution. There are no provisions for any change in the permanent membership which along with the voting procedure account the anomaly of a permanent seat continuing to be held by Nationalist China which is not a great power. The non-permanent seats are now distributed as follows ; 2 seats go to Latin America, one each to W. Europe, E. Europe, the Middle East and the British Commonwealth. There have on occasions been contests for seats between the U. S. R. and Soviet Union, and with the increased membership of Asia in the U. N. There has been some demand for a wider representation of blocs and areas.

The Security Council is organised to function continuously and to have delegates in permanent residence, and it is supposed to meet periodically. It may set up subsidiary organs such as Standing Committees on particular subjects and ad hoc commissions for the investigation or conciliation of disputes. A President is automatically chosen in rotation serving for 1 month. The position is one of prestige as well as power as was shown by the fact that the Soviet representative Mr. Malik held the Council paralyzed in the month he was in office after the Korean struggle had begun. The President may also be called upon to negotiate between the parties to a dispute before the Council.

The voting arrangements of the Security Council and the so-called veto exercisable by the permanent members has earned notoriety by its frequent use by the Soviet Union. A decision of the Security Council on a procedural matter requires the affirmative vote of any 7 members. A decision on a non-procedural, that is, a substantive matter requires 7 affirmative votes which must include the affirmative votes of each of the 5 permanent members. The only exception to the rule requiring unanimity of the permanent members is that when a permanent member is itself a party to a dispute before the Security Council it shall not vote. In most non-procedural questions each permanent member has the right by casting a negative vote, to veto it which is the subject of great controversy principally because the Charter does not limit the use of veto power, and the wide extent of its use has periodically prevented the Security Council from taking decisions. Although any negative vote of a permanent member is technically an exercise of veto power, the term veto is usually reserved for a negative vote which kills a proposal which would otherwise have been adopted. Its crippling effect has been somewhat mitigated by the acceptance of the

practice that abstentions and absenses are not counted as veto. There have been few decisions in which all the permanent members have concurred ; a greater number of decisions have been possible because of the abstention or absence of a permanent member. A glaring example of the latter case was the absence of the Soviet Representative from the Security Council deliberations on June 25, 1950 which made possible U.N. action in Korea.

To turn now to the question as to how far the Security Council has been successful in discharging its duties according to the Charter, it is necessary to review its achievements in its main fields of activity and to enquire into the reasons for its failure to function effectively. In 1945 the American Secretary of State Mr. Stettinins reported to President Truman that "the provisions of the Security Council recognise the special responsibilities of the great powers for maintaining the peace and the fact that the maintenance of their unity is the crucial political problem of our time." In reviewing the work of the Security Council it is vital to remember that the Security Council as an instrument for the preservation of peace and settlement of disputes on the lines laid down by the Charter must depend in the last resort on the ability and will of the major powers to work together. Its effectiveness is bound to be diminished if it is used as an additional weapon in the power politics of the Great Powers.

Let us take the 4 fields of activity of the Security Council ; Firstly—collective measures to keep or restore international peace and security in case of a threat to or actual violation of the peace ; secondly, peaceful settlement or adjustment of disputes or situations likely to lead to a breach of the peace ; thirdly, the regulation of armaments and fourthly, the performance of certain organizational functions including the recommendation of new members.

In the first case of acts for the prevention or repression of aggression, the Security Council has been successful in situations where the permanent members had sufficient interest in the maintenance or restoration of international peace and security to agree on a common course of action. In Indonesia where Dutch police action was taken to re-establish the authority of the Netherlands in Indonesia the Security Council was able eventually to get the parties to agree to a cessation of hostilities and ultimately to the acceptance of a political settlement. In the Palestine question the Security Council was successful in the initial period of the crisis and exercise pressure on the parties to the hostilities after the Declaration of Independence of Israel in 1948 to cease fighting and to agree to permanent armistice arrangements. Until the Israeli attack of 1956 the system of international supervision under the Security Council was effective in preventing hostilities though it failed to achieve a settlement. Similarly in the Kashmir dispute, a ceasefire under a system of international observation was established with the consent of the parties and so the S. C. prevented further hostilities even if it could not settle the dispute.

In cases where the vital interests of permanent members have been in direct conflict the council has only been effective

under exceptional conditions. In the case of the communist coup d'état in Czechoslovakia in 1948, a complaint against Soviet intervention was brought before the Council and action prevented by Soviet vetoes. Similarly the case of the Soviet Blockade of Berlin in September 1948 was brought before the Council as a threat to the peace and the Soviet veto prevented any action being taken. This was an issue which concerned problems of the peace settlements rather than of the maintenance of peace once it had been established. The Korean war in 1950 when N. Korean forces attacked the Republic of Korea was the exceptional case when the S. C. at first took action in a breach of the peace involving the conflicting vital interests of the permanent members.

A unique opportunity was offered as a result of the absence of the Soviet representative in the Security Council who was boycotting the Council because of its refusal to seat the Chinese Communist representative and the availability of American occupation forces in Japan and nearby bases. When the S. C. was paralysed from taking action in the Korean war, the General assembly claimed residual responsibility based on a liberal interpretation of the Charter in the famous "Uniting for Peace Resolution." It claimed that when the S. C. fails through lack of unanimity to discharge its primary responsibility in dealing with a threat to the peace, a breach of the peace, or act of aggression the G. A. has the right to consider such situations and to recommend enforcement action.

Again the Council was incapable of acting in the Hungarian and Middle Eastern crises of 1956 because they were situations involving the vital interests of the major powers. Action by the G. A. in the Hungarian crisis was of no effect, but was effective in the Middle Eastern crisis, though the chances of successful action are small unless the U. S. A. and Soviet Union are on the same side.

As to the 2nd function of the S. C. in relation to peaceful settlement and adjustment of disputes, the S. C.'s actions have been in general of very limited effectiveness due to a failure of the permanent members to agree as a result of their conflicting interests in the cold war. There has not been much success in dealing with the class of disputes and situations resulting from the cold war between the Communists and the West as for example, the dispute leading to the Berlin Blockade. The U. N. in their consideration of cold war problems have considered the G. A. better suited to their purposes. In disputes and situations resulting from conflicts of interests between colonial powers and recently independent States of Asia and Africa the S. C. has not been able, except in the Indonesian case to bring about a settlement. Here again, the dichotomy between the permanent members has been caused by the Soviet Union generally aligning itself with Asian and African differences with the West, while other permanent members have taken a rigid stand in opposition. There has been a certain amount of disagreement among western powers themselves; the U. S. A. has been unwilling to go as far as the U. K. and France in opposing Asian and African claims. The authority of the S. C. has further been weakened by the preference of Asian and African members to bring questions involving claims against the West before the G. A.

where their voting strength is proportionately greater.

In the field of regulation of armaments, the S. C. has been a complete failure. No agreement has been reached among the members undertaking to place military forces and facilities at the disposal of the Council. The permanent members in the Military Staff Committee placed under the S. C. for the direction of forces at its disposal have failed to agree on the principles to be applied in drawing up these agreements at the present time the Council lacks the military forces essential for the maintenance of peace and can only recommend military measures. Proposals for the regulation of national armaments, atomic or conventional have led to complete deadlock due to the inability of the powers to agree and the G. A. taking the initiative in disarmanent discussions has been no more successful.

Cold war politics has had some bearing on the internal organisation of the U. N. and particularly on its membership. The exercise of vetoes principally by the Soviet Union in the S. C. created a deadlock over the admission of new members, so that between 1950 and 1955 not a single new member was admitted.

There is no doubt that the S. C. has failed to discharge its responsibilities in the manner and degree of effectiveness hoped for by the authors of the Charter. The frequency of its meetings had steadily declined and the increasing number of political questions considered by the G. A. in comparison with the number considered by the Council underlines the diminished role of the S. C. The excessive use of the veto has been suggested as one of the main reasons for the decline of the S. C. Upto 1958 it was exercised 89 time. But there is evidence to show that the importance of the veto has been exaggerated. In the first place, the majority of vetoes have been exercised over the admission of new members. Upto 1958, it was exercised 48 times on this score, and 39 times on proposals of international peace and security and twice over the appointment of the Secretary General. The exercise of the veto by the Soviet Union is understandable in its minority position, though the frequency of its exercise has justified the charge of obstruction levelled against it. The veto has not necessarily always prevented its substance from being put into effect; for example e.g. in the Syrian and Lebanese case in 1946, the U. S. draft resolution expressing the confidence of the S. C. that U. K. and French troops would be withdrawn as soon as practicable was vetoed by the Soviet Union who wanted a stronger resolution demanding immediate withdrawal. This did not prevent the U. K. and France from giving effect to the majority opinion. The veto as a stumbling block to U. N. action, has on occasions been circumvented by questions being referred to the Assembly and if necessary taking action. As to abolishing the veto, none of the permanent members are prepared to accept its abolition and replacement by a majority decision. In many cases even if it were abolished, where the vital interests of a major power is at stake it would not accept the decision except under compulsion.

In such a case unless the major members were prepared to take measures of coercion

against the recalcitrant power which they are usually unwilling to take as in the Czech and Hungarian cases, the situation would not be any different.

The real cause of the decline of the S. C. lies deeper than any procedural defect. The veto is a symptom rather than the cause of the weakness of the S. C. and it is a symptom reflecting the ideological differences and conflicts of interests among the major powers doting from the breakdown since 1945 of the wartime alliance of the Soviet Union, U. S. and U. K. The veto evidences the failure of the concept upon which the U. N. security system was founded, namely the unanimity of the great powers.

The increasing inability of the S. C. to serve the purposes for which it was intended and the growing preference of the members to make use of the G. A. has given the G.A. an active role in the maintenance of international peace and security. The G. A. as a security organ has power to discuss, inquire into, mediate and conciliate disputes between states. It could make recommendations when the S. C. is not considering the matter, but the S. C. was designed originally to have primary authority to make decisions and had sole authority over enforcement actions to carry them out. The U. N. security system has undergone a substantial alteration through deadlock in the S. C. The use of its residual authority by the G. A. mentioned before has made the G. A. the dominant instrument for application of force through the U. N. when warfare has existed or been threatened as was shown in the Korean war. So long as the major powers remain divided the role that the G. A. has gradually assumed in the maintenance of international peace and security is not likely to be altered.

The effectiveness of the S. C. has been further diluted as a consequence of the other sections of the Charter. Action by the S. C. in disputes, situations, or threats to the peace have been hampered by the domestic jurisdiction clause in the Charter whereby the U. N. is prevented from intervening in matters which are considered to be of a domestic nature. The question of the treatment of Indians in S. Africa was not submitted to the S. C. as a dispute but the competence of the G.A. to deal with it on other grounds was excluded on this point. The S. C. was prevented from investigating the Communist coup d'état in Czechoslovakia in 1948 on the Soviet Union's claim that it was a domestic question.

The right of self-defence in the Charter allows states to take individual action until the S. C. steps in providing it reports its action to the S. C. This has weakened the collective security system particularly since the Charter has included the concept of collective self-defence enabling a group of regional organisations such as NATO or SEATO to combine against an aggressor even though the S.C. takes no decision.

Are there any remedies to strengthen the S. C. to function more effectively? A revision of powers and voting procedures have been suggested. Abolition of the veto, or a qualified unanimity have been rejected as unacceptable. A reform advocated by

the U.S.A. is to restrict the use of the veto and to eliminate it from decisions on pacific settlement of disputes and admission of new members. This could not be possible without a substantial relaxation of tension between the Soviet Union and Western powers. It has also been suggested that the fundamental nature of the S. C. be altered by taking away its enforcement powers and to strengthen G. A. in this respect. Change in the composition of the S.C. has been suggested but reconsideration of the original allocation of seats for permanent members has been strongly resisted in the case of Nationalist China. Increase in the number of non-permanent States has been urged on the grounds that various regions, especially Asia and Africa are unrepresented in the S. C. By enlarging its size the S. C. would lose the advantage of being a small committee that is suitable for acting speedily, is an effective negotiating body and has acquired skill and specialised knowledge in dealing with disputes and like situations. The G. A. in comparison is more suitable as a forum for the discussion of questions of a general character. Any improvement in the Council's functioning under existing circumstances would probably lie in the development and use of informal techniques of diplomacy to which it is suited rather than through the revision of voting procedure or composition. Until relations among the major powers improve, the possibility of developing the role of the Council along the lines of the Charter are remote. The S.C. must, in the meantime, be satisfied with playing a role subordinate to that which was intended for it.

Regional Arrangements

Basanti Mitra

When President Wilson at the Paris Peace Conference in 1919, declared that a 'living thing is born', he was referring to the League of Nations, predecessor to the United Nations Organization. To Wilson, it was indeed a living thing, for he had hoped that the new organization, whose members had pledged to apply certain principles in their relations with each other, would change the manner in which international relations were conducted in the nineteenth century. For one thing, although the great powers were to hold a special position,—for without their co-operation no international organization may succeed,—the new association was to be one of both great and small powers. The factor of power which alone, had so far dominated diplomacy was to conform to the rules of international law and the pledges drawn up in the Covenant of the League. There was hope that the opportunity the League offered for discussion ; the guarantees it was able to give against war and aggression would tend to mitigate the influence of power towards that of principles, if only in order to maintain peace. In Wilson's mind there was a strong reaction against the secret alliances and manouverings of European diplomacy, and many others like him felt that each alliance tended to create a counter alliance, generated tensions, and were chiefly instrumental in bringing about the First World War. It seemed more probable that with a League the great powers would be able to act in concert and agreement.

In the period of the League, the twenties represent a relative co-operation and faith in the Covenant, and regionalism of the kind which ended in Locarno (1925) meant in the main, an adjustment of relations between France and Germany, and paved the way for the entry of Germany into the League. It could no more be said that it was a League of victor powers seeking to impose their will on vanquished nations. The seeds of conflict were, however, laid in the controversy regarding those who wished to strengthen the League Council in case of hostilities, and those who felt that the main purpose of the League was its efforts towards the prevention of war and not exertion of undue authority over states. The real test of the League came in the thirties, and it was never to recover from the blow dealt by the Japanese army in Manchuria in 1931. The policy of the League powers, particularly Britain and France from then on remained that of preventing co-operation between Germany, Italy and Japan. In their efforts to split the Axis, they reverted to the old diplomacy of bargaining with each power, to the detriment of the principles of the League. It was in the thirties, when the Soviet Union lived in constant fear of war in Europe at the

same time as she was threatened with hostilities in the Far East, that Maxim Litvinov, having failed to convince the great powers in the League of the necessity of strengthening the collective security system, advocated regional mutual assistance pacts. Speaking in 1936, Litvinov stated, "In an ideal League, military sanctions, too should be obligatory for all. But if we are as yet unable to rise to such heights of international solidarity, we should make it our concern to have all continents and for a start, at least all Europe covered with a system of regional pacts, on the strength of which groups of states would undertake to protect particular sectors against aggression." [1] Litvinov also suggested waiving the unanimity rule necessary for the application of sanctions.

These views are of certain interest to-day, for the pattern of the post-war world has made it imperative for the United States to seek a measure of security in regionalism, and the Soviet Union on the other side of the fence is necessarily interested in creating a split in the ranks of its adversary. With its large land mass in Europe and Asia, the Soviet Union is able to dispense with bases, which remain the prime necessity of United States security. Yet both States dominate regional arrangements within their defense perimeter, and still profess to act in accordance with the principles of the United Nations Charter.

Regionalism was recognized in the United Nations Charter as a necessary feature of its security organization, for it was believed that common cultures, language and local interest may often help in the regional solution of disputes, where outside states would only be looked upon as interlopers. The security system of the United Nations Organization was clearly formulated to prevent the rise of the defeated aggressors rather than against the threat of aggression by any of the Great Five. The post war situation made it clear that action against any of the great powers in the Security Council would only mean a global war, and was therefore left out of account. There were three measures by means of which the Security Council with the great power veto was to maintain international peace and security. These were the peaceful adjustment of disputes ; secondly, of ensuring collective measures against any breaches of the peace ; and thirdly, an effective regulation of armaments. Under the Charter, regional organizations were to conform to the authority of the Security Council, and apart from helping in the peaceful adjustment of disputes[2], were empowered to take enforcement action against breaches of the peace, only with the approval of the Council[3]. Finally, any contemplation of military measures by a regional agency was to be duly communicated to the Security Council[4]. Some regional agencies which do not contemplate a defence organization, although their stated objectives are resistance to aggression, come within this definition, such as the Arab League and the Organization of American States. The British Commonwealth is also a

1. Harriet Moore, *Soviet Far Eastern Policy*, (Princeton University Press, 1945), p. 71.
2. Art- 52, para 2.
3. Art. 53.
4. Art. 54.

form of regionalism not in conflict with the conceptions of the Charter.

A special feature of the United Nations from its inception has been the inability of the Security Council to function effectively, and a large part of the interest in the working of the United Nations has been the manner in which other organs have taken on themselves the work of the Council. Something of this must have been anticipated by the framers of the Charter, for wartime coalitions nearly always show a tendency to disintegrate, and in order that states may be able to protect themselves for purposes of defense, there was outside the framework of regionalism, enshrined in Article 51,[5] the right of inherent individual and collective self-defense against an armed attack until the Security Council took necessary measures.

It is around Article 51, and in the exercise of individual and collective self-defense that a chain of alliances have been formed, as an alternative system of security, when political tensions between the great powers made it clear that the United Nations through the Security Council would never be able to deal with force. These alliances are the Nato, Seato, Baghdad Pact and the Warsaw Pact and have been the subjects of some controversy. For although based on Article 51 of the Charter, and allude in many of their articles to the principles of the United Nations, nowhere is the organization given the power to determine whether these alliances come within the meaning of Article 51, and are actually in accord with the purposes and principles of the United Nations.

In Western Europe, military arrangements appeared in quick succession after 1948, the year of the Berlin bolckade and establishment of a Communist Government in Czechoslovakia, in place of a democratic one. In 1948 the Brussels Treaty brought together Britain, France and the Benelux countries in a military alliance, differing from other alliances in the past in that it provided for a continuously functioning defence organization. A year later, in 1949, the Nato brought the United States into a defence organization with Western Europe, and subsequently a Nato army took shape. It was obvious that Nato military secrets were not to be communicated to the Security Council and, therefore, such organizations could never come within the regionalism of the Charter. The United States, in order to add to the military potential of Western Europe was in favour of including West German divisions in Nato, and this was accomplished in 1955, when the Brussels Treaty gave place to the Western European Union, including West Germany and Italy. But apart from military arrangements, a number of regional organizations pointed towards the integration of Western Europe such as the OEEC; the European Coal and Steel Community (The Schuman Plan), the Council of Europe and the European

5. "Nothing is the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain internatioal peace and security."

Common Market. A large part of these arrangements dealt with an adjustment of the relations between France and Germany in addition to the wider context of integration in face of the East-West power conflict. The move for a European Federation was also partly influenced by the need for a new idealism, for where Europe had once held hegemony, she was now under the threat of dominance.

As a countermeasure to the rearmament of Germany, the Soviet Union in 1955 signed the Warsaw Pact under Article 51 of the Charter, with seven other Eastern European states. The Soviet Union has a large number of divisions in Europe, but the United States can only maintain her divisions under the Nato command, therefore, the Soviet Union is quite willing to give up the Warsaw Pact if the United States and other European powers were to dissolve the Nato.[6] The whole question of regional alliances will have to be examined anew, for there have been plans to neutralize Germany, with a loose confederation of the East and West.

India did not concern herself with regional alliances till they reached her borders. She had looked upon Seato (1954) with disfavour as it seemed a hostile encirclement of the People's Republic of China, although the Seato area does not include Formosa. When Mr. Nehru has shown his impatience with regional alliances as the root cause of International tensions he nearly always refers to the Baghdad Pact, now a phantom alliance, evaporating into bilateral pacts. The strain in India's relations with the United States is in great measure a result of military aid to Pakistan.

Regional alliances in Europe are the expression of a common interest and common concern, and derive their support from democratic governments. In Asia where democracy is still in its salad days, military alliances tend to support autocratic regimes and the events in July, 1958, in Iraq point to the slender base of Western foreign policy in the area. The elections in Japan, in May 1958, revealed internal divisions in the wake of her alliance with the United States. The problem of whether to aid in democracy or subdue all else in military necessity remains a continuing challenge to the pattern of foreign relations of the Western powers.

The danger in all these mutual assistance pacts lies, in the fact that states are committed in advance to a course of action, and tend to vote in blocs in the United Nations. An exception was to be found in the Suez crisis of 1956, when reaction in the United States to the use of force by its Nato allies was spontaneaous, and the action was initially declared a breach of the peace. The situation was later solved through the United Nations.

6. In Asia the Sino-Soviet alliance will no doubt remain. Mr. Mao Tse Tung's views on the matter are of some interest. "Unity in the common struggle with the countries of the world which regard us an equal nation, and with the peoples of all countries ! This means alliance with the USSR and with the People's Democracies in Europe and alliance with the proletariat and the masses of the people of the other countries to form and international united front...the Chinese people must either side with imperialism or with

Article 51 formed the basis of action in Hungary in 1956, when Soviet troops marched in to restore order, and it was also used to justify the landing of United States Marines in the Lebanon last year. The use of the rights of individual and collective self-defense are no longer confined to an 'armed attack' as written into the Charter but is extended to cover 'indirect aggression' included to mean attempts by other states to foment civil war in a country, for which the Charter had made no provision. What makes one continuously apprehensive is the flexible interpretation applied to Article 51, where each state seeks to safeguard its independence of action as against action by the United Nations. The gaps in the Charter are evident, for the right to determine whether direct or indirect aggression has occurred is left to the states taking action; and finally, once action is taken by states there is no provision for co-ordinated action with the United Nations.

A feature of regional alliances in the post war period has been the political and economic consultations with machinery set up for the purpose, apart from their military base. The trend towards stability may perhaps be found in regional economic co-operation outside these alliances, such as the Colombo Plan to aid economic development. It is unfortunate that internal divisions within the states of West Asia have prevented fruitful economic co-operation and strengthening of the Arab League.

An attempt to move away from the orbit of the two great powers was made in the Bandung Conference in 1955, and it may well be a landmark in Afro-Asian relations. Whatever the systems of government and political inclinations, Afro-Asian nations were able to get together with the People's Republic of China to discuss common problems. The Bandung principles emphasized economic development, not regional economic blocs, and reiterated once more the principles of the Charter and the need for restraint in the use of force and peaceful adjustment of all international disputes. The importance of Bandung lay in the fact that by 1955, the authority of the Security Council had dwindled, and the outstanding fact in the working of the United Nations was the development of the General Assembly. By 1955, Afro-Asian nations in the General Assembly were in sufficient numbers to influence its decisions.

Socialism. There can be no question of remaining between them, there is no third path...," *For a Lasting Peace*, 15 July 1949, Quoted from Max Beloff, Soviet Policy in the Far East 1944-51, Oxford University Press. 1953, pp. 66—67.

The virtues of neutralism remain with those nations who are against the Western bloc. "It is no coincidence that the policy of forming aggressive military blocs and increasing the armaments race is being condemned by an increasing number of States. There is an increasing desire for peaceful co-operation and peaceful co-existence. "To this aim are also devoted the efforts of many States to pursue a policy of non-participation in aggressive pacts, a policy of neutrality."..........

Marshall Nieh Jung-chen, the Chinese observer to the Prague meeting, said after the declaration was signed: I am authorized by my Government and people to express their full support for these decisions."

Declaration of the Warsaw Treaty nations, prague, January 28, 1956, *Statesman*, january 29, 1956.

One is tempted to claim that the mantle of President Wilson now falls on Mr. Nehru, in attempting without rancour to bridge the gulf between East and West. His Panch Shil has cast a shadow of doubt over many minds, for the principles were born of Sino-Indian agreements on Tibet, and to Mr. Nehru they were a re-affirmation of the principles of the United Nations rather than bartering away the rights of small nations. His emphasis then and now is on peaceful settlement and peaceful co-existence, once again threatened by the use of force in Tibet. In his attempts with neutral nations whether in Europe such as Sweden and Yugoslavia, or in Asia with the Bandung powers, he has led India in her constant endeavour to chalk out a role for neutral nations, to bring about a peaceful adjustment of disputes, to play the role of mediator in Korea, Indo-China, West Asia and Lebanon,—in all this one may discern an unflagging attempt to strengthen the United Nations. So long as the widening gulf between international relations and international law remains, the part played by neutral nations to strengthen the working of international organization will be continually undermined by regional alliances. All this points to the restraining hand of disarmament and international control of Atomic energy if regional alliances are not to lead us to the path of mass destruction.

APPENDIX

A Note on Indirect Aggression

The term 'indirect aggression' finds no expression in the United Nations Charter, but was defined in two resolutions of the General Assembly. At the time the Charter was being formulated, the idea of subversive intervention by one state in the internal affairs of another did not constitute a major problem, and in order to strengthen the foundations of peace, two resolutions were subsequently passed, entitled 'Essentials of Peace' (December, 1949) and 'Peace Through Deeds' (November, 1950). Both these resolutions sought to condemn any aggression, aimed at impairing the independence and integrity of a state or fomenting civil strife within its borders. The United Nations has not succeeded in defining aggression, but there are three instances where it is recognized that armed force may be used by states, namely, (1) in collective measures in accordance with Chapter VII of the Charter, (2) in the exercise of the inherent right of individual and collective self-defense, if an armed attack occurs, (Art. 51), and (3) at the request of a third state[1]. The use of the term 'indirect aggression' for subversive intervention does not carry with it a connotation to lend force in order to restrain such action.

---

1. See Quincy Wright, United States Intervention in the Lebanon, *American Journal of International Law*, January, 1959, where he emphasizes that certain conditions must be fulfilled in order that such aid may not amount to aggression.

3

As a matter of fact, the two resolutions mentioned above seemed to follow two different approaches to the problem of peace. They were passed one before the Korean war, and the other after resumption of hostilities, and reflect the mood of the times. Since the Charter does not lay down any lines of action, there may be according to the spirit of the Charter two ways to deal with such intervention, either through peaceful negotiations and adjustment, or by means of the use of force as a result of collective security measures through regional agencies[2]. The resolution on 'Essentials of Peace' lays emphasis on the first of these methods and the 'Peace Through Deeds' resolution on the second line of reasoning. It would seem that freedom of action by states to decide when 'indirect aggression'[3] has occurred may lead to a strengthening of regional arrangements in relation to the organs of the United Nations.

Essentials of Peace 290 (iv) 1949

The General Assembly

1. *Declares* that the Charter of the United Nations, the most solemn pact of peace in history, lays down basic principles necessary for an enduring peace ; that disregard of these principles is primarily responsible for the continuance of international tension ; and that it is urgently necessary for all Members to act in accordance with these principles in the spirit of co-operation on which the United Nations was founded ;

Calls upon every nations

2. *To refrain* from threatening or using force contrary to the Charter ;

3. *To refrain* from any threat or acts, direct or indirect, aimed at impairing the freedom, independence or integrity of any State, or at fomenting civil strife and subverting the will of the people in any State ;

4. *To carry out* in good faith its international agreements ;

5. *To afford* all United Nations bodies full co-operation and free access in the performance of the tasks assigned to them under the Charter ;

6. *To promote*, in recognition of the paramount importance of preserving the dignity and worth of the human person, full freedom for the peaceful expansion of political opposition, full opportunities for the exercise of religious freedom and full respect for all the other fundamental rights expressed in the Universal Declaration of Human Rights ;

7. *To promote* nationally and through international co-operation, efforts to achieve and sustain higher standards of living for all peoples ;

8. *To remove* the barriers which deny to people the free exchange of information and ideas essential to international understanding and peace ;

Calls upon every Member

9. *To participate* fully in the work of the United Nations ;

Calls upon the five permanent Members of the Security Council

10. *To broaden* progressively their co-operation and to exercise restraint in the use of the veto in order to the make the Security Council a more effective instrument for maintaining peace ;

Calls upon every nation

11. *To settle* international disputes by peaceful means and to co-operate in supporting United Nations efforts to resolve outstanding problems ;

12. *To co-operate* to attain the effective international regulation of conventional armaments ; and

13. *To agree* to the exercise or national sovereignty jointly with other nations to the extent necessary to attain international control of atomic energy which would make effective the prohibition of atomic weapons and assure the use of atomic energy for peaceful purposes only.

261st plenary meeting, 1st December, 1949
Official Records of the 4th session of the General Assembly Resolutions, 20th September 10th December, 1949.

Peace through Deeds 380 (V) 1950

The General Assembly

Recognizing the profound desire of all mankind to live in enduring peace and security, and in freedom from fear and want,

Confident that, if all governments faithfully reflect this desire and observe their obligations under the Charter, lasting peace and security can be established,

Condemning the intervention of a State in the internal affairs of another State for the purpose of changing its legally established government by the threat or use of force,

1. *Solemnly* reaffirms that, whatever weapons used, any aggression, whether

---

2. Baghdad Pact Council's Communique, January, 1959 (Text, *Statesman*, January 29, 1959) A document forming the basis of bilateral pacts including the United States-Pakistan Pact. "Nevertheless, the Council was of the opinion that the threat of direct and indirect aggression had not diminished and should be combated by all possible legitimate means, including action by the U.N. Council. It noted with concern that international Communism continued its efforts, to dominate the Pact area. These efforts, the Council concluded, meant that the necessity to strengthen collective security was as great as ever."
3. "Nor is it any the less of an aggression if the form it takes is indirect and camouflaged. To be sure, no foreign State has attacked Hungary directly, but for a long time millions of dollars have been pouring into the organization of subversive activity and the formation of armed bands within Hungary, as well as beyond its borders, with the aim of overthrowing the people's democratic Governments." Interview on Legal Aspects of Soviet Intervention in Hungary. G. P. Zadorozhny, *The Hungarian Situation and the Rule of Law*, International Commission of Jurists, The Hague, 1957. p 23.

While the Soviet Union reserves to itself the right to use armed force when necessary, she advocates a different approach as between states of the Warsaw Treaty and the NATO Pact. "It would be of great importance if the States of the Warsaw Treaty, on the one hand, and the States of the NATO Pact, on the other, would give an undertaking to solve differences and conflicts arising between them only by peaceful means. ...... The method of solving differences and conflicts between States not by the use of force or threat of force but by negotiations with regard to the interest of both sides has proved itself." (Declaration of the Warsaw Treaty nations, Prague, January 28, 1956, *Statesman*, January 29, 1956)

committed openly, or by fomenting civil strife in the interest of a foreign power, or otherwise, is the gravest of all crimes against the peace and security throughout the world ;

2. *Determines* that for the realization of lasting peace and security it is indispensable :

(1) That prompt action be taken to meet aggression wherever it arises;

(2) That every nation agree ;

(a) To accept effective international control of atomic energy, under the United Nations, on the basis already approved by the General Assembly in order to make effective the prohibition of atomic weapons ;

(b) To strive for the control and elimination, under the United Nations system of control and inspection, with a view to their gradual reduction ;

(c) To reduce to a minimum the diversion to armaments of its human and economic resources and to strive towards the development of such resources for the general welfare, with due regard to the needs of the under-developed areas of the world;

3. *Declares* that these goals can be attained if all the Members of the United Nations demonstrate by their deeds their will to achieve peace.

308th plenary meeting, 17th November, 1950
General Assembly Resolutions
19th September—15th December, 1950

The Role of the General Assembly

Basanti Mitra

When the Charter of the United Nations was written some years ago, it was expected that the Security Council would play a major role in the maintenance of international peace. The United Nations Organization has now functioned for over a decade, and the centre of gravity has shifted from the Security Council to the General Assembly. This development has remained one of the outstanding features of the United Nations system, and round this problem there have been plans for a review and revision of the United Nations Charter.

To my mind there are two rather fundamental problems in the study of international organization, in terms of which one may assess the developing role of the General Assembly. The first, is the relationship between great and smallpowers and the authority, responsibility and capacity which they should bear towards the maintenance of international peace and security.

Relationship Between Great and Small Powers

It has often been said, and in derision, that since the United Nations cannot function when the great powers disagree amongst themselves, the organization has very little utility. Now, there is always a great deal of truth in the commonsensical approach of the man in the street, for international organization is based on the maximum of co-operation of the great powers and is not intended to solve all underlying political differences. The chief characteristic of the post war period has been a mounting tension and rivalry between the United States and the Soviet Union, and looking back one wonders how the United Nations has functioned at all. There have been many instances when the great powers unable to agree amongst themselves have been content to see the General Assembly take the lead. A few such important cases have been the disposition of former Italian colonies ; the more explosive situation in West Asia in 1956 ; and the talk of war in the air was considerably cleared, at the time of the Lebanon crisis last year, as a result of the special session of the General Assembly, after deliberations for a summit meeting seemed of no purpose.

The second important point to remember is that international organization is an effort to conduct relations between states on the basis of the principles of international law.

A Legal and Political Order

There are therefore two streams, one, by means of which each state seeks to forward its own policies through the organization, and the other, where recognition of the necessity of a collective system impels the establishment of certain norms by means of which political and power relationships may be conducted. The continuous convergence of these two streams, the political and legal, remains a distinguishing characteristic of the conduct of international relations in the twentieth century. In the hundred years

previous to the first world war, many important developments had already taken place in international organization but the balance of power alone dominated inter-state relations, and international lawyers had not as yet questioned the sovereign right of nations to engage in war. It was only with the League of Nations that a community concern towards the problem of war led to certain pledges in the League Covenant to ensure its prevention. However, the endeavour to achieve a legal system was swamped by political considerations, and to this day the conflict between the legal and political systems in an international order continues, and may only be solved by an enlightened public opinion, for without a concensus and the idea of shared responsibility no legal system, whether internal or international may work. In a meeting of the International Law Association, 1956, these views were expressed :—

"As regards public opinion at large, even the idea of the existence of the United Nations has not yet taken firm roots. It is, therefore, impossible to count upon the existence of a strong community will to revise the Charter. It is, moreover, totally impossible to realise any decisive advance on the road to greater security on our globe by constitutional stealth, more or less unsupported by public opinion."[1].

In regard to these matters the General Assembly has two important functions to perform ; one, in which it serves as a forum for mobilising public opinion, and in the second instance the Charter places responsibility on the General Assembly for the development of International Law[2]· for which it has set up an International Law Commission. A large part of the plans for the revision of the Charter also centre round a strengthening of the legal system.

The General Assembly and the Security Council in the UN Security System

The essential problems therefore remain that of prevention of war and the preservation of peace. The General Assembly is also concerned with trusteedhip and dependent territories, and international co-operation in the social and economic spheres, but these matters may also be looked upon to remove the underlying causes of war ; and we will not endeavour to engage in detailed discussion on themes which may detract from the central problem, namely, an evaluation of the relative importance of the General Assembly and the Security Council in the United Nations system.

In any international organization, there are three measures by means of which efforts are made towards the preservation of peace. These are the methods of peaceful settlement of international disputes, where a process of delay, investigation and recommendations of an impartial commission are designed to ward off hostilities, and should the parties concur they may also use legal methods such as arbitration and judicial settlement ; in the

1. The International Law Association, Report of the Forty-Seventh Conference, Dubrovnik, 1956, p. 86,
2. Article 13, Charter of the United Nations.

event of the use of force, there is provision or collective security measures, including both military and economic sanctions ; finally, an effective regulation of armaments helps to reduce international tension and create conditions conducive to world peace.

The Leage of Nations and The United-Nations— A Comparison

A comparison of the League of Nations comes to mind. In the League, apart from permanent representation in the Council, the great powers did not enjoy a special position in the security system. The Council and the Assembly with some exceptions voted by unanimity, and as regards the peaceful settlement of disputes or application of sanctions there was no distinction between the great and small powers. A great deal of reliance was placed on the voluntary co-operation of states, with both the Assembly and the Council limited to the power of making recommendations. The United Nations Charter emerged with different conceptions. The rule of unanimity in the Council and the Assembly was abandoned, and although majority voting was adopted, it was qualified by the requirement of the veto, that is the votes of the five great powers in the Security Council on important matters.[3] Thus in recommendations to be made for the peaceful adjustments of disputes as well as a decision on collective security measures, the concurrence of the five great powers was necessary. The exception was to be found in recommendations for peaceful settlement where parties to a dispute whether a great power or a small power abstained from voting.[4] In the General Assembly a majority of two-thirds was required for important matters, enumerated in Article 18. Whereas the General Assembly was to be limited to the power of making recommendations, the Security Council was empowered to take legally binding decisions in matters where threats to the peace, breach of the peace and acts of aggression occurred. The Security Council was also to be strengthened to enforce its decisions by an international army to be gradually constituted by means of special agreements between members.[5] Therefore, in regard to peaceful adjustment both the General Assembly and the Security Council could only make recommendations, and in cases of action against breaches of the peace it was only the Security Council which was empowered to take action. This was in accordance with Charter provisions where the primary responsibility for the maintenance of international peace and security was assigned to the Security Council.[6] The practical effect of all this was that from its inception the United Nations recognized its inability to take action against a great power should it commit a breach of the peace. It was argued that conditions under which the League had functioned had changed, and action against a great power would mean a world war where the whole basis of the United Nations was to meet its challenge. The entire security

3. Art. 27, para 3.
4. Art 27, para 3.
5. Art. 43.
6. Art. 24, para 1.

system of the United Nations was therefore directed towards a renewal of aggression by former enemy states rather than any of the great powers in the Council. The League system was different, for it was quite possible to envisage sanctions against both Japan and Italy who were permanent members of the Council. Needless to say, the special agreements never came about to strengthen the Security Council with an international army to enforce its decisions, and it became apparent that the executive organ as a result of political dissensions amongst the great powers, would never be able to function in the manner envisaged by the Charter. In its working the United Nations relied on a reinterpretation of the broad functions of the General Assembly, and has not been unlike the system envisaged by the League.

Composition and Functions of the General Assembly

Of all the organs of the United Nations, the General Assembly gives expression to the principle that the Organization is based on the sovereign equality of all its members.[7] When the Charter was being formulated it was the Soviet Union which was particularly apprehensive of the role of the Assembly and wished to limit its powers. Even as regards the admission of new members the veto applied, whereas in the League the Assembly alone was responsible by two-thirds majority for enlarging its membership. It was felt at the time that the broad functions of the General Assembly may encourage deliberations on matters which were within the internal affairs of states. The smaller states in their turn were not willing to allow the Security Council and the great powers to usurp all authority.

Charter Limitations

The General Assembly was given the right to formulate the broad principles of political co-operation, including regulation of armaments,[8] and in regard to specific situations or disputes its authority was subordinated to that of the Security Council by means of two important limitations laid down in the Charter. For instance, whilst the Security Council was excercising its functions in regard to a particular dispute the Genral Assembly could not make recommendations.[9] In practice, the Security Council has been unable to keep a matter indefinitely on its agenda and thus prevent the General Assembly from taking it up. In such highly controversial matters as the Hungarian situation or the West Asian crisis of 1956, there were some great powers who were unwilling to have the General Assembly take up the matter. In the Security Council they could block all action by the use of the veto, but in such cases the method adopted to remove the matter to the General Assembly is something like this ; the item is removed from the agenda of the Security Council, and this is effected by a procedural vote, that is the votes of any seven powers which may or may not include all the great powers. Thus the first limitation has not in any way restricted the development of the General Assembly.

7. Art. 2, para 1.

8. Art. 11, para 1.

9. Art. 12, para 1.

The second important limitation we have already described in comparing the League system of security with that of the United Nations. Although the General Assembly could deal with particular situations, and recommend on measures for peaceful settlement in the same manner as the Security Council, 'any question on which action was necessary was to be referred to the Security Council'[10] That is if hostilities did occur and the dispute had turned out to be a serious one in which action was necessary it was referred to the Security Council. This might have sroved an important limitation, parlyzing the United Nations, for in important matters the Security Council has been faced with a deadlock, had it not been for important developments arising out of the aggression by North Korea, in June 1950.

Korea-Soviet Attitude Towards the Role of the General Assembly

The Soviet delegate had temporarily absented himself from the Council and in the meantime the Security Council had endorsed and supported the action already taken by the United States in Korea. It was at this time in November 1950, that the Assembly defined its functions in an important manner in the Uniting for Peace Resolution, against the wishes of the Soviet bloc. The main purpose of this resolution was to enable the General Assembly to recommend action in cases of breaches of the peace or acts of aggression, if the Security Council failed to exercise its primary responsibility in the maintenance of international peace and security. The Soviet delegate claimed that action by the Assembly was illegal. Those who argued for the resolution pointed out that the Charter had given the Security Council *primary* not *exclusive* responsibility in matters of peace and security. Moreover, Article 10 of the Charter stated that the Assembly could deal with any matter within the scope of the present Charter, and seemed to offer enough opportunity for a broad interpretation of the powers of the Assembly. In any event, the Uniting for Peace resolution merely extended the rights of recommendation of the General Assembly leaving Member nations to send whatever forces they considered wise and proper in case of aggression. Furthermore, the Assembly was not assuming the important and extensive powers granted to the Security Council in the sphere of collective measures. There were clearly two alternatives before the United Nations as a result of events in Korea. One was to render the Organization ineffective as a result of the Soviet veto ; the other, was to prove its flexibility by a re-interpretation of the Charter. An overwhelming majority of Members (52) chose the latter course, for only India and Argentina abstained and five Soviet bloc votes were cast against the Uniting for Peace resolution. There was some danger in increasing the powers of the General Assembly against the wishes of the Soviet Union, for the purpose of the United Nations Organization and its strength lay in providing a point of compromise rather than accentuating power conflict.[11] With the passage of time the Soviet attitude towards the role of the General Assembly changed, in particular in its reaction

10. Art. 11, para 2.

11. Leland M. Goodrich, "Development of the General Assembly," *International Conciliation*, No 471 (May, 1951).

to the use of force by Britain and France in West Asia in 1956. Along with the Western powers the Soviet Union agreed to the creation of the United Nations Emergency Force by the Assembly. In regard to the Lebanese situation in 1958, and the seriousness it assumed after the landing of United States troops, the Soviet Union encouraged the idea of a special session of the General Assembly when efforts to solve the crisis by the great powers failed. Whilst approving in piecemeal measures of the idea of an enhanced role for the Assembly, the Soviet Union does not incline towards a revision of the United Nations Charter.

Attitude of the United States.

United States policy has favoured the idea of a developing role for the General Assembly to compensate for the failure of the Security Council. The political motive is apparent for action by the Assembly was a method of getting round the veto. A device to make the General Assembly continuously operative was the Interim Committee, popularly known as the Little Assembly, with limited powers, to function whilst the General Assembly was not in session, but the opposition of the Soviet Union has reduced the importance of this body. The General Assembly may however meet in a special emergency session within twenty four hours, at the request of a majority of Members of the Security Council or the United Nations. Inorder to further strengthen the Assembly there have been suggestions for a system of weighted voting, to be determined by the ability of members to contribute to the maintenance of international peace and security. The difficulty would lie in determining the criteria according to which votes may be weighted.[12]

Political Role—Domestic Jurisdiction.

The attitudes of other nations also help to emphasize the political role of the General Assembly. India took her case against South Africa to the General Assembly rather than the Security Council. Last year, near the Assembly session the People's Republic of China resumed her activities on the off shore islands of Quemoy and Matsu, as if to emphasize the need for reconciling the People's Republic with the United Nations. The original proposals for the International Atomic Energy Agency, set up in 1957 for the peaceful use of atomic energy and exchange of scientific information, were made to the General Assembly by President Eisenhower in 1953. In spite of the Soviet and Hungarian arguments in respect of domestic jurisdiction in regard to the situation in Hungary in 1956, the General Assembly appointed a special committee of investigation to report on conditions in Hungary. In practice, the broad limitation of domestic jurisdiction, applying both to the General Assembly and the Security Council is subject to the interpretation placed on it by Members or the organs. There is a move in plans for the revision of the Charter to seek an advisory opinion of the International Court of Justice in cases of conflict.

A Parliament of Nations.

The General Assembly has sometimes been referred to as the Parliament of Nations,

12. H. Field Haviland, *The Political Role of the General Assembly.* (Carnegie Endowment for International Peace, United Nations Studies ; No. 7; 1951)

but although it enjoys much prestige and retains many of its forms, it has none of its authority. The General Assembly was not given the power to legislate. It was in effect asked to assume legislative functions in the dispositions of former Italian colonies when the great powers failed to achieve agreement but decided to accept the decisions of the General Assembly ; after much debate the Assembly arrived at an amicable solution. Eritrea forms an autonomous unit within the Ethiopian Federation ; Libya has been independent since 1952, and Somalia under Italian trusteeship is to be constituted as an independent state in 1960. In the Palestine question the General Assembly was asked to create a new political and legal order, and the Arab nations criticized the partition plan as action which was legislative in nature. Here again the broad functions of the General Assembly empowers it under the Charter to recommend measures for the peaceful adjustment of any situation regardless of origin[13]. It is interesting to note that in plans for the revision of the Charter, suggestions have been made for granting to the General Assembly the power to adopt rules of international law to become binding upon each Member which does not within a specified time, notify the United Nations of the rejection of the rules.

Conclusion.

It is, however, as a general forum in creating public opinion that the General Assembly may pave the way towards a legal order. In the meantime in its broad powers it has enabled the functioning of the United Nations instead of leading to its paralysis ; in its political role it acts as a repository of power when the great powers in the Security Council are unable to wield it ; and it endows the small powers with a large share of the burden of responsibility by reason of their overwhelming votes,[14] to ensure the functioning of the United Nations according to Charter purposes and principles.

13. Art. 14.

14. Geoffrey Goodwin, "The Role of the United Nations in World Affairs", *Internatianal Affairs* January, 1958.

APPENDIX

Excerpts from the "Uniting for Peace" Resolution[1]

Approved by the General Assembly at its 302nd plenary meeting, Nov. 3, 1950.

377 (V). **Uniting for peace**

A

The General Assembly,

Recognizing that the first two stated Purposes of the United Nation are :

"To maintain international peace and security, and to that end : to take effective

1. Leland M. Goodrich and Anne P. Simons, *The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security* (Brookings institution, 1955). Text reproduced from U. N. General Assembly, Fifth Session, *Official Records*, Supplement No. 20, pp. 10-12.

collective measures for the preventation and removal of threats to the peace and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of of the peace", and

"To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace",

Reaffirming that it remains the primary duty of all Members of the United Nations, when involved in an international dispute, to seek settlement of such a dispute by peaceful means through the procedures laid down in Chapter VI of the Charter, and recalling the successful achievments of the United Nations in this regard on a number of previous occasions,

* * * *

Conscious that failure of the Security Council to discharge its responsibilities on behalf of all the Member States, particularly those responsibilities referred to in the two preceding paragraphs, does not relieve Member States of their obligations or the United Nations of its responsibility under the Charter to maintain international peace and security,

Recognizing in particular that such failure does not deprive the General Assembly of its rights or relieve it of its responsibilities under the Charter in regard to the maintenance of international peace and security,

Recognizing that discharge by the General Assembly of its responsibilities in these respects calls for possibilities of observation which would ascertain the facts and expose the aggressors; for the existence of armed forces which could be used collectively; and for the responsibility of timely recommendation by the General Assembly to Members of the United Nations for collective action which, to be effective, should be prompt,

A

1. *Resolves* that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security. If not in session at the time, the General Assembly may meet in emergency special session within twenty-four hours of the request therefor. Such emergency special session shall be called if requsted by the Security Council on the vote of any seven members, or by a majority of the Members of the United Nations;

* * * * *

B

3. *Establishes* a Peace Observation Commission which, for the calender years 1951 and 1952, shall be composed of fourteen Members, namely: China, Colombia, Czechoslovakia, France, India, Iraq, Israel, New Zealand, Pakistan, Sweden, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Uruguay, and which could observe and report on the situation in any area where there exists international tension the continuence of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

* * * * *

C

7. *Invites* each Member of the United Nations to survey its resources in order to determine the nature and scope of the assistance it may be in a position to render in support of any recommendations of the Security Council or of the General Assembly for the restoration of international peace and security;

8. *Recommends* to the States Members of the United Nations that each member maintain within its national armed forces elements so trained, organized and equipped that they could promptly be made available in accordance with its constitutional processes, for service as a United Nations unit or units, upon recommendation of the Security Council or the General Assembly, without prejudice to the use of such elements in exercise of the rights of individual or collective self-defence recognized in Article 51 of the Charter;

9. *Invites* the Members of the United Nations to inform the Collective Measures Committee provided for in paragraph 11 as soon as possible of the measures taken in implementation of the preceding paragraph;

* * * *

D

11. *Establishes* a Collective Measures Committee consisting of fourteen Members, namely: Australia, Belgium, Brazil, Burma, Canada, Egypt, France, Mexico, Philipines, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Venezuela, and Yugoslavia and directs the Commitee, in consultation with the Secretary-General and with such Member States as the Committee finds appropriate, to study and make a report to the Security Council and the General Assembly, not later than 1 September 1951, on methods, including those in section C of the present resolution, which might be used to maintain and strengthen international peace and security in accordance with the Purposes and Principles of the Charter, taking account of collective self-defence and regional arrangements (Articles 51 and 52 of the Charter);

* * * *

The United Nations & Dependent Peoples

Chaya Bhattacharyya

The end of colonialism is one of the most significant occurrences of our times. No one can predict when the last territory will achieve full self-government, but there can be no doubt that the forces in motion towards that end cannot be held back, although traces of the old colonialism remain that may not submit willingly to the invitable current of change. The colonial problem in the United Nations whose role I shall later be examining in relation to this problem has become mixed up with larger issues of world politics. Though regard for the welfare of dependent peoples is a motivating factor in the approach of most members to colonial issues, it is not the only factor, and in some cases not the dominant one. Colonial issues in the U. N. and the stand taken by members have to be viewed against the broader background of Soviet interests and of the resurgence through national states of Islamic, Indian and Far Eastern civilizations that are vying with the west for pre-eminence in world affairs. In addition to the ideological, cultural and religions roots of anti-colonialism are the economic roots which extend to under-developed countries everywhere. The political awakening of dependent peoples thus coincides with powerful forces being let loose which are suspicious of and antagonistic towards the West.

The colonial problem in international affairs has been a major concern of the United Nations from its inception. There was much debate on this topic at the U. N. Conference on International Organization held at San Francisco in 1945. Special attention was given to the problem of colonial rule which in its modern setting was determined firstly by the scope and nature of colonial rule prior to the Second World War and by the impact of the war on colonial peoples and colonial powers, particularly its stimulation of nationalism and of economic and social change and by the national interests of the Members of the U. N. in colonial issues. In drafting the U. N. charter the conference drew from the precedents of the League of Nations, so that the provisions finally adopted in the Charter relating to dependent territories reflected both past experience and the new international concern with the colonial problem.

I shall attempt now to give a background to the colonial problem today and to comment on some of the features which characterise it and the factors which have affected it. I shall comment brifly on the altitudes of the Member States in the U. N. and go on to consider the League of Nations and the U. N. Charter in realation to dependent peoples. After outlining some of the post war developments I shall consider the role of the U. N. since 1945 and the difficulties that have arisen.

About a third of the population and land area of the world was under some form of

colonial rule prior to the Second World War. There were over 80 separate colonial jurisdictions, i. e. colonies, protectorates, mandates and territories located in Asia, the Middle East, Africa, Pacific Ocean region and the Western Hemisphere, Great Britain, the Netherlands, France, Belgium, Portugal, Italy and Spain having a combined population of about 200 millions had control over most of the 700 mills, People in dependent territories. The United States had jurisdiction over about 15 mills and Japan over about 60 mills. The territories differed in size from the subcontinent of India with a population of 350 mills. to a mandated island territory with a population of 3,000. They ranged in culture from highly complex and advanced civilizations to those of the most primitive. They were in different stages of political evolution. Some, especially the large territories in Asia were in the grip of powerful nationalist movements, in others the largest political unit was the tribe or clan. Some territories were rich in resources and benefited the colonial powers, others were poor and depended financially on their colonial authority. One thing they had in common which distinguished them from neighbouring independent nations, was that they were governed by a people of another race and culture whose homeland in almost every case was thousands of miles away.

Colonial policies have generally been the product of the world of their time, and more enlightened policies have followed although belatedly—the development of more liberal ideas in the world at large. The early influence of humanitarian thought led to a policy of protection, as contrasted with the recent emphasis on advancement of dependent peoples. The modern principle that the interests of the indigenous peoples is paramount was formally recognised but its implications rarely accepted when these interests conflicted with those of the colonial powers of European settlers. Certainty of achieving independence or equality of status with citizens in the mother country was highly exceptional. The reins of Govt. in all colonies were held, in the final analysis, by the colonial power even though some enjoyed a degree of self-Government. There was little identity between the people in the colonies and their Govt. The colonies were dominated economically as well as politically by the colonial powers and were heavily in debt to their mother countries. Although local inhabitants benefited directly and indirectly from the economic development this development was not designed mainly in their interests. Social services such as education were grossly inadequate in many colonies and racial discrimination in some form or the other existed to some extent in almost every territory. These factors provided the stimulus for the growth of nationalism. The riots and bloodshed in India and the imprisonment of its renounced leaders in the cause of Indian independence had aroused feelings throughout the world. Asian nationalists had won certain concessions from their rulers and had gained confidence in themselves as Asians by noting the ability of Japan to industrialize and to achieve recognition as a major power. But European authority however much hated and resisted seemed invincible in the colonies as the Second World War began.

As allied forces began their liberation in Europe and the Pacific 2 problems arose that showed the need for broad post-war action in the colonial field. One of these involved the disposition of territories formerly held by the axis powers and the fate of the Italian colonies in Africa and the occupation of territories held by Japan. The other problem was the future of the territories administered under the mandates system of the League of Nations which came to the fore once agreement was reached to proceed with the establishment of a new international organisation to replace the League.

As the war in Europe ended and the outcome of the war with Japan became certain a wave of idealism seemed to sweep the world. There was a sense of opportunity for fulfilling ideals and an urgency to do something about international problems like colonialism which conflicted with them. The promise was made in the Atlantic Charter and later reaffirmed in the declaration by the U. N. to "respect the rights of all peoples to choose the form of Government under which they will live". It seemed possible that some form of international supervision for the administration of colonies of all types and not of mandated territories alone would be included in any plan for postwar organisation. At San Francisco in 1947 the powers were aware that the colonial would not slumber after its experience in the Second World War and wrote into the Charter, Obligations to advance self-Govt. and independence which they might not have agreed to in some of their reactionary moods following the war.

At the San Francisco Conference humanitarian regard for the welfare of dependent peoples seemed to be the dominant motive tempered in the case of the colonial powers by a regard for their arm essential interests. In order, however, to appreciate the political dimensions of the colonial problem within the U. N. since its first appearance. During the San Francisco Conference it is important to understand the variety of other factors that have influenced the attitude of Member States on this issue.

First and perhaps most important of all is the fact that more than ½ of the Member States of the U. N. trace their independence to some form of liberation from colonial rule and for that reason are strongly inclined towards an anticolonial position. Another important factor is that those Member States that are united by cultural and regional ties with one another can be expected to form a solid bloc if the interests of one of them clash with those of a colonial power. This is usually the case with the Arab States, Latin America and Asian States. Furthermore the three groups will normally support one another on colonial issues if they have nothing to lose in so doing. There is also the fact that the racial and cultural aspect of colonialism is offensive to the many Member States with predominantly non-European populations. Anticolonialism forms a partial vent for their antagonism towards the present or traditional position of authority, economic domination or social prestige of Europeans and colonial issues are among the few in which smaller nations can put the major powers on the defensive. A significant factor is the Soviet Union's support of anti-colonialism. Although it would be riduculous to regard the attack on colonialism as being wholly or even primarily Communist inspired, it is intensified by Soviet Union policy and among other purposes serves those of the Soviet Union. As a result of these factors the principal colonial powers have been on the defensive in the U. N. Their attitude in general has been that they have nothing to gain and much to lose from the activities of the U. N. in the field of trusteeship and non-self-governing territories. The Union of S. Africa must be placed in a category by itself for its defiance of the U. N. in refusing to place the former mandated territory of S. W. Africa. under trusteeship, for its extreme racial doctrines and generally for provoking some of the most virulent attacks that have been made on colonialism. The Union has weakened the position of the colonial powers generally because they have felt it necessary to support the Union. The official attitude of the United States towards colonial issues has changed since the end of the war. It has subsequently been torn between loyalty to the principle of freedom for dependent peoples and loyalty because of security considerations to its NATO partners who comprise most of the colonial powers. The U. S. was trying to build up a defensive alliance in the immediate post-war years which involved strengthening the colonial powers, economically and militarily and maintaining the mutual confidence among the people concerned. These considerations have precluded the United States from maintaining a strong anti-colonial position despite having achieved nationhood as a result of revolt against colonial rule.

The idea that colonial peoples could be given their freedom by decision of an organised society of nations began with the League of Nations. It was the objective of the mandates system that certain peoples able to stand on their own feet should be given independence. As a result, Iraq, Lebanon and Syria emerged from the mandates system into national independence in time to be admitted to the San Francisco Conference. At the end of the First World War the overseas possessions of Germany and Turkey were ceded to the Allies under the mandates system which has been continued under the Trusteeship System created by the U. N. Under the mandates systemeach mandatory power entered into an agreement with the League and had to submit annual reports to the Council of the League which were examined by a Permanent Mandates Commission, a body of non-official experts. This Commission advised the Council not only whether the mandatory power remained within the limits of its powers but also whether it made good use of them. In addition to the annual report the commission was empowered to examine written, though not oral petitions which it received from the mandated territories through the mandatory powers. The principal weakness of the mandates system was that it depended on facts supplied by the mandatory powers and on the sensitivity of those powers to world opinion. At San Francisco schemes were devised to provide for a limited international supervision for all dependent territories. They were developed into what are now Chapter XI of the Charter entitled Declaration Regarding the Non-Self Governing Territories and Chapter XII—XIII

entitled International Trusteeship System and Trusteeship Council respectively. The Trusteeship Council is one of the 6 principal organs of the U. N. the other 5 being the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice and Secretariat. It had been agreed by the major powers and is incorporated in the Charter that the trusteeship system for dependent areas will apply only to existing mandates of the League of Nations, territories detached from enemy states as a result of the Second World War and any other territory that might be voluntarily placed under trusteeship. As it became clear that only a few, if any, of the non-self governing territories of the major colonial powers would be voluntarily placed under the international trusteeship system, the attention of anti-colonial nations has accordingly concentrated as trying to strengthen the provisions of Chapter XI.

The Charter deals with colonialism in a number of ways. First, the presumption of the Charter is that nations will work for independence or self-government. It was agreed in Art. 1 of the Charter to develop friendly relations among nations based on principles of equal rights and self determination of peoples.

The principles guiding administering states in relation to non-self-governing territories under Chapter XI are the promotion of political, economic, social and educational advancement. It is stated as an obligation that the nations having colonial territories under their control will agree "to develop self Government and to take due account of the political aspirations of the peoples and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement. Under another obligation the administering states have to transmit regularly to the Secretary General for information purposes, technical information relating to economic social and educational conditions in non-self-governing territories other than trust territories. The U. N. further deals with colonial people in the General Assembly which has grown to be the paramount body of the world organisation. The Charter defines the scope of activities of the General Assembly so broadly that it may discuss any question on matters within the scope of the Charter. A limitation is sometimes laid down on the competence of the General Assembly in discussing colonial problems in that colonial powers claim that they are matters of domestic concern which according to the Charter the U. N. shall not interfere.

The objectives of the trusteeship system and the basic obligation of trust powers is, as in the case of non-self governing territories, to promote the political, economic, social and educational advancement of the trust territories and in addition to promote" their progressive development toward self-Government or independence as may be appropriate to the particular circumstances in accordance with the freely expressed wishes of the people concerned. The functions of the U. N. with regard to trust territories are exercised by the General Assembly but the Trusteeship Council, containing an equal member of trust and non-trust powers and operating under the authority of the General Assembly will assit it. It considers annual reports submitted by

the administering authorities, receives and examines petitions, including oral petitions and arranges periodic visits to the territories. Although the Charter contains special provisions relating to trust and other non-self governing territories, the general provisions of the Charter and the general powers and functions of the organs of the U. N. and specialised agencies also apply in dependent territories.

The phenomenal changes that have occurred in the political status of dependent territories during and since the Second World War have radically reduced the size of the problem from what it was at the outbreak of the war. Within 15 years of the end of the war 600 Million people—$\frac{1}{4}$ of the world's population or 4/5th of the people who were under colonial rule before the Second World War have achieved independence on self-govt. This is one of the most constructive and revolutionary factors in the present world situation. Recent years have reduced the magnitude of the colonial problem, but there has been no decrease in the importance of the problem in international affairs. It is impossible to asses with any precision the extent to which the U. N. has helped to bring about the vast political changes that have occurred in the non-self-governing territories. One must also take into account the effort of the nationalist leaders in most territories and the progressive policies initiated by some of the administering nations. There is no doubt that the U. N. has influenced the postwar efforts that have been made to deal with the colonial problem. In the cases of Indonesia, Israel and the Italian colonies, the direct intervention of the U. N. helped the peoples in those territories to achieve independence. The Indonesian situation presented the classic problem of a colonial power, the Netherlands, attempting to maintain its privileged position in a non-self-governing territory when confronted by the demands of the indigenous people for self-Govt. and independence. The special Arab Jewish problem in Palestine on the other hand, and the fact that the mandatory power the U. K., wished to terminate the mandate of its own accord and requested the General Assembly to devise a solution to the problem made the situation leading to the establishment of the independent state of Israel unique.

The G. A. rejected as too reactionary a plan submitted by the U. K. in dealing with the Italian colonies. Ultimately independence was given to libya, trusteeship, with independence in 10 years to Somaliland and an autonomous Eritoea was joined to greater Ethiopia.

The postwar effort to faster economic, social and educational advancement in dependent territories emphasises that a new epoch in colonial history is in the making which contrasts sharply with that of the prewar period. The administering nations have individually and collectively spent sums unparalled in colonial history for development purposes and for the improvement of the welfare of dependent peoples. The U. N. and the special agencies are providing increasing technical assistance to the dependent territories. Advancement in the territories is being stimulated also by other activities of the U. N. including those of the Economic and Social Council and its subordinate organs.

Some of the most controversial issues in the U. N. have developed out of the

consideration by the G. A. of matters relating to Chapter XI of the Charter. Underlying most issues is the conflict over the respective rights and obligations of the administering states and the U. N. in relation to non-self governing territories. Members with an anti-colonial bias have sought through implementation of Chapter XI to expand the international accountability of colonial powers. On the other hand Members administering non-self-governing territories have tired to guard their rights with respect to their territories and to minimise the role of the U. N. in the colonial affairs. The record of U. N. activities in relation specifically to Chapter XI of the Charter is seemingly more one of conflict among Member nations than of accomplishment on behalf of dependent peoples. This has been due largely to the ambiguities in the Charter and to the conflicting national and regional interests of Members. The setting up of a Committee of Information on a temporary basis has provided the machinary for examination of information transmitted by administrative powers of non-self-governing territories to the Secretary General. Controversial issues have been raised by the cessation of transmission of information and agreement has not been reached either on the definition of non-self-governing territories or on the competence of the Assembly to decide whether cessation is appropriate or not. The work of the U. N. in relation to Chapter XI is concentrated in the 4th Committee of the General Assembly, the Committee on Information and the Secretariat, almost all U. N. organs and agencies, however, concern themselves to some extent with non-self governing territories.

The fact that the Charter sets forth the machinery and function of the international trusteeship system has meant that unlike the experience of the U.N. in connection with Chapter XI of the Charter most of the timo spent by the U.N. on trusteeship matters has been devoted to substantive rather than organisational and other constitutional questions. Fewer territories have been placed under trusteeship than was initially expected. South Africa has failed to place the mandated territory of S.W. Africa under trusteeship and of territories taken from enemy states only Italian Somaliland has been placed under the system. None of the pre-war colonies of the Member States has Voluntarily been placed under trusteeship.

The trusteeship system in operation has shown the conflict between the Trusteeship Council and General Assembly. The dissatisfaction of the G. A. with the manner in which the Trusteeship Council has carried out its functions has led it to become increasingly involved in the details of the activities of the Council and to exercise certain trusteeship functions itself notably the examination of oral petitions. The conflict between the 2 organs has extended to some of the most serious substantive issues that have arisen in the trusteeship field. The powers of the U.N. under the trusteeship system are adequate to ensure fulfilments of its objectives but the machinery for exercising them is defective. The role of the G. A. in trusteeship matters and its relations with the Trusteeship Council have proved unsound. The Trusteeship Council being to a large extent dominated by the administering authorities and less exacting in the exercise of its supervisionary functions than it should be has lost the confidence of the Assembly and has led the G.A. to assume increasing initiative in trusteeship matters.

Despite almost daily evidence of the receding tide of colonialism, the continuation of a colonial type relationship in dependent territories can be expected for many years to come—in some cases it may be in the interests of the inhabitants concerned that it continue. The U. N. has exerted pressure to end colonial relationships, but it can do much to facilitate the integretion of the remaining dependent territories into the world community by ensuring that the foundation for democratic government are firmly laid before independence is achieved and to provide assistance to newly independent nations. Many of the formar colonial peoples, whether they have achieved their independence through the liberal policies of the colonial governments or through the aid of the U. N. have taken their place in the U. N. They have found in the U. N., particularly in the G. A. an opportunity to exercise their newly formed freedom and a place to protest against colonialism remaining in other parts of the world.

Those who have not yet won their independence and admission to the U. N. will have plenty of champions in the G. A. The capacity of the G. A. in the colonial field to debate and serve as a safety valve and point the way to solutions if not to implement and enforce them, is the means by which potentially explosive situations have been and can be channelled into paths of peace.

Sino-Indian Relations

Dr. P. C. Chakravarti

(Professor of International Relations Jadavpur University.)

One of the most significant developments in the recent history of India has been the emergence of a new problem regarding the security of our frontiers. So long as the British ruled over this country, they had, by and large, one frontier problem—the problem of the North-Western Frontier. That problem persists to this day, although its character and complexion have completely changed. But in addition to this problem we are to-day confronted with another—the problem of the Himalayan frontier. This new problem, fraught with dangerous consequences for the stability and integrity of this country, has been created by the Chinese occupation of Tibet.

The Himalayas are often considered as an impenetrable barrier between India on the one side and the trans-Himalayan regions on the other. They have developed in this country, as Panikkar once emphasised, a kind of Maginot-line mentality. Yet the Himalayas are by no means impregnable. Down the ages traders and pilgrims and even large invading armies have traversed through the passes and routes of the Himalayas from India into Tibet and from Tibet into India. In the middle of the seventh century, the Tibetan king Srongtsan Gampo, marched with a strong army from Tibet through Nepal, descended into the plains of northern India, stormed a few cities and defeated the Indian army with great slaughter. In 1790 the Gurkhas, by then masters of Nepal, crossed through the famous Trisuli-Gandaki Pass, overran Tibet and plundered the Lama monasteries of Shigatse. Two years later (1792) a 70,000 strong Chinese army traversed through the same pass for an invasion of Nepal. In 1834 the armies of Maharaja Gulab Singh of Jammu, under the intrepid General Zorowar Singh, marched through the passes of western Tibet no less than six times and annexed Baltistan and Ladakh to the kingdom of Jammu and Kashmir. And finally in 1904 there came the famous Younghusband expedition through Sikkim and the Chumbi valley into Lhasa with far-reaching consequences on the history of the hermit-land.

It is thus clear that the Himalayas do not constitute a solid, insurmountable barrier against external aggression. The essential geographical fact with regard to the Himalayas is that it is the culmination of a vast, elevated plateau, picturesquely described as the Roof of the World. To the north of the plateau lie the largely unexplored, frozen Chang Tang highlands and the unknown Kuen Lun mountains which tower over sea-level Chinese Turkestan. They are *terra incognita* to Tibetans and foreigners

alike. No ordinary human being dares travel along the 1500 miles length of these bleak and frozen lands, where even valleys are 18,000 or 19,000 feet high. To the east Tibet gradually slopes down toward China, strongly protected by a network of almost impassable rivers—the Salween, the mekong, the Yangtse and the Yalung, running at the bottom of deep gorges through impenetrable forests and jungles. Tibet is thus a colosal natural fortress standing in the heart of Asia. Any storng military power based on this natural fortress can any day imperil India's security along her 1800 miles long Himalayan frontier.[1] With modern technological advances, resulting in the rapid transformation of the means of transportation and communication, the impregnability of the Himalayas has become a thing of the past. It is clearly not in India's national interest to see a strong expansionist, military power entrench itself in the soil of Tibet.

At the turn of the century there arose an apprehension of Tibet being absorbed within the Russian sphere of influence. It was to forestal this danger that Lord Curzon, then Viceroy of India, planned the much-criticised Younghusband expedition of 1904. The Home Government in London was reluctant to sanction the plan. They looked at the Tibetan question from the standpoint of imperial policy. Curzon as the Viceroy of India looked at it from the standpoint of Indian security. In the end he had his way. A limited expedition under Sir Francis Younghusband was sent into Tibet resulting in the Lhasa Convention of September, 1904. This Convention secured to Great Britain direct influence over the external policy of Tibet. It also provided for the establishment of trade marts at Yatung, Gyantse and Gartok, and the promotion and encouragement of commerce between India and Tibet. A British commercial agent was stationed at Gyantse, and he was empowered to proceed, if so required, to Lhasa. The danger of the Russian bear grimacing from the Roof of the World was thus dissipated.

But at the time when these events were taking place, the British Foreign Office was more worried about the growing strength and ambitions of Imperial Germany than about Russia. In fact, the rising threat of Germany made Britain and Russia come to an understanding in the famous Anglo-Russian Convention of 1907. This Convention attempted to settle all outstanding differences between the two countries by defining and delimiting British and Russian spheres of influence in areas of mutual conflict—Persia, Afghanistan and Tibet. In regard to Tibet both powers agreed to respect the integrity of Tibetan territory, abstain from any intervention in its internal administration, and to treat with the government of Tibet only through its nominal suzerain, China. In effect, Britain and Russia, by the Convention, set up Tibet as a buffer zone between India on the one side and the Russian Asiatic empire on the other. Tibet, like Afghanistan, was to serve as a protective cushion for India.

When Britain recognised Chinese suzerainty over Tibet in the Anglo-Russian Convention of 1907, she was not in the least worried about

[1] From the north eastern tip of Kashmir to Namcha Barwa on the north-eastern frontier of Assam the border between Tibet and India extends over 1800 miles.

China. China was then weak, decadent, disintegrating, in the grip of Western Powers; the Manchus appeared to have "exhausted their mandate from heaven." Recognition of Chinese suzerainty over Tibet meant no more than the recognition of an empty symbol, or, as Lord Curzon had put it, of a mere "political affection" and a "solemn farce." It would have required a prophet's vision to foresee that the farce might one day become a reality, posing a more serious threat to Indian security than the Russian bear had ever done.

Chinese suzerainty over Tibet has a history of its own. Although Tibet had age old connections with China, there was no Chinese overlordship over Tibet until the second decade of the eighteenth century. In 1717 a horde of Moslem Tartars swept down into Tibet, and took Lhasa by storm, wrecking and looting monasteries and temples. The Tibetans applied to Peking for help and Emperor Kang-Hsi sent up a strong army to drive out the invaders. The Chinese thus came into Tibet in the guise of deliverers. They continued, however, as overlords. From 1720 till about the end of the nineteenth century this overlordship was symbolised by the residence of two Chinese Ambans (Residents or Viceroys) and a Chinese garrison at Lhasa. Chinese overlordship over Tibet, however, waxed and waned with the changing fortunes of the central government at Peking. When that government was strong, the overlordship was real; when weak, it was nominal. The Tibetans, moreover, revolted against the Chinese whenever there was an opportunity for it. On such occasions, they expelled the Ambans massacred the garrison and threw off the foreign yoke. In other words, Chinese overlordship over Tibet was never based on the willing consent of the Tibetan people.

In 1895 China was disastrously defeated by Japan. In 1900 the Boxer Rebellion was routed by the Western armies. These misfortunes of China were an opportunity for Tibet. The thirteenth Dalai Lama now so firmly re-established his authority that the Chinese suzerainty was reduced to a mere pretence. When the Younghusband expedition entered Lhasa, there was hardly any trace of Chinese authority in the hermit, kingdom. The Lhasa Convention was essentially a British-Tibetan affair. China hardly figured anywhere in the scene.

In 1910, however, Peking made another attempt to reassert its authority in Tibet. The Dalai Lama had been a fugitive from his country ever since 1904. The British had withdrawn from all entaglements in Tibet after the Anglo-Russian Convention of 1907. Taking advantage of this situation the Chinese again moved into Tibet with an invading army, deposed the Dalai Lama, and pushing their troops westward as far as Gartok and the broder of Ladakh, occupied the whole country.

Most Tibetans, however, still considered the fugitive Dalai Lama as their lawful ruler. Chinese edicts and proclamations in Lhasa were torn down or plastered with dung by an outraged population. In 1911 there occurred the revolution in Peking, leading to the fall of the Manchu dynasty. The Tibetans at once rose against the invaders, fought the Chinese troops of occupation and expelled them from their country. In June 1912 the Dalai Lama returned from his exile, made a solemn and pompous entrance into Lhasa and assumed full and complete sovereign rights over his country. When the first President of the new born Chinese Republic sought to ingratiate himself with the Dalai Lama by restoring his title and privileges, the latter retorted that he did not seek from the Chinese any title or privileges as he was the lawful religious and political ruler of an independent country. From that date till about 1950 there is hardly any evidence of China exercising any suzerain rights over Tibet. Tibet coined her own money framed her own laws, administered her own justice, maintained her own army and conducted her foreign relations, unhampered by any external control.[1]

This does not mean that the Chinese gave up their pretensions over Tibet. No serious attempt was, however, made to put them into practice until the Communists came into power in China. In 1950 the People's Republic of China decided to launch upon a full-scale invasion of Tibet. The "Peoples army units" were ordered to advance into Tibet "to liberate the Tibetan people and defend the frontiers of China." "Liberate the Tibetan people from whom ?" asked Prime Minister Nehru in the Indian Parliament, and "defend the frontiers of China against whom ?" asked many others in this country. The Government of India immediately wrote to Peking, imploring the People's Government to settle the Tibetan problem by peaceful negotiations, "adjusting legitimate Tibetan claims to autonomy within the frame-work of Chinese suzerainty". The Chinese reply was couched in the most haughty and insulting language. "The problem of Tibet", the Chinese wrote, "is a domestic problem of the People's Republic of China and no foreign interference shall be tolerated". "The Central People's Government of the People's Republic of China", the Chinese note added "cannot but consider it (the Indian viewpoint) as having been affected by foreign influences hostile to China in Tibet". In other words, the Government of India was an agent of Western imperialism! We swallowed the insult.

Three times in modern history Britain went into major wars to defend and preserve the independence of the Low Countries—first in the time of Louis XIV, a second time in the days of Napoleon and a third time in 1914—because she regarded independence of Belgium and Holland as vital to her own security. In July 1934, the Austrian Chancellor, Dr. Dollfuss, was murdered at Vienna by the Austrian Nazis, obviously under instructions from Berlin. On the same day Italy mobilised her troops on the Brenner, because she considered Austrian independence as vital to her security. Hitler was frightened; he dared not carry through the Putsch he had planned. Austrian independence was thus saved for a few years. In 1951 when the United Nations forces crossed the 38th parallel in Korea, the People's Government in China sent large masses of fresh and well-equipped Chinese Communist forces into North Korea because she considered the immunity of that region from potentially

1 Writing in the *Observer*, Mr. Hugh Richardson, who was officer-in-charge of the Indian Mission in Lhasa in 1942-50, stated that "there was not a trace of Chinese authority there (Tibet) after 1912."

hostile external control as vital to her own security. In 1950 we had neither the will nor the resources to act in the manner the stronger powers in similar circumstances would have acted. Having won our independence by peaceful methods under Gandhiji's leadership, we were inclined to believe that international problems including problems of security might and should be solved by the same methods. Our unwillingness or inability to act in defence of Tibet enabled China to have her way. We remained silent spectators of the tragedy that was enacted at our door-step.

Lhasa looked to us for diplomatic and other support. She appealed to India to sponsor her case before the United Nations. The Government of India informed her that she could make a direct appeal to the United Nations, and that we would support her case to the extent of censuring China for using force against her. But at the last moment we backed out of that promise. When the General Assembly Steering Committee took up the consideration of the Tibetan complaint (25 November, 1950), we not only reversed our previous stand but went to the extent of advocating that the complaint should not be considered at all.

Tibet left to itself could not continue the fight against huge Chinese forces for long. In late April, 1951, a six-man delegation from Tibet arrived in Peking and within a month (on 23 May, 1951) signed a 17-article dictated peace treaty called the Sino-Tibetan Agreement. The Tibetans agreed to "unite and drive out imperialist, aggressive forces from Tibet so that the Tibetan people could return to the big family of the motherland—the People's Republic of China". They also agreed to the establishment of a Military and administrative Committee and a Military Area Headquarters in Tibet. Peking was to take control of Tibetan external affairs, trade and communications. The Tibetan army was to be absorbed by the People's Liberation Army. In return, Peking promised not to alter the existing political system in Tibet or change the established status, functions and powers of the Dalai Lama or effect any change in the religious beliefs, customs and habits of the Tibetan people or in the income of monasteries. Thus the old, often nebulous, suzerainty of China over Tibet was transformed into a full-fledged sovereignty.

India's immediate reaction to these events was one of grave concern. The Chinese occupation of Tibet made it impossible for us to maintain our former carefree attitude in regard to the Himalayan frontier. To safeguard India's security, the British had built up two lines of defence along this frontier—an outer line constituted by Tibet as a buffer zone, and an inner line constituted by the British protectorate over Sikkim, Bhutan and Nepal. When the outer bastion broke down in consequence of the Chinese occupation of Tibet, India inevitably concentrated on strengthening the inner line of defence inherited from the British.

It was clear to India that China, now entrenched in Tibet, could put heavier pressure on the government of Nepal through political and economic means. It was clear that Lhasa, now controlled by China, could be nsed as an instrument to draw the allegeance of Sikkim, Bhutan and numerous tribes living along our North

East Frontier. Ladakh, Bhutan and to some extent Sikkim are parts of ethnological Tibet. Lhasa is to most of our Himalayan peoples what Rome was to the Catholic Christians in the Middle Ages—the great centre to which they must turn for light and spiritual guidance. The government of India did not fail to realise the implications of the situation. Speaking to the Parliament, Prime Minister Nehru said in December, 1950 :

"Our interest in the internal conditions of Nepal has become still more acute and personal, because of the developments across our frontiers, to be frank, especially those in China and Tibet. Besides our sympathetic interest in Nepal, we are also interested in the security of our own country. From time immemorial the Himalayas have provided us with a magnificent frontier. Of course, they are no longer as impassable as they used to be, but are still fairly effective. The Himalayas lie mostly on the northern border of Nepal. We cannot allow that barrier to be penetrated because it is also the principal barrier to India. Therefore, much as we appreciate the independence of Nepal, we cannot allow any thing to go wrong in Nepal or permit that barrier to be crossed or weakened, because that would be a risk to our own security."

On another occasion, the Prime Minister said :

"So far as Nepal is concerned, it is a well-knowu fact—and it is contained in our treaties and other engagements with Nepal—that we have a special position in Nepal—not interfering with their independence but not looking with favour on anybody else interfering with their independence either."

When the Chinese People's Republic published maps showing large areas to the south of the MacMohan line as belonging to China, the Prime Minister declared in the Parliament : "MacMohan line is our boundry, map or no map. We will not allow anybody to come across that boundry."

Not only was concern felt and expressed, but positive measures were taken to strengthen our position along the Himalayan frontier. By a treaty signed with Bhutan (August 8, 1949) India took control of the external relations of Bhutan in return for an annual subsidy of 500,000 rupees. On December, 5, 1950, we entered into a similar treaty with Sikkim under the terms of which India not only received full control of Sikkim's external relations, but also acquired the right to take such measures as she considered necessary for the defence of Sikkim or the security of India, whether preparatory or otherwise, including the right to station troops anywhere within Sikkim. India further acquired the exclusive right of "constructing, and regulating the use of railways, aerodromes and landing grounds" and other communication facilities in Sikkim. The government of India also took action to guard the border between Ladakh and western Tibet, while the government of Uttar Pradesh established with the help of the Union Government special constabulary forces to control and patrol the frontier in the Kumaon area. In the north-east frontier area on this side of the MacMohan line the goverment embarked upon a new policy of extending political control over wild tribes, building

roads and air-strips and establishing army units at strategic points. Nepal is legally technically an independent country. But as a close and friendly neighbour, India has been taking special interest in its affairs so as to enable it to build up social and political stability within. In spite of pressing needs at home Indian experts were sent to Nepal to train an army and civil service, build roads and set up schools. "The financial efforts India is making in Nepal are shown by the fact that in 1954 India spent close to eighteen million dollars in that country for development purposes and these expenditure have continued".[1]

Alongside these measures we sought consciously and deliberately to improve our relations with China, partly in the interest of world peace, but more in the belief that a friendly China might still be induced to follow a policy of moderation and regard to Tibet and our Himalayan frontier. India was the second non-Communist country in the world to extend recognition to the Communist government of China (30 Dec., 1949). When in 1951 a resolution was moved in the United Nations General Assembly condemning Chinese aggression in Korea, India voted with the Soviet bloc against the resolution. We attempted to make the Chinese appear as more sinned against than sinning. To placate the Communist government of China we refused to recognise the Nationalist goverment of Formosa. We strove hard to secure Communist China's admission to the United Nations and to a permanent seat in the Security Council. When a proposal was made that Security Counci'ls membership be revised so that the parmanent seat held by Nationalist China might be given to India, we ourselves turned down the suggestion as it might impair our friendly relations with Communist China. India also helped to bring about the cease-fire in Koria and the Geneva Conference of 1954 so that China's relations with the non-Communist Powers might improve.

At about the same time we concluded a new treaty with China called the Sino-Indian "trade and intercourse agreement" on Tibet (29 April, 1954). It was in this treaty that the famous Panch Sheel was for the first time formulated and embodied. Under the terms of the Agreement we surrendered some of the rights and privileges which we had inherited as a legaly from the old government of India. These rights were the right to station an Indian Political Agent at Lhasa (not fixed by treaty but an established practice since 1935), the right to maintain trade agencies at Gyantse, Gartok and Yatung as well as post and telegraph offices along the trade route upto Gyantse, and finally the right to maintain military escorts at Yatung and Gyantse for the protection of India trade agencies as well as of the trade routes. Under the terms of the treaty we agreed to transform our political agency at Lhasa into a Consulate-General[2], withdraw our military escorts from Tibet and surrender our communications installations to the Chinese government. It was stipulated that these communications installations were to be handed over to China

1 Poplai and Talbot, *India and America*, pp. 114-5.

2 The change in the designation of the Indian representative at Lhasa from Political Agent to Consul-General was actually brought about in September, 1952.

on the payment of a "reasonable price." But on the day following the signing of the treaty (30 April, 1954), the Government of India instructed Ambassador Raghavan that "postal, telegraph and telephone installations together with equipment operated by India in Tibet" were to be transferred "free of cost and without compensation" to the Chinese People's government "as a gesture of goodwill". We also gave to China one more trading post in India in addition to the two already existing. China pressed for one at Almora or Simla ; we gave it at New Delhi instead. Finally, in the years following the conclusion of the Sino-Indian Agreement on Tibet we made almost an all out effort to widen and deepen our contacts with China through exchange of students, of cultural and trade missions and through diplomatic measures.

What have we got from China in return for these gestures of goodwill ? On 19 October, 1949, more than two years after we had achieved our independence, Mao Tse-tung in reply to a message of greetings from the Communist Party of India stated :

> "I firmly believe that relying on the brave Communist Party of India and the unity and struggle of all Indian patriots, India will certainly not remain long under the yoke of imperialism and its collaborators. Like free China, a free India will one day emerge in the socialist and People's Democratic family ; that day will end the imperialist reactionary era in the history of mankind" (*The Communist*, Bombay, January, 1950).

In other words, free India still needed to be "liberated" through the establishment of a totalitarian Communist regime either of an indigenous or foreign brand !

Secondly, in return for our gestures of goodwill we had hoped that we might be permitted by China to reopen our Consulate at Kashgar (Sikiang). In reply to our request, however, we were informed by the People's Government that Sikiang was a closed area.

Thirdly, in spite of our natural sensibility in the matter of our international frontiers Communist China has been persistently publishing maps showing large chunks of Indian territory such as Ladakh, Sikkim, parts of NEFA and important Indian shrines such as Kedarnath and Badrinath as Chinese territory.[1] When the government of India drew the attention of China to what Dr. Meghnad Saha once described as "this cartographic annexation of Indian territory", the People's Government replied that these maps were copies of the old maps produced in the time of Chiang Kai-Shek. Everything of old China was being changed by the Communist government ; only the old maps could not be changed ! A few months ago the Soviet weekly, "The New Times", having world-wide, circulation, published a similar inflated map of China. When enquiries were made about it, New China put forward the same plea as on previous occasions. It added, however, this time that it had not yet undertaken a survey of its boundaries, and pending such survey it connot and will not make changes in its

1 For Chinese maps showing NEFA., Ladakh and other slices of Indian territory within China, see "Provincial Atlas of the Chinese People's Republic", Shanghai, 1950 ; "General Map of the Chinese People's Republic", Shanghai, 1950.

Some of these maps have been reprinted in October ; 1958.

frontiers on its own.[1] In other words. Communist China has reserved to itself the right to declare at any time of its own choosing that the chunks of Indian territory shown in Chinese maps as belonging to China are disputed territories.

Fourthly, our Chinese friends during the last few years have resorted to all kinds of dumping tactics with a view to expelling us from our traditional south-east Asian market and thus crippling our economy. Indian exports of textiles into the Federation of Malay and Singapore shrank from 18.6 million square yards in the first calender quarter of 1957 to 6·4 millon square yards in the first three months of 1958. The volume of our exports to other south-east Asian countries has undergone a similar decline.[2]

I shall not dwell at length on the tragic events that have taken place in Tibet during the past few weeks. For one thing, there is not enough time for it this evening ; for another, although the outlines of the happenings appear to be clear, the details still remain a little confused. There is hardly any doubt, however, that these happenings represent nothing short of a national uprising of the Tibetans against their alien masters. The Chinese plea that it was a conspirary of Kaloons (ministers), aristocrats and "rebellious bandits" is on all fours with the Russian dubbing of Hungarian patriots as "Horthy Fascists". A rebellion on this scale in not the sort contrived by the "upper strata" and "imperialists" and "foreign reactionaries".

The Tibetan revolt has brought to the surface three significant facts which we had refused so long to take sufficient cognisance of. First, our deep sympathy for Tibet. In his press conference on the 5th of April, Prime Minister Nehru emphasised how recent events in Tibet have "affected some deeper chords in Indian hearts". In fact, never in recent years have the feelings of our people (except the Communists) been so deeply moved by any event outside India as by the happenings in Tibet. This has been so partly because of historical reasons—our close cultural and spiritual ties with Tibet forged in bygone ages, and partly because of a tacit recognition in the national mind that

1 Speaking in the Lok Sabha on 22 April, 1959, Prime Minister Nehru stated :
"So far as the Russian maps are concerned, I think they had merely copied them from the Chinese maps without probably going into the matter. When we addressed them they said that they would look into the matter. So far as the Chinese maps are concerned, we are still in correspondence. As I have preivously said, their answer has been that these are old maps, we are not sure of the exact border and we shal! look into it and till then the status quo should continue.' Well, that is not a very adequate answer, if I may say so, after so many years."

2 Shri Madan Mohan R. Ruia, leader of the Government of India trade mission, answering questions at a Press Conference (31 March, 1959), stated that China has been steadily expelling India from her markets, especially in Indonesia and Malaya.

Reutor reported from Wellington (1 April, 1959) that by the carefully-timed unloading of low-priced goods, Communist China has upset the local markets in South-Asia and has affected the normal flow of trade with the free countries of the world. "A part of the proceeds from the sale of these goods is used for purposes of propaganda and subversion."

our security, and consequently, freedom are some way or other linked up with the fortunes of Tibet.

The second important fact which has been thrown up by recent events is that there exists in our midst a well organised minority which is not only anti-national in its outlook and sympathies but actively engaged in confounding the national mind in order to subserve the interests of international communism. They have launched upon an all-out campaign of vilification against Tibet in order to justify Chinese atrocities in that unhappy land. They have been shouting and shrieking for the suppression of the Tibetan uprising by methods of blood and iron. While they agree with other sections of our people in condemnation of western colonialism and imperialism, they consider any rebellion against Communist imperialism as an abominable crime which must be put down with an iron hand. Indications are clear and unmistakable that in the event of any unfortunate showdown with China, which no one in this country wants, they will provide the material with the help of which internal operations of the Trojan Horse pattern might be employed without much difficulty.

But by far the most important fact brought to the surface by recent events is that the key to Sino-Indian understanding and amity lies hidden in the soil of Tibet. It is on the rocks of the Roof of the World that our friendship with China will flourish or founder. There is hardly any doubt that the Tibetan revolt has cast a deep shadow on our relations with China to-day. Indian Communists who are crying hoarse on behalf of China on this issue are, to my mind, doing the greatest dis-service to Sino-Indian understanding. Entrenchment of China in Tibet and destruction of Tibetan autonomy will premanently impair our relations with China. Only ideological fanatics can ignore or deny the imperatives of geography.

Ever since we became independent, we have been consistently striving to follow a policy of "dynamic neutralism" in a world torn asunder by ideological and other rivalries. But as President Roosevelt had said in 1939, "even a neutral has a right to take account of facts". And the fact to-day is that the vast bulk of Communist Asia, armed to the teeth, presses down 1800 miles of India's northern border. China not only occupies nearly one-fourth of the giant Asiatic land mass, she has a population of 650,000,000, increasing at the rate of 2.4 per cent annually. Experts on population problem have computed that the Chinese population would be 700,000,000 in 1963 and 800,000,000, in 1968. And there is no recognition in China, as there is in this country, of the need of population control. Sometime ago some noted Chinese economists who had advocated population control were dismissed from their jobs. If present trends continued sooner or later China would demand an outlet, if necessary by force, for her expanding population, in the same way as Hitler demanded *lebensraum* for an expanding German population.[1]

1 The present revolt in Tibet is due, in some measure, to large-scale settlement of the Chinese, in the hermit kingdom. At the historic meeting on 20 September, 1955, between Mao Tse-tung, the Dalai and Panchen Lamas, Mao had indicated that, among the impending changes, Communist China intended to colonise Tibet at a ratio of more than five to one. On 26 April, 1956, General Chang Kuo-hua,

Alongside this huge population increasing at a rapid rate, China has an army which is the second largest in the world. In 1955 the strength of this army was estimated at 2,250,000 with 700,000 security troops in the background. And this army is stocked up with the Soviet equipment and supplies. Expenditure on defence has been mounting year after year. Peking's for budget 1959 shows an increase of 16 per cent on defence expenditure compared with 1958.

Before the occupation of Tebet by Communist China in 1950, the Tebetan Government used to maintain an army ranging from about 5,000 to about 10,000 half-armed soldiers. The People's Liberation Army in Tibet has been at least ten times larger since 1956.[1] In fact, as Prime Minister Nehru stated in the Lok Sabha on 30 March, 1959, quoting Mao, had stated ; "Tibet is a huge area but thinly populated. Efforts must be made to raise the population from the present level of two millions......to more than ten millions". In fact, large-scale settlement of the Chinese began some years ago in the Golok and Amdo areas of Tibet. This had the effect of driving the Amdos and other Tibetans in a migration towards Central Tibet as far as Jeykundo between Kham and Lhasa. Chinese families in large number have heen brought from thickly populated provinces of China and resettled on the best lands of Western Tibet, which has been linked with the Chinese mainland through Sinkiang.

Tebet has been under virtual military occupation for some years.[2]

Moreover, Communist China has been busy during the last few years in building air-fields and a net work of highways within, and extending to the frontiers of Tibet. No doubt these new highways will make travels within Tibet easier than before and "provide facilities for the growth of trade". But they are not without their military significance for Tibet as well as for this country.[3]

These are some of the basic facts which we can only ignore at our peril. We cannot turn these facts into fiction merely by turning away from them. If Sino-Indian relations are to rest on solid foundations. China must agree to grant complete self-government to Tibet in the same manner as Britain granted self-government to many of her former colonies

1 *Thought*, a weekly magazine published from Delhi, wrote on 21 April, 1956 : "There are fairly reliable reports that put Chinese Communist strength in Tibet at over 100,000 men."

2 A recent P.T.I. report stated that "Peking has posted 60,000 Chinese troops to guard about 50,000 Tibetans in Lhasa and suburs."

3 On 25 April, 1956, The Communist Chinese *Shih Shih Shon Tse*, writing on "Construction in Tibet" said : "Roads are open to motor traffic from the banks of the Chinshachiang River in the eastern part of Tibet to Kotake in the Ali district in the extreme west, and from the Tang-kula mountains in the north to Yatung in the midst of the Himalayas in the south. The five truck lines of the Sikang, Tibet, Chinghai-Tihet, Lasha-Shigatse, Shigatse Gyantse and Gyantse-Yatung have not only linked various important cities and towns in Tibet but have also linked Tibet closely with China's hinterland." On March 24. 1956, the *New China News Agency* reported that a route had been found for a highway from Nagchuka (north-west of Lhasa) to Gantok, largest town in the Ali district of extreme western Tibet, not far from the Indian border. A few weeks later (April 20, 1956) the same News Agency reported that a new railway line, to be immediately surveyed, would link Lhasa with Shigatse near Tibet's border with Nepal. The fact that similar zeal for road construction is not much in evidence elsewhere, in China itself, makes one doubt whether the highways are merely meant for innocent trade and travel.

and dependencies. China must withdraw from Tibet and conced to the Tibetans their inherent right of self-determination. No one disputes the need of reforms in Tibet ; but reforms must come from within, and cannot be thrust from outside. China must also agree to sign a new convention with India embodying the substance of the old Anglo-Russian Convention of 1907, both the countries pledging themselves to respect the integrity of Tibetan territory and abstain from any intervention in its internal administration. Alternatively, there may be a tri-partite agreement between China, Tibet and India, the three countries undertaking to abide by the principles of Panch Sheel in their relations with one another. This must be buttressed by a categorical declaration by China that she would respect the MacMohan Line and the internationally-recognised Himalayan frontier.

Speaking to the Lok Sabha on 30 March, 1959, Prime Minister Neheru stated that while India values her friendship with China she also values her good and friendly relations with Tibet. "We want them (Tibetans) to progress in freedom", he said. These simple words contain the key to Sino-Indian understanding and amity. Tibet's freedom is essential for the peace and hapiness of the Tibetans. It is no less essential for our own security and continued freedom. Let there be no mistake about it.

POSTSCRIPT

This talk was given on 16 April. Since that date events have moved apace in Tibet. The backbone of the rebellion appears to have been broken, although its last embers will require time to be extinguished. Countless Tibetans—men, women and children —have been killed. Monasteries with all their wealth of priceless manuscripts and treasurers of art have been shelled and destroyed. The Dalai Lama has been given asylum in India, and at least another 12,000 Tibetans have found shelters in this ancient land which had given birth to the lord of their faith.

In the meanwhile, there has been widespread expression of sympathy for the Tibetans all over the non-Communist world including Communist Yugoslavia. Voices of protest and indignation against Chinese action in Tibet have been raised all through Western Asia, Nepal, India, Ceylon and South East Asian countries. To large masses of Asian peoples Tibet has proved beyond doubt that Communist imperialism is as real and every bit as dangerous as Western colonialism.

On the other hand, the leaders and the regimented press of Communist China have been indulging in an orgy of insinuation, insult and intimidation against this country for its expression of sympathy with the oppressed Tibetans. A few specimens are given below :

On 28 March, the New China News Agency issued a communique stating that the Tibetan rebellion "was engineered by the imperialists, the Chiang-Kaishek bands and foreign reactionaries and the *commanding centre of the rebellion was Kalimpong*". On 29 March a spokesman of the External Affairs Ministry emphatically repudiated the allegation. On the following day, Prime Minister Nehru stated in the Lok Sabha : "It is wrong to say that Kalimpong was the centre from which (anti-Chinese) activities were directed ......to imagine or to say a small group of persons sitting in Kalimpong organised a major upheaval in Tibet seems to me to make a large draft on imagination and to slur over obvious facts". On March 31 the National Council of the C. P. I. issued a statement repeating the Chinese charge that Kalimpong was the centre of anti-Chinese activities in Tibet and asking the Government of India to investigate the matter. The Indian Commu-

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
OLD & RARE
Central Library
Jadavpur University, Kol-32

nist accepted the Chinese allegation but not its repudiation by the Prime Minister of India.

When the Dalai Lama sought and obtained asylum in India (31 March), the New China News Agency reported his entry into India "under duress". (It was later insinuated that he had been kidnapped into this country by "Indian expansionists"). When the Dalai Lama issued his first statement to the press from Tezpur (18 April) denying that he had been abducted or that he was under duress in India and exposing China's consistent record of double-dealing in Tibet, the New China News Agency reported (20 April) that the statement was issued under duress and foreign (meaning Indian) elements had helped to shape it. "One has reason to believe", it added, "that the statement was not by the Dalai Lama himself but was imposed on him by some person or persons". Speaking before the National People's Congress at Peking (22 April), Panchen Lama (the traditional Chinese stooge) said that "the so-called statement" by the Dalai Lama "was imposed on him by foreigners".

On the same day (22 April) the Dalai Lama issued a second statement from Mussorie, in course of which he said "I wish to make it clear that the earlier statement was issued under my authority and indicated my view and I stand by it." But the Chinese press again insinuated that this statement, like the earlier one, was drafted by the officers of the Government of India and issued under duress.

In the meanwhile, Deputies of China's National People's Congress meeting in Peking went on, day in and day out, condemning "Indian" imperialists for scheming the Tibetan rebellion and interferring in China's internal affairs with the intention to split Tibet from China". One Chinese Deputy, an international law expert, stated: "The backing and encouragement certain Indian politicians gave to the rebellious clique in Tibet and the issuing of the so-called statement which was imposed on the Dalai Lama constitute a barbarous act of interference. We (the Chinese) will never allow foolish hogs to poke their snouts into our beautiful garden. "it is worth noting' said the Panchen Lama, "*that the reactionaries in India, working in the footsteps of the British imperialists, have always harboured expansionist ambitions towards Tibet and have carried out various forms of sabotage activities* which are undoubtedly favourable to imperialism and unfavourable to Sino-Indian friendship". When the Panchen Lama finished his speech, Mr. Mao Tse-tung is reported to have joined in the applause and nodded approvingly to the twenty-two-year-old temporary head of the Tibet Preparatory Committee.

Warnings and threats have also not been wanting. On 24 April the People's Daily proclaimed in a banner headline over eight columns in black Chinese characters half an inch high: "Deputies of various nationalities give solemn warnings to Indian expansionists". On 25 April the Peking radio solemnly warned: "British imperialists and Indian expansionists had better clarify their minds or they will suffer a tragic end" On 30th April the People's Daily held out the threat: "*We give solemn warning to imperilists and Indian expansionists. You must stop at once; otherwise you will be crushed to pieces under the iron first of 650 million Chinese people*".

Stunned by this ceaseless torrent of abuse, slander, and intimidiation, Prime Minister Nehru, in course of a statement (28 April) in the Lok Sabha said: "All I can say is that I have been greatly distressed at the tone of the comments and charges made against India by responsible people in China. They have used the language of the cold was regardless of truth and propriety". He described the Chinese charges as "unbecoming", "fantastic" and "entirely devoid of substance".

But Mr. Dange, leader of the Indian Communist Party in the Lok Sabha, praised the Chinese press comments on India as remarkable for their "sobriety" "Sobriety" indeed ![1]

1 The Communist sense of values is sometimes astoundingly baffling. When Great Britain or American seek oil concessions in the Middle East, it is ofcourse imperialism. But when the Soviet Union seeks similar oil concessions in Iran, it is to liberate Iran from imperialism !

378.147(54.23)
J11
(OR)